দেবী-মহিমা

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ়, ১৩৪৯

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিণ্টার্স
১৩৮ বিধান সরণী
কলিকাতা-৪

দেবী মহিমা

লেখকের অন্য বই

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে (১ম ২য়)

অলৌকিক জলযান (১ম ২য়)

ঈশ্বরের বাগান (১ম ২য় ৩য় ৪র্থ)

নগ্ন ঈশ্বর

মানুষের সত্যাসত্য

মানুষের হাহাকার

মানুষের ঘরবাড়ি

দুঃস্বপ্ন

ফেনতুর সাদা ঘোড়া

বলিদান

শেষ দৃশ্য

রূপকথার আংটি

টুকুনের অসুখ

সুখী রাজপুত্র

গম্বুজে হাতের স্পর্শ

উৎসর্গ

হাসিদি এবং আনন্দদাকে

॥ প্রথম পর্ব ॥

সে হাঁটছিল। গ্রীষ্মের প্রখর রোদ চরাচরে। গনগনে উত্তাপ। সামনে সুমার মাঠ। রুখা জমি। খড়ের বন। শুকনো এবং প্রচণ্ড দাবদাহে সব যেন জ্বলছিল। শুকনো ঘাস পাতা ওড়াওড়ি করছে। চোখ জ্বালা করছে। পায়ে ফোসকা। নতুন কাবলি জুতো পরে এই দশা। সেই কবে কেনা নতুন জুতো জোড়া সে এ-দেশে রওনা হবার আগে প্রথম পায়ে দিয়েছে।

দেশবাড়িতে জুতো পরার অভ্যাস নেই। তাকে রেখে আসার সময় বাবা প্রথম এক জোড়া নতুন জুতো নারানগঞ্জ থেকে এনে বলেছিল, নে। পরবি।

সবাই দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। মা বাবা জ্যাঠারা সব। সে আর তার এক দাদা ঠাকুমার সঙ্গে থাকবে কথা। পরীক্ষার পর যাবে। কটা মাস মাত্র। তবু কী মন খারাপ! বাবা বুঝতে পেরেই আসার আগে খুশি করার জন্য তাকে কাবলি শু জোড়া দিয়েছিলেন। সে টেস্ট-পরীক্ষার সময় ভেবেছিল পরে পরীক্ষা দিতে যাবে। তারপর আবার মনে হয়েছে, পাড়াগাঁয়ের স্কুলে কে কবে জুতো পরে যায়! বরং যেদিন দেশবাড়ি ছেড়ে সে চলে যাবে, সেদিনই পরা যাবে।

পরতে গিয়েই বিপদ।

বড়দা, ঠাকুমার দেশ ছাড়ার কথা সবার শেষে। বড়দা তাকে দামোদরদির স্টিমার ঘাটে তুলে দিতে এসেছিল। সে বাড়ি থেকে জুতো পরে বের হয়েছিল দামোদরদি স্টিমার-ঘাট পর্যন্ত হেঁটে যাবে বলে। অর্ধেক রাস্তাও সে যেতে পারেনি। চষা জমি, সরু আল, সে

জুতো পরে স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারছিল না। তার কষ্ট হচ্ছিল। সেই থেকে জুতো জোড়া আর পায়ে দিতে পারেনি। পরলেই জ্বালা করে।

এখন তার হাতে এক জোড়া কাবলি সু। অন্য হাতে টিনের সুটকেস। ক্লান্ত অবসন্ন। মরতে কেন যে বাবা এমন একটা জায়গায় বাড়ি বানাল। দেশ গাঁয়ের সব লোক নিয়ে কাকা জ্যাঠারা এই অঞ্চলটায় বসতি গড়ে তুলেছে। আর কতদূর বুঝতে পারছে না। পকেটে বাবার চিঠি। কীভাবে কোথায় নামতে হবে, কোন গাড়িতে উঠতে হবে, আর আছে নদী পার হবার কথা, রিক্শার কথা। আর সব স্টেশনের নাম। সে ঠিকমতো শেষ পর্যন্ত শেষ স্টেশনটায় ভোরের গাড়িতে নেমেছে। নেমেই অবাক। স্টেশনের সামনে এক বিশাল বিলেন মাঠ ক্রোশের পর ক্রোশ চলে গেছে। বাবা লিখেছিলেন কৃষ্ণপুর জায়গাটা হিজল বিলের কেন্দ্রবিন্দুতে। রেল-স্টেশনটা খাড়া পাহাড়ের মত উঁচু জায়গায়। লাইন ধরে কিছুটা পুব দিকে এগোবে। গুমটি ঘর দেখতে পাবে একটা. পরে বিরাট অশ্বত্থের ছায়া পাবে। গুমটি ঘরের ডানদিকে যে গরুর গাড়ির লিক পাবে সেটা অনুসরণ করবে। বিলে গাছপালা কম। দুটো নদী পাবে, একটা দ্বারকা পরেরটা ব্রাহ্মণী। দুটো নদীরই উৎসমুখ ছোটনাগপুরের পাহাড়ী এলাকা। বাবা রাস্তার বিবরণ দিতে গিয়ে নদীর উৎসমুখ নিয়ে কেন পড়েছিলেন, সে চিঠিটা পেয়ে বুঝতে পারেনি। ক্রোশ দুয়েকের মত পথ স্টেশন থেকে। এ সময় বিলেন অঞ্চলটা প্রায় জনহীন থাকে। দূরে অদূরে মাঠচরা মানুষের সাক্ষাৎ পেতে পার। কিছু গরু মোষ। পরে একসময় দেখবে তা-ও নেই। শুধু খড়ের বন আর ঘেরি। ঘেরির পাড় ধরে হাঁটলে দুপুর গড়িয়ে যাবে। সোজাসুজি হাঁটার চেষ্টা করবে। দ্বারকা নদীতে জল পেতেও পার, নাও পার। বর্ষা হলে জল. না হলে শুকনো বালির চরা। নদীর মর্জি আমরা এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। আর ঈশ্বরের নাম নেবে। বিলেন

অঞ্চলটায় সাপখোপের প্রচণ্ড উপদ্রব। বন্যার সময় অজগর পর্যন্ত নেমে আসে।

সে ঠিকমতোই তাহলে যাচ্ছে। দু-দিন আগে বড়দা স্টিমার-ঘাটে তুলে দিয়ে গেছে। কখন স্টিমার নারানগঞ্জে পৌঁছবে, কোথায় গোয়ালন্দ মেলের টিকিট পাওয়া যাবে, তারপর দর্শনাতে ওর টিনের বাক্সটা পুলিশ যে হাটকাতে পারে এ-সব সম্পর্কেও বিশদ বুঝিয়ে দিয়েছিল বড়দা। সে ভীরু বালকের মত তাকিয়ে থাকলে, দাদা বলেছে দেখ, যাবি কিনা? না আমাদের সঙ্গে যাবি। আর মাত্র তো কটা মাস।

তার ফাইন্যাল পরীক্ষা হয়ে গেছে। দেশবাড়ির জন্য যে কষ্টটা, এক আশ্চর্য মোহময় প্রকৃতির মধ্যে বড় হওয়া এবং ভালবাসা সবই যেন মার সঙ্গে দেশান্তরে চলে গেছে। আসলে সে মাকে ছাড়া এক দণ্ড থাকতে পারে না। ভেতরের কষ্টটা এতদিন পরীক্ষার জন্য চেপেচুপে রেখেছিল। পরীক্ষা হয়ে যাবার পরই সে অধীর—আমি একাই যেতে পারব।

বড়দা তার জ্যাঠামশাইয়ের ছেলে। উত্তরের জমির টাকাটা পেলে বড়দা ঠাকুমাকে নিয়ে রওনা হবে। তখন যারা বাড়িঘর কিনে নিয়েছে, কথা আছে তারা সব তুলে নিয়ে যাবে। একটা অজানা অচেনা জায়গায় গিয়ে সবাই উঠেছে, টাকার বড় দরকার। যে-করে হোক যতটা নিয়ে যাওয়া যায়। বাবা জ্যাঠামশাই কিংবা ছোট কাকা তাদের বসবাসের জায়গা ঠিক করতেই ব্যস্ত। উত্তরের জমির টাকা পেলে দাদা ঠাকুমাকে নিয়ে রওনা দেবে। কটা মাস তার কাছে মনে হয়েছিল, অনেক দিন। যেন এত বড় অপেক্ষা তার জীবনে শেষই হবে না। সে বলেছিল আমি ঠিক পারব।

এই পারাটা এত কষ্টের সে জানত না! নারানগঞ্জ স্টিমারঘাটে নেমে সে একবার সবার অলক্ষ্যে কেঁদেই ফেলেছিল। যদি হারিয়ে যায়! যদি বুঝতে না পারে কোন স্টিমারে উঠতে হবে। সব

মানুষজনই তখন তার কাছে কেমন আতঙ্কের শামিল। আর কি ভিড়। মানুষের মাথা গিজগিজ করছে। কত রকমের লটবহর। কেউ কেউ দুদিন থেকে লটবহর নিয়ে বসে আছে। মেল স্টিমারে ওঠা দায়। মেলে উঠে মনে হয়েছিল, এ-স্টিমার আর গোয়ালন্দ পৌঁছাবে না। কেমন আতঙ্ক পদ্মায় ডুবে না যায়! কেউ জানতেই পারবে না, টিনের স্যুটকেস হাতে নিয়ে এক বালক পদ্মার জলে ডুবে গেছে। সে সব ভয় আতঙ্ক পার হয়ে শেষ স্টেশনে আজ পৌঁছে গেছে। সকালবেলার ঠাণ্ডা আমেজ, রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সব হাওয়া। মরুভূমিসদৃশ মনে হয়। গরম হাওয়ায় মুখ পুড়িয়ে দিচ্ছে। সে হেঁটে যাচ্ছিল।

কিছুটা হেঁটেই মনে হল, গরুর গাড়ির লিকটা মিলিয়ে গেছে। এই লিক ধরে বাবা তাকে যেতে বলেছে চিঠিতে। সামনে একটা যেরি। সর্বত্র কাঁটাঝোপের জঙ্গল। পায়ে হাঁটা পথ পর্যন্ত নেই। সে কেমন ঘাবড়ে গেল। পেছনের দিকে তাকাল। ক্ষুধায় তেষ্টায় জিভ টানছে। শেষ খাবার কাল রাতে সে খেয়েছে। গোটা চারেক চিড়ের মোয়া ছিল, তাই খেয়ে স্টেশনের কলে জল খেয়েছিল। এত রোদ এবং তাপপ্রবাহ ভেঙে নতুন দেশবাড়িতে পৌঁছতে হয় সে জানত না।

স্টেশনটা এখন বেশ দূরে। বেশ পেছনে পড়ে আছে। যত সে যাচ্ছে তত স্টেশনটা মাথার ওপর আকাশের গায়ে ছবির মতো দেখাচ্ছে। ছিমছাম লাল ইটের বাড়ি, দু-পাশে দুটো সিগন্যালের থাম, সারি সারি কৃষ্ণচূড়া গাছের মধ্যে কেমন ভেসে আছে ছবিটা। রেললাইনটা একটা অর্ধাকার বৃত্ত হয়ে গেছে। সে যে খুব নিচু জমিতে নেমে এসেছে বুঝতে পারছে। লোকজন নেই যে জিজ্ঞেস করে। দূরে অদূরে রোদের ঝিল্লি ভেসে যাচ্ছে—প্রায় মরীচিকার মতো—যেন সামনে অফুরন্ত জলরাশি। বুকে পিপাসা জন্মালে এমন হয় সে জানে। এত রোদ যে মাঠে রাখালী করতেও কেউ আসেনি। গ্রামটা কোন দিকে হবে। সে পথ ভুল করেনি তো।

সামনেই ডাঙা মতো জমি, কিছু হিজল গাছ। হিজলের ছায়ায় সে উঠে যেতেই দেখল ডানদিকে বড় একটা ঘেরি। তার উপর সারি সারি কুঁড়েঘর। মানুষের বাস। গাছপালা নেই—শুকা মাঠে সেইসব ঘরবাড়ি রোদে পুড়ছে। মরুভূমির মধ্যে যে মরূদ্যান থাকে এখানে তাও নেই। নিচে নদী। ব্রাহ্মণী কিংবা দ্বারকা হবে। দূর দিয়ে একটা গরুর গাড়ি যাচ্ছে। মাথায় টোপর পরে আছে মত ছই। গাড়িটা নদী পার হয়ে যাচ্ছে।

এ এক অন্য পৃথিবী। দেশবাড়ির মতো গাছপালার ছায়ায় ঘরবাড়ি ঢাকা নেই। নতুন আবাস বোধহয় এ রকমেরই হয়ে থাকে। সে তার দুদিনের যাত্রায় দেখেছে, কী সুন্দর শহর, বাঁধানো পথঘাট, বড় বড় সব দালানকোঠা, খেলার মাঠ ফুলের বাগান। মানুষের জন্য এতসব থাকে সে আগে জানত না। তার মনে হয়েছিল বাবা কাকারা এদেশে এসে এমনই সুন্দর কোন ঘরবাড়ি করে বসবাস করবে। সে কেমন দমে গেল। তবু মনের এক কোণে গভীর এক আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠছে। মা তার সেখানে পথ চেয়ে বসে আছে। সে বুকে বল পেল। ক্ষুধাতেষ্টার কথা ভুলে গেল। পড়ি মরি করে ঝোপ-জঙ্গল ভেঙে যাবার সময় মনে হল সরসর করে কি সরে যাচ্ছে। চিঠিতে বাবা লিখেছিলেন, এখানে এলে চারপাশে সতর্ক নজর রাখবে। তার সংবিৎ ফিরে আসায় কিছুটা ধীর গতি হয়ে গেল সে।

ডাঙা জমি থেকে নিচে নামতেই সব আবার অদৃশ্য হয়ে গেছে। চক্রাকার বাঁধের মতো চারপাশ যেন ঘেরা। নিচে সবুজ ঘাস মাটি স্যাঁতস্যাঁতে। জলজ ঘাসের মতো কিছু মাড়িয়ে সে যাচ্ছে। মগজের মধ্যে কম্পাসের কাঁটা ঘুরছে। দিক নির্ণয় সে ঠিকঠাক রেখে এগোচ্ছিল। এমন সুষমার মাঠ সে অনেকদিন একসঙ্গে হাঁটেনি। কেমন এক ব্যাপ্ত গম্ভীর বিস্তার এই হিজলের, চিঠিতে বাবা এমন লিখেছিলেন, হিজলের বিলে হাজিদের ঘোরতে আমাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই। পরাপরদির বৃন্দাবন কর, হাইজাদির ঘোষেরা এবং

তাদের আত্মীয়স্বজন মিলে নতুন একটা গ্রামের পত্তন করা হয়েছে। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের প্রতিবেশী বড় দরকার। সে কুঁড়েঘরগুলো দেখেই বুঝেছিল, কোন নতুন সভ্যতার পত্তন শুরু হয়েছে এই হিজল বিলে। মানুষের অগম্য কিছু নেই।

নিচু জমি ভাঙার সময় কিছু কীটপতঙ্গ নজরে এসেছে। ফড়িং প্রজাপতি সব। চেনা এরা। কিছু পাখিও সে দেখল। ঝাঁক বেঁধে মানুষের সাড়া পেয়ে উড়ে যাচ্ছে। হলুদ ঠোঁট সাদা ডানা, সবুজ পেটের দিকটা। বালিহাস হতে পারে। ওরা স্যাঁতসেঁতে জলা-জমিতে খুঁটে খুঁটে কি খাচ্ছিল। নীলাভ আকাশের নিচে ওদের উড়ে যাওয়া দেখে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সে। তারপর আবার ডাঙা মতো উঁচু জমিটায় উঠে আসতেই দেখতে পেল, কুঁড়ে-ঘরগুলি যতটা লাগোয়া মনে হয়েছিল ততটা আর নেই। ফাঁকা ফাঁকা। এগুলিই বুঝি তবে ঘেরি! চারপাশে বাঁধ দিয়ে জল আটকে রাখা, তারপর চাষ আবাদ। হাজার দু-হাজার বিঘে জমি নিয়ে বিলের মধ্যে চাষ আবাদের জন্য ঘেরিগুলি কারা কবে তৈরি করে গেছে—এ সব ভেবে সে কিছুটা রোমাঞ্চ বোধ করল।

সে যত এগিয়ে যাচ্ছিল, তত প্রবল উৎসাহ সঞ্চার হচ্ছে মনের মধ্যে। মনে হচ্ছে বাপ কাকারা সৌরলোকের এক ছোট্ট গ্রহাণুতে এসে উঠেছেন। শহর গঞ্জ থেকে দূরে প্রকৃতির নিষ্ঠুর লীলার মধ্যে মানুষগুলোর নিত্য খেলা। সেও তাদের একজন। প্রকৃতির লীলা খেলার কথা তার অজানা নয়। তবু কোথায় যেন ফেলে আসা দেশ-বাড়িতে নিশ্চিন্ত এক নিরাপত্তা ছিল। মানুষ মানুষের বৈরী হয়ে যায়—দেশবাড়ি ছাড়তে হয়, এভাবেই মানুষ বোধহয় বার বার তাড়া খেয়ে কোন এক অগম্য স্থানে নিজেদের ঠাঁই করে নেয়। ফলে সুদূর দ্বীপমালায়ও মানুষের ঠাঁই হয়ে যায়। পৃথিবী এভাবেই মানুষের ঘর-বাড়িতে ভরে গেছে। স্টেশন থেকে নেমে সে যতটা নিরাশ হয়েছিল, এখন আর তা নেই। কতক্ষণে কাছাকাছি পৌঁছবে, দ্রুত

ফের পা চালিয়ে সামনের নদীটা পার হতেই মানুষজন চোখে পড়ছে। সে ডেকে উঠতে চাইল, বাবা আমি এসে গেছি।

মনে হয় দূর থেকেই তার আগমনের প্রতি কারো লক্ষ্য ছিল। কাছাকাছি আসতেই সে ছুটো একটা বৃক্ষও দেখতে পেল। হিজল-গাছ বোধহয়। গাছের নিচে মানুষজন জড় হচ্ছে। প্রথমে একজন পরে দুজন আরও পরে অনেকে এসে গাছটার নিচে দাঁড়িয়েছে। নারী পুরুষ প্রভেদ করা যাচ্ছে না। কিছুটা আরও এগিয়ে গেলে বুঝতে পারল, ভিড়ের মধ্যে কোন পুরুষ নেই। কেউ একজন ভিড় থেকে নেমে আসছে। পেছনে পঙ্গপালের মতো কাচ্চা বাচ্চারা ছুটছে। সে বুঝতে পারল গাছের নিচে তার মা দাঁড়িয়ে। রোদে যতই ঝিলিমিলি থাকুক সে যত দূরেই থাকুক, বুঝতে পারে মা ধীরে ধীরে নেমে আসছে। ডাঙা জমি থেকে মার ঘ্রাণ সে যত দূরেই থাক ঠিক টের পায়। বাক্সটা নিয়ে হাতে কাবলি সু নিয়ে সে দৌড়তে থাকল। প্রিয়জনের কাছে ফিরে আসার এমন এক অপার আনন্দ থাকে সে আগে কখনও জানত না। তার চোখ ফেটে আনন্দে জল এসে গেল।

হাজিদের ঘেরির ডাঙা দখল নেওয়া নিয়ে যে সংঘর্ষ হবার কথা ছিল শেষ পর্যন্ত তা আর হয়নি।

মানুষজন দেশ ছাড়ছে। হাজিরা ঘেরির ডাঙা বিক্রিবাটার চেষ্টা করছিল পারেনি।

প্রায় বলতে গেলে কিছু মানুষের কাছে এটা রাষ্ট্রবিপ্লব। কাতারে কাতারে মানুষজন দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে। চিন্তাহরণ যেমন এক দঙ্গল নিয়ে এই ঘেরিটার পাশে এসে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বলেছিল এখানেই আমাদের নতুন আবাস গড়ে তুলতে হবে তেমনি হাজিরা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে দেশ ছাড়া হয়েছিল। ঘেরির ডাঙা জলের দামে বিক্রি করাও শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। এই সুমার বিলে ঘেরির দখল

থেকে চাষ আবাদ সবই লাঠির জোরে। তার উপর উপদ্রবের শামিল উদ্বাস্তুদের ভিড়। যেখানে সেখানে বসে যাচ্ছে। পতিত জমি আর ডাঙা পেলেই হল, একটা অলিখিত আইনও চালু হয়ে গেছিল। আইনটার নাম জবরদখল স্বত্ব। চিন্তাহরণ মল্লিক দেশে থাকতে কোর্টে স্ট্যাম্প ভেণ্ডারের কাজ করত। আইনের কারচুপি তার রক্তে। এতবড় একটা ঘেরির ডাঙা বিনা সংঘর্ষে দখলে আসবে তার কল্পনার বাইরে।

যারা প্রথম দখলদার ছিল পরে তারা আরও লোকজন দেশ থেকে নিয়ে এসেছে। কারণ এত বড় ঘেরির ডাঙা শেষ পর্যন্ত দখলে রাখতে গেলে জনবলের দরকার। শেষের দিকে জমি বিক্রিবাটাও হয়েছে। এসব অবশ্য অনেক পরেকার কথা। যা হয়, মানুষ মাথার ওপর খোলা আকাশ নিয়ে বেশি দিন বাঁচতে পারে না। ঘরবাড়ি বানাতে হয়। পানীয় জলের বন্দোবস্ত করতে হয়, চাষ আবাদ, গরু বাছুর, গাছপালা হাটবাজার সব কিছুর দরকার। সব হবে এখন এই আপ্তবাক্য সার করে পুরুষরা জমি খননের কাজে লেগে গেছে। কারণ দুদিন হল, এই পল্লীতে বড় বেশি জল সংকট চলেছে। দ্বারকা থেকে বালি খুঁড়ে পানীয় জল আনা হচ্ছিল, এখন তাও পাওয়া যাচ্ছে না। যে যার কোদাল গাঁইতি নিয়ে মাটি খননের কাজে লেগে গেছে। জলের জন্য প্রয়োজন হলে পাতাল পর্যন্ত যেতে রাজি। দিব্যেন্দু গাছের নিচে এ জন্য কোন পুরুষ মানুষকে দেখতে পায়নি।

মা তার হাত থেকে টিনের বাক্সটা নিয়ে এগোচ্ছে। সে বলল, কি রোদ মা। একটা গাছ নেই। আমার তেষ্টা পেয়েছে।

করুণা বলল, আয় দেখি।

পাশে যারা হাঁটছিল সে তাদের কাউকেই বড় একটা চেনে না, কেবল উষা তার জাঠতুতো বোন এবং একটি ছেলে বেশ সুন্দর দেখতে হাত থেকে কাবলি সু জোড়া নিয়ে বলল, আমার নাম পটল। উষাদি আমার দিদির সই।

বেশ একটা কোলাহল চলছিল তাকে কেন্দ্র করে। বৌরা বলাবলি করছিল মধু রায়ের ছেলে। মাকে বলছিল, বলছি না দিদি, ঠিক চিনে আসতে পারবে। তুমি কী না দুশ্চিন্তা করছিলে!

করুণা ছেলের মুখের দিকে ভালভাবে তাকাতে পারছে না। মাত্র এক বছরে ছেলে তার আরও কত বড় হয়ে গেছে। লম্বা বাপের মতো চোখ মুখ। তার ইচ্ছে হচ্ছিল তক্ষুনি ছেলের ঘামে জবজবে মুখ আঁচলে মুছিয়ে দেয়। কিন্তু এত লোকজনের সামনে এটা করতে তার সংকোচ হচ্ছিল।

করুণা মাঠ ভেঙে ডাঙা জমিতে ওঠার সময় বলল, ঠাকুমা কেমন আছে।

দিব্যেন্দু সব দেখছিল। মার কথা শুনতে পায়নি। সে এই জনজীবনে আর একজন নবাগত। সবাই তাকে যেন বরণ করে তুলে নিচ্ছে। হাসি মসকরাও করছে কেউ। দিদি, তোমার ছেলে হারাবার নয় গো।

কেউ বলছিল তোমার মা কাল থেকে কেবল উসখুস করছে।

আসলে সে বুঝেছে তার আগমন নিয়ে এই নতুন জনপদে সবারই কৌতূহল ছিল। সে যে পৌঁছে গেছে এই খবর দিতে পটল আগেই দৌড়ে কোথাও ডাঙা জমিতে ছুটে গেছে। তাকে আর দেখা যাচ্ছে না। যেন বাড়ি বাড়ি সে খবরটা পৌঁছে দেবে। ডাঙা জমিতে ওঠার মুখেই কিছু ঘরবাড়ি। নিকোনো দাওয়া, হাঁস কবুতর। গরু বাছুর। যাযাবর জীবনেও বোধ হয় এ সব লাগে। খড়ের ছাউনি। বাঁশের বেড়া। খোপ খোপ জানালা। বাড়ির বাইরে সবাই দাঁড়িয়ে। খবর পৌঁছে যাবার মতো অথবা কোন ডাকপিওন তার ঝোলায় এক সুখবর বয়ে এনেছে। সবারই প্রশ্ন এই সেই ছেলে।

দিব্যেন্দু ভাবল সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে এসেছে, খুব মেধাবী ছাত্র এমন হয়তো চাউর হয়ে গেছে সর্বত্র। তার দিকে ছেলে বুড়ো সবাই

বড় কৌতূহলী চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে। সে কিছুটা লজ্জায় পড়ে গিয়ে, সব কিছু আর ভালভাবে দেখতেও পাচ্ছে না। পরনে ফুল প্যান্ট হাফ শার্ট। পা খালি। ফোসকার জ্বালাবোধ নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে যাওয়ায় কম। সে জল তেষ্টায়ও যেন আর ততটা কাতর নয়।

সামনের বাড়িটায় করুণা ঢুকে বলল, জল আছে পার্বতী?

জল সবাই চুরি করে সংরক্ষণ করে। জানতে দেয় না, জল আছে কি নেই, এ হেন সময় জল চাওয়া বড় গর্হিত কাজ করুণার কথাবার্তায় তা ফুটে উঠেছে। করুণা ফের বলল, থাকলে দে, আমাদের ঘরে এক ফোঁটা জল নেই। ওর ছোট কাকা জল আনতে গেছে।

দিব্যেন্দু মার এই কাতর উক্তিতে কেমন ঘাবড়ে গেল। বাপ কাকারা এ কেমন দেশে এসে বাড়িঘর বানিয়েছে। একটু জলের জন্য তার মার চোখে অপার দুঃখ। সে বলল, তুমি এসো তো মা।

আর ঠিক এ সময় কেউ বের হয়ে এল। এনামেলের তোবড়ানো গ্লাসে বরফের মতো ঠাণ্ডা এক গ্লাস তরমুজের রস। মেয়েটির গায়ে ফ্রক। চুল ঘাড় পর্যন্ত। চোখ বড় বড়। ভরাট মুখ। আশ্চর্য সুষমা সারা অঙ্গে। এমন দাবদাহে এ হেন বালিকা দর্শনে দিব্যেন্দু কিছুটা মুগ্ধ, কিছুটা হতচকিত। পার্বতী রস দেবার সময় বলল, ভিতরে আসুন। বসে খান। মার সঙ্গে আর যারা ছিল তারা সবাই প্রচণ্ড উত্তাপ থেকে মাথা বাঁচবার জন্য ঢুকে গেল। সেও পারছিল না। ভিতরে ঢুকে গেলে পার্বতী একটা জলচৌকি এগিয়ে দিল। আঃ এত আরাম, এত তৃপ্তি, জীবনে দিব্যেন্দু কোনদিন অনুভব করেনি। মা বলল, উষার সই। ওর মা নেই। বাবা মাটি খুঁড়ে জল আনতে গেছে।

বছর খানেকের মতো এই জনপদের সৃষ্টি। এখনও কোন পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়নি, অথচ মানুষগুলো বেঁচে আছে। দিব্যেন্দুর

কেমন ভয় ধরে গেল। সে ভেবেছিল, বাড়ি পৌঁছে স্নান, তারপর আহার, তারপর ঘুম। দু-রাত সে জেগে আছে। ভয়ে ঘুম আসেনি। তার আবার শরীর কেমন ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে আসছিল। এই মরুসদৃশ জায়গায় বাপ কাকাদের বসবাস কিছুটা নিবুর্দ্ধিতার পরিচয় এমন মনে হল তার। সে মার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা স্নানটান কর না?

মার কথার আগে পার্বতীই বলল, ঘেরির নাবুতে জল আছে। ওখানে আমরা সবাই স্নান করি।

বালি খুঁড়ে যে পানীয় জল আনা, তা এখন নিখোঁজের মুখে। সবাই আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শ্রান্ত। শেষমেষ সবাই ছুটে গেছে ঘেরির ভেতরে। সেখানে মাটি খোঁড়া হচ্ছে। পাতকুয়ো বসানো হচ্ছে। সবল পুরুষেরা সবাই এখন সেখানে। খবর নিয়ে আসছে কেউ। জল বিকেলেই মিলবে। নতুন জনপদে তার আসার চেয়ে এটা আজ আরও কত বড় খবর বাড়ি ঢোকার মুখে দিব্যেন্দু সেটা টের পেল। নিদারুণ সংগ্রামে প্রকৃতি যদি বশ মানে। সে আরও যা খবর পেল—তাতে কিছুই এখানে স্থায়ী হয় না। এই পাতকুয়ো কাজ চালিয়ে নেবার মতো। রুক্ষ এই প্রান্তরে বর্ষায় ঢল নামলে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তখন সব জলে জলময়।

ঘেরির উপরেও কিছু করা যায় না। ঘেরির ডাঙা জমি নিচের জমি থেকে বড় বেশি উঁচু। জলের নাগাল পাওয়া কঠিন। দুটো টিউকলের কোনোটা দিয়ে এক ফোঁটা জল পড়ে না।

সে যেন পড়েছিল কোথায় জলের অপর নাম জীবন—এই কাঠফাটা রোদে ঘরের ভেতর মাদুরে চিৎপাত হয়ে শুয়ে সেটা বড় বেশি আজ মনে হল। ঠাণ্ডা তরমুজের শরবত আবার মা দিলে সে প্রথম টের পেল, প্রকৃতি কিছু না কিছু জীবন ধারণের জন্য সব সময় রেখে দেয়। চার ভিটেতে চারটা ঘর। জেঠিমা, সোনা কাকিমা, ছোট কাকিমা সব তাকে ঘিরে বসে আছে। দেশের খবর জানতে চাইছে।

এখানে এত বড় একটা বিপর্যয় চলছে জলের, মা জেঠিদের কথায় তা টের পাওয়া যাচ্ছে না। আসলে বোধ হয় অভ্যাস। সে উঠে গিয়ে এখন ঘরগুলি দেখার জন্য এ-ঘর ও-ঘর করছে।

রান্নাবান্না খাওয়া সবার নটার মধ্যে সারা। তারপর মাটি এত তেতে যায়—কারো পক্ষে বের হওয়া কঠিন। মা জেঠিদের দেখে সে বুঝতে পারল খুব সকালে তারা স্নানটান সেরে ফেলেছে। দেখল গোলাঘরের এক কোণে তরমুজের পাহাড়। এখানে এই জমিতে তরমুজ বড় বেশি ফলে। এসেই মানুষজনেরা আগেই বোধহয় এটা টের পেয়ে গেছিল। যেখানে যে লতানে গাছ দেখল, সব তরমুজের। আর বড় বড় সব তরমুজ ঠাণ্ডা জলের কত বড় বিকল্প সে খেতে বসে তাও টের পেল।

তখন হল্লা চলছে। —নামাও, তুলে ধর। এই বগলা ওদিকের দড়িতে খুঁটি বেঁধে দে।

লোকগুলির পরনে গামছা প্রায় নেংটির মতো। চিন্তাহরণ মল্লিক ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। চুল শজারুর মতো খাড়া। চোখ জবা ফুলের মতো লাল। পিঠ বাঁকা আর লম্বা উপবীত গলায়। ধুতির কোঁচা কোমরে গোঁজা। মধু রায় উপেন রায় পাশে দাঁড়িয়ে হুকা খাচ্ছে।

ভিড় থেকে কেউ একজন বালতি ভরে জল নিয়ে এল। জলের উপর তিনজনই ঝুঁকে পড়েছে। দেখছে। স্ফটিক জল হতে আর কতটা বাকি। বালি মোটা কি সরু, আর কতটা খনন করা দরকার—এই জল জীবন, জীবনের জন্য প্রতীক্ষা সবার। মানুষ না পারে কি!

মধু রায় বলল, শুনছেন মল্লিক মশাই।

চিন্তাহরণ দু হাত পেছনে রেখে তাকাল।

দিবু এসে গেছে।

যাক, আর একজন আমাদের লোক বাড়ল। তারপরই প্রশ্ন. এখান থেকে পড়বে কোথায় ?

উপেন রায় লম্বা রোগা মানুষ। চুল কাঁচাপাকা। রাশভারি মানুষ। বোঝাই যায় তিনি কোন পরিবারের গৃহকর্তা। মুখে গাম্ভীর্য অপার। মানুষের কাছ থেকে আজীবন সম্মান পেলে মুখে এক ধরনের মধুর গাম্ভীর্য তৈরি হয়ে যায়।

উপেন রায় চোখ তুলে চিন্তাহরণকে দেখলেন। তারপর বললেন, কেন রাজ কলেজ আছে। সেখানে যাবে।

হোস্টেলে রাখবেন ?

টাকা কোথায় ?

এই প্রশ্নটাই উপেন রায় বারবার ভেবে থাকে। টাকা কোথায়। দিবুটা এল। সে যদি কোন খবর নিয়ে আসে টাকার। দেশছাড়া হবার পর, টাকার অভাব এবং তার অস্বস্তিটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। মান সম্ভ্রম ইজ্জত রক্ষার্থে জীবনে বড় বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছেন। এবং সব সময় তাঁর মনে হয় কোন সুখবর ঠিক আসবে। পাতকুয়োর পাড় থেকে তিনি হাঁটা দেবার সময় বললেন, দেখি দিবুটার সঙ্গে যদি কিছু দেয়।

চিন্তাহরণ ডাকল, রায়মশায়।

উপেন রায় দাঁড়াল।

যদি খবর থাকে জানাবেন। লপ্তের জমিটা রেখে দেন। হাত-ছাড়া করবেন না। কথা বলা আছে।

তিনি জানেন, জমিটা রাখতে পারলে ভাল হয়। এদেশে আসার পর গ্রাসাচ্ছাদন নিয়েই বড় ভাবনা। নিজের দুটি ছেলেমেয়েসহ পরিবারে বেলায় বার চোদ্দজনের পাত পড়ে। খরচ বাড়ছে। আয়ের উৎস তেমন কিছু আর নেই। ছোটটা শহরে একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছে। শনিবার আসে। রবিবার বিকেলের ট্রেনে শহরে চলে যায়। রাস্তাঘাট দুর্গম। টর্চ বাতি ছাড়া রাতে চলাফেরা করা ভারি

বিপজ্জনক। সে শহর থেকে মসলাপাতি নিয়ে আসে। মসলাপাতির খরচটা ছোট সংসারে যোগায়। মেজটা কিছুই করে না। দেশে থাকতেও কিছু করত না। আবাদ দেখত। বড় বলিষ্ঠ জোয়ান এই ভাইটি। পুষ্ট গোঁফ।

ইচ্ছে ত আছে। তবে মল্লিক মশাই কোমরে জোর কম। বুঝতেই ত পারছেন।

সে বুঝি না!

উপেন রায় জানে, মল্লিক মশাই অত্যন্ত চতুর মানুষ। জমি কেনা বেচায় তার একটা বড় রকমের তহরি থাকে। যোগাযোগপ্রিয় মানুষ। টাকার গন্ধ যেখানে, মল্লিক মশাই সেখানে। খোঁজখবর নিয়ে হাল্দিদের সেরেস্তা গোপীনাথের সঙ্গে ইতিমধ্যেই বন্ধুত্ব পাতিয়ে নিয়েছে। গোপীনাথ যেনতেন করে বিক্রি কবলা করে দিতে পারলেই দু তরফে টাকা। চিন্তাহরণ লোকটি ফিকিরবাজ এবং মামলাপ্রিয়। তবু সব কাজেই তাকে ডাকা হয়। পাতকুয়ো বসানোর সময়ও উপেন রায় লোক দিয়ে খবর পাঠিয়েছেন, তিনি যেন আসেন। এতে করে উপেন রায় সবার মধ্যে কিছুটা সহযোগিতা তৈরি করতে চায়।

উপেন রায় ডাঙার দিকে উঠে যাবার সময় বললেন, লপ্তের জমিটা কত বিঘে হবে?

ত্রিশ বত্রিশ বিঘে হবে। দাগ খতিয়ান না দেখলে বলা যাবে না। আউশ ধান বিঘেতে দশ মণ করে হলে, এক চাষেই টাকা উঠে আসবে। দেখলেন তো, মা বসুন্ধরা দু হাত উজাড় করে এখানে ঢেলে দেয়।

হাঁটার সময় মনে হল, ঠিকই। প্রকৃতি দু-হাত ভরে মানুষকে দিতে চায়। তারপরই মনে হল, প্রকৃতি নির্দয় হলে দু-হাত ভরে মানুষের মাথায় সংকটও চাপিয়ে দেয়। এখানে বসবাসের আগে স্টেশনে কিছু লোক বলাবলি করছিল, আরে এই লোকগুলি কি পাগল। ঘেরিতে বাড়ি বানাচ্ছে। বান বন্যার ভয় নেই।

চিন্তাহরণ ভারি উৎফুল্ল হয়ে বলছিল, কী যে বলেন, জলের দেশের মানুষ। দশ হাত জলের নিচে ধান রুয়ে মা-লক্ষ্মীকে ঘরে রাখি। জল হলগে জীবন তারে ভয় করতে আছে!

মধু রায় দেখল তার বড়দা ডাঙার দিকে উঠে যাচ্ছে। পাতকুয়ার চাক গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে মরণ সরকার। মল্লিক মশাই ছাতা মাথায় ছুটে যাচ্ছেন চাক আবার পড়ে না ভাঙে। মরণের বড় বেশি কাজ দেখানোর বাতিক। দু'জনে নাও। লোকের তো অভাব নেই। কাদা মাখামাখি হয়ে আছে মানুষজন। মধু রায়ের মনটা এ-সব দেখতে দেখতে ভারি উসখুস করছিল। ছেলে আসার খবরে কিছুটা অন্যমনস্ক। কাজ ফেলেও যেতে পারছে না। কথা হবে। মল্লিক মশাই এই নিয়ে তলে তলে লোক ক্ষেপাবে। দেখলে তো, কাণ্ডটা। আমার একার দায়। জল তোরা খাবি না! তুই ভাই কেমন কাঁক বুঝে কেটে পড়ল।

আসলে এই বছর খানেকের মধ্যে দুই পরিবারে একটা অদৃশ্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। অথবা দ্বন্দ্ব। কে কতবড় মহাজন কিংবা রইস আদমি অথবা বলা যায় দেখরে বাহার—কে আগে যায়, কার ঘরে কত প্রাচুর্য, কিংবা বংশ ঘরানা এবং এই নিয়ে ভেতরে ভেতরে মন কষাকষি। মধু রায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল, এক পা নড়তে পারল না। কাজটা শেষ না করে যাওয়া ঠিক না। নতুন জনপদে পানীয় জলের ব্যবস্থার মতো পুণ্য কাজে হিস্যা বুঝে না নিলে ঘরে ঘরে কথা উঠবে—রায়েরা বড় স্বার্থপর। কোন কাজে যদি পাওয়া যায়।

মধু রায় শেষ জলটা দেখে বলল, কী বলেন, মল্লিক মশাই চমৎকার জল। ডালিমের রসকে হার মানায়। চাক বসানোর কাজে ভালে লেগে যাক। চাক নিচে বসছে, মাটি উপরে তোলা হচ্ছে। পলি মাটি। বেশ উঁচু ঢিবির মত হয়ে উঠছে। বিকালবেলায় বৌ-ঝিরা জল নিতে পারবে, খবরটাও পৌঁছে দেওয়া দরকার।

মল্লিক হাঁটুগেড়ে বসে জলটা দেখল। মধু রায় শেষ কথা বললে

ইজ্জত থাকে না। শেষ কথাটা তারই বলার দরকার। কেমন সংশয় প্রকাশ করে বলল, আর কিছুটা বালি তুলুক। জলের ঘোলাটে ভাবটা ঠিক কাটেনি।

মধু রায় বোঝে, এই হলগে চিন্তাহরণ মল্লিক। সে বোঝাতে চায়, তার কথাই শেষ কথা। সুতরাং সব ব্যাপারে তার আগাম মাতব্বরি —বড়দা সরল সোজা মানুষ, কথা উঠলে বলবে, ঠিক আছে। ওতে যদি লোকটা সন্তুষ্ট থাকে, থাক না। যা দিনকাল, মিলেমিশে থাকার বড় দরকার।

বড়দা বোঝে না, এই করে লোকটার অহমিকা দিন দিন বাড়ছে। আসলে বড়দার লাই পেয়ে লোকটা আজকাল অনেক কুকাজ করতে পর্যন্ত দ্বিধা করে না। বৌ থাকতে আবার একটা বিয়ে করার মতলবে আছে। বৌ রুগ্ন ঠিক, তাই বলে বালিকা বয়স পার হয়নি মেয়েটাকে জবাই—ঠিক কাজ না। স্যাঙাত আছে অনেক। বারান্দার চায়ের কেতলি বসানোই থাকে। সন্ধ্যায় আসর বসে। লোকটার গাঁজা ভাঙের নেশা আছে। মানুষের মাথায় হাত বুলাতে ওস্তাদ। আসলে বড়দা ভয় পায় মল্লিককে। ঘাঁটায় না। বিয়ে নিয়ে জোয়ান উঠতি বয়সের ছোকরাগুলি বড়দার কাছে এসে নালিশ করেছিল, বিপাকে পড়েছে বলে লোকটার এতবড় সর্বনাশ করবে, আমরা তা হতে দেব না।

বড়দা বলেছিল, হরেন বাপ হয়ে মত দিলে তোরা কিছু করতে পারিস না।

হরেন তো ওরই খায়। মত না দিয়ে যাবে কোথায়?

মল্লিকের ছেলে বাইরে থাকে, চিঠি দে, যদি কিছু ওরা করতে পারে। বড় ছেলে খুব লায়েক শুনেছি।

চিঠি গেছিল। লায়েক ছেলের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। ছোটগুলি তো বাপের চণ্ড রাগকে বড় ভয় পায়। আর তাছাড়া মল্লিক কূটবুদ্ধি ধরে। সে জানে বড় সুচারুভাবে কাজ উদ্ধার করতে

হয়। প্রৌঢ় বয়সে বিবাহ—কোনরকমে সাত পাক ঘুরিয়ে কন্যা উদ্ধার। হরেনকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করে বড় রকমের একটা পুণ্য কাজ করছে সে। হরেন বাড়ি বাড়ি এই খবর পৌঁছে দিয়ে বুঝিয়েছিল, খেতে দেবার মুরদ নেই কিল মারার গোঁসাই। তোমাদের আমি চিনি না!

হলে কি হবে, হরেনের কন্যেটি মাথা পাতছে না। মল্লিক জানে গা জোয়ারি কাজ না এটা। কন্যের মন ভেজানোর জন্য গয়নাগাটি দিচ্ছে। শহর থেকে শাড়ি এনে দিচ্ছে। কত বড় জবরদস্ত মানুষ সে এই নতুন জনপদে হাবেভাবে তা বুঝিয়ে দিচ্ছে হরেনকে। সে আছে বলেই হরেন মাতববরি করার মওকা পেয়ে যায়। যেমন হরেন নিচে না নেমে উপরে দাঁড়িয়েই ফরমাস করছে—বালতি, আরও একটা বালতি—দাড়ি ফসকে যাবে, ওঠাও ওঠাও এমন সব হল্লা চিৎকার তার। মধু রায়ের মজা লাগে। এতবড় বিপর্যয়ের পরও মানুষের আসল ঠিকানা পাল্টায় না। সে বলল, আমি যাচ্ছি মল্লিক মশাই।

দিবুর পরীক্ষা কেমন হয়েছে তার জানার আগ্রহ। তার মুখ দেখার আগ্রহ। সন্তান বড় হলে বাপের মর্যাদা বাড়ে। সেও হাঁটা দিল ডাঙার দিকে। কপালে হাত রেখে সূর্যের অবস্থান দেখল। যাবার সময় ঘরে ঘরে খবর দিয়ে গেল, কী ঠাণ্ডা জল! পাতাল থেকে তুলে আনা হচ্ছে যেন। একটা বোর্ড লাগাতে হবে। জলের অপচয় বন্ধ করুন। কুয়োর জলে চান নয়। শুধু খাবার জল বাদে অন্য কোন কাজে ব্যবহার করলে কুয়ো ব্যবহার বন্ধ। সন্ধ্যায় গ্রামসভা ডেকে এ-সব বলে দেওয়ার দরকার হবে।

রাস্তায় পার্বতী খবর দিল, কাকা দিবুদা এয়েছে।

এই জনপদে সে জানে ঘরে ঘরে এখন শুধু দিবুর কথা। দিবু শান্ত স্বভাবের ছেলে, কিছুটা উদাস—মেধাবী এবং সুপুরুষ। শৈশব পার করে সে এখন যৌবনের মুখে। ঘন চুল ভারি চোখ অনেক দূরের

দৃশ্য সব সময় যেন তার চোখে ভাসে। দেশ ছাড়ার কালে স্টিমার ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকার সময় দিবুকে এমনই মনে হয়েছিল তার। আর এক বছরে দিবু আরও কত না জানি বড় হয়েছে! পুত্রের প্রতি প্রবল স্নেহে সে কিছুটা অধীর! পার্বতীর কথার জবাব দিতে গিয়ে বলল, তুই দেখেছিস দিবুকে?

কাকিমা জল চাইল। জল তো নেই। তরমুজের রস করে দিলাম।

তোর বাবা আসছে। চাক লাগানো শেষ। বিকেলে জল পাবি।

বাবা সেই সকালে কিছু মুখে না দিয়ে গেল। বসে আছি।

পটলা তো কতবার গেল। খবর পাঠালি না কেন?

আপনি তো বাবাকে জানেন কাকা! কারো কথা শোনে না। মর্জি না হলে খাবে না।

রাগটাগ করেনি ত!

সেই তো। সকালে জল চাইল, কোত্থেকে দি বলুন। রস করে দিলাম ছুঁড়ে ফেলে দিল। কিছু খেল না। চলে গেছে, জল তুলতে না পারলে আর খাবে না।

তোর বাবাটা বড় গোঁয়ার। ভাবিস না। এসে যাবে। জল উঠেছে। বালতি করে জল নিয়ে আসবে একেবারে।

মধু রায় কপিলকে ভাল করেই জানে। মাথায় কিছুটা ছিট আছে। একটা পা কিছুটা সরু! পা টেনে হাঁটে। পাটায় ভাল জোর পায় না। অথচ কুয়ো কাটার সময় সে একাই একশ। সারা সকাল না খেয়ে কাজ নিয়ে মেতে থাকার মধ্যে সে কোথাও যেন একটা বড় রকমের দুঃখ ভুলে থাকতে চায়। দাদা দাদা করে। সে কপিলকে নাম ধরে ডাকে। অথচ মেয়েটা সেই ট্রেনে যে প্রথমে কাকা বলে সম্বোধন করেছিল সেটা আর পাল্টাতে পারেনি। কপিল সমবয়সী মানুষ। সংসারে কিছু মানুষ থাকে যারা লেপ্টে থাকতে চায় এবং এই লেপ্টে থাকার মধ্যে সে তার নিরাপত্তা খোঁজে এমন

একটা আপন করে নেবার স্বভাব আছে কপিলের। পার্বতীও বাপের স্বভাব পেয়েছে। দাঁড়িয়ে থাকলে অনর্গল কথা বলবে। কাকা, বাবা বলেছে সাঁটুই থেকে পুঁইয়ের বীচি নিয়ে আসবে। একটা কাঁঠালের চারা লাগিয়েছি। দুটো নারকেলের ডিগ বের হয়েছে। বাবা নাড়ু করতে বলেছিল, করিনি। ও দুটোও লাগিয়ে দেব। নতুন বাড়িঘরে গাছপালা লাগিয়ে আগেকার জীবনে ফিরে যেতে চায় মেয়েটা।

পার্বতীদের বাড়িটা বিঘেখানেক জমি নিয়ে। যে যার মতো বেড়া দিয়ে নিয়েছে। যতটা যে দিতে পেরেছে ততটাই তার সীমানা। ফটকি বোনদির বাড়িটা পার হবার সময়ই গলা পেল, কে যেন ডাকে মধু নাকিরে!

হ্যাঁ বোনদি, কিছু বলবে?

জল তুলতে পারলি?

খুব ভাল জল উঠেছে। বিকেলে নিয়ে এস।

বেঁচে থাক ভাই। কতদিন জল পাই না। ও পার্বতী, গলা চেঁচিয়ে ডাকতে থাকল, আমাকে কুয়ো থেকে ঠাণ্ডা জল এনে খাওয়াবি!

ফটকিবোনদির কেউ নেই। একা মানুষ। বনমালী বলে একটা ছোঁড়া মাঝে মাঝে আসে। পিসি পিসি করে। থাকে খায়। ছোঁড়াটার পার্বতীর উপর নজর পড়েছে। সেই টানে মাঝে মাঝে ক্যাম্প থেকে চলে আসে। তবে কি যে হয়, কিছুদিন গেলেই আর পিসির সঙ্গে বনিবনা হয় না। হাড় জিরজিরে চেহারা ছোঁড়াটার। গলায় কালো কারে তাবিজ। রোজ দাড়ি কামায়। শুনেছে, পার্বতীকে দেখে দু'একবার শিসও দিয়েছে। উষা ওর কাকিমাকে বলেছিল—কানে সেই থেকে কথাটা উঠেছে। কপিলকে বলেছিল খোঁজখবর নিয়ে দেখ—যদি হয় বসিয়ে দাও। উঠতি বয়েসে মতিভ্রম হয়। গলায় ঝুলিয়ে দিলে সব কেটে যায়। এই নিয়ে তেড়েফুঁড়ে যাবে না। পুরুষের কোন দাগ লাগে না। মেয়েদের বেলায় দাগ ওঠানো দায়।

কপিল উত্তেজিত হয়ে বলেছিল, কোথাকার কোন ছোকরা জাত ধর্ম জানি না, বলছ বসিয়ে দিতে ?

খোঁজখবর করে দেখ না। কে জানে বাপের হয়তো সেই সুপুত্তুর! এখানে এসে তো দেখি খুব পয়সা ওড়ায় ইয়ারবন্ধুও জুটে গেছে।

কপিল আরও ক্ষেপে গেছিল—তোমরা কি, হ্যাঁ তোমরা আমার কচি মেয়েটার মাথা খেতে চাও!

মধু রায় জানে, কপিলকে এমন বলা তার ঠিক না। কিন্তু এও জানে এমন একটা সুমার মাঠে পার্বতী যুবতী হলে কপিলের শান্তিতে টিকে থাকা দায় হয়ে উঠবে। গরীব মানুষ খাটতে পারলে ভাত। হাল লাঙ্গল নেই। চেয়ে-চিন্তে, কখনও বেগার দিয়ে জমির হাল বলদের সংস্থান করতে হয়। শুধু কোদাল চালিয়ে দু-বিঘে জমিতে চাষ তুলেছিল কপিল। একটা পা দুবলা বলেই বুঝি ভগবান অন্য জায়গায় সব পুষিয়ে দিয়েছেন। অসুরের মত বল, কথায় কথায় বলবে, আমরা হলামগে সিতাই হাটের চক্রবর্তী। কপাল ফেরে এই। দাদা, তোমার পায়ে পড়ি অমন কথা আর তুল না। মগজে আগুন ধরে যায়।

বাড়িতে ঢুকলেই সোনা বউ বলল, জল উঠল।

জল, কত জল। কত খাবে। এমন একটা সুখবরে দিব্যেন্দুও ঘর থেকে বের হয়ে এল। তার চান হয়নি। গরমে হাঁসফাঁস করছিল!

খেতে বসলে সোনাকাকি তাল পাতার পাখায় বাতাস করেছে। ঘামে জবজবে শরীর আঠা আঠা—দুদিন স্নান নেই খেতে বসে কেমন ওক উঠে এসেছিল তার। খেতে পারেনি। জল উঠেছে শুনে স্নানে যাবার জন্য রওনা হলে মধু রায় দেখল ছেলে সত্যি বড় হয়ে গেছে তার। গোঁফের রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দু রাত জেগে ট্রেনে আসায় চোখ কোটরাগত কিছুটা। ঘুমাতে পারলেই সব আবার সতেজ হয়ে যাবে!

ঘর থেকে বের হতেই দিব্যেন্দু দেখল, বাবা সামনে দাঁড়িয়ে। সে বাবাকে প্রণাম করল।

কোন অসুবিধে হয়নি ত ?

না।

মা ভাল আছেন ?

দিব্যেন্দু মাথা ঝাঁকাল।

তুলসী হুণ্ডির কথা কিছু বলেছে ?

দিব্যেন্দুকে এ প্রশ্নটা জ্যাঠামশাইও এসে করেছিলেন। সে একই উত্তর দিল।—না! জমা জমি, ঘরবাড়ি তুলসী মাঝি কিনে নিয়েছে। বড় অঙ্কের টাকা। বাপ-জ্যাঠারা আসার সময়, হাজার পাঁচেক টাকা ধরিয়ে দিয়ে বলেছিল, বেশি টাকা সঙ্গে নেবেন না কর্তাঠাকুর। দর্শনায় সব কেড়েকুড়ে রেখে দিচ্ছে। বাকি ছাব্বিশ হাজার টাকা গদির মারফতে পাঠানোই শ্রেয়। সেই শ্রেয় বোধে, উভয় পক্ষই রাজি হয়ে গেল। বছর পার হতে চলল, হুণ্ডির আর নামগন্ধ নেই। তাকে দেখার পর জ্যাঠামশাই এবং বাবার একই ধরনের প্রশ্নে বুঝতে পেরেছে, সংসারে টাকার টান ধরেছে।

মধু রায় বারান্দায় উঠে বলল, পরীক্ষা কেমন দিলে।

হয়েছে একরকম।

দিব্যেন্দু সব সময়ই পরীক্ষা সম্পর্কে এরকমই বলে, মধু রায় এতে বিচলিত বোধ করে না। যা দিনকাল, কোন রকমে পাসটাস করে কোথাও ঢুকে পড়া। যদি আরও পড়তে চায়, কী হবে জানে না! বড়দার ইচ্ছে দিব্যেন্দু রাজ কলেজে পড়ে। এই পড়ার সঙ্গে পরিবারের মর্যাদার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। বড়দাকে বেশি কিছু বলাও যায় না। একটা সুমার মাঠে উঠে এসেছে বলেই হাতে ঠোঙা সম্বল বড়দা মানতে রাজি ন। বাপ-ঠাকুর্দার আশীর্বাদে আবার সব হবে। বাপ-ঠাকুর্দার মর্যাদা, পরিবারের মর্যাদা এককালে কত ছিল, দিব্যেন্দুর মানুষ হওয়ার সঙ্গে তার যোগসূত্র কোথায় যেন খুঁজে পান

তিনি। এখানে বড় প্রতিপক্ষ চিন্তাহরণ মল্লিক! বাড়িতে লোকজন ইয়ার-দোস্ত নিয়ে মল্লিক যে এই নতুন জনপদে সবচে প্রভাবশালী ব্যক্তি প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছে। বড়দা ভেতরে জ্বালা বোধ করে। তিনি যে অসহযোগ আন্দোলনে জেল খেটেছিলেন, তাও আর এখন কাউকে বলেন না। স্বভাবদোষে খদ্দর ছাড়া পরেন না, স্বদেশীর এই চিহ্নটুকু বজায় আছে শুধু। এবং একটা হাতবাক্স। বাক্সে কিছু হোমিওপ্যাথির শিশি, সাদা গ্লোবিউল ভর্তি! আরাম-ব্যারাম সর্বত্রই মানুষের সঙ্গে যায়। তিনি ওটা সেজন্য কিছুতেই ছেড়ে আসেন নি। বড়দা মনে করে এ জায়গাটায় তার একটা জোর আছে।

মধু রায় ছেলেকে ডেকে বলল, কোথায় যাচ্ছ!

উষা, শেফালী, সেই থেকে দাদার সঙ্গ ছাড়ছে না। ওরাই বলল, ঠাণ্ডা জলে চান করব কাকা।

না ওখানে নয়। স্নান করতে হয় তালবাগানে নিয়ে যাও।

শেফালী উষা জানে, ওখানে হাঁটু জল। জল ঘোলা। খুব সকালে স্নান না করলে আরাম পাওয়া যায় না। দাদাটা তাঁর অমন ঘোলা জলে ডুবই দিতে পারবে না। আর রোদে জল তেতে আছে। তাপ উঠছে। ওরা বলল, কি হবে স্নান করলে। বালতি নিয়ে যাব।

না মা, হবে না! শুধু খাবার জল আনতে পারবে! চারপাশে দেখছ না. কী আগুন জ্বলছে! লু বইছে! তোমরা করলে, সবাই করবে। জলে টানাটানি পড়বে।

অগত্যা আর কী করে। একটা বুদ্ধি খাটাতে হয়। উষা পার্বতীকে ডেকে নিয়ে এল। দাদার জন্য দুঘড়া জল নিয়ে আসবে। বেলা পড়ে আসছে। দিব্যেন্দু দেখল, সেই মেয়েটা মাথা গোঁজ করে বের হয়ে যাচ্ছে তার চানের জল আনতে। পার্বতীর জন্য এ সময় সে কেমন এক গভীর আবেগ বোধ করল। এই সুমার মাঠে

গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে সব যখন জ্বলছিল, দিব্যেন্দুর কাছে তখন এক সবুজ নক্ষত্রের মতো পার্বতী আকাশে আলো দিচ্ছে। স্নানের পর লম্বা ঘুম দিয়ে উঠলে দেখল, জ্যোৎস্নায় চরাচর ভেসে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। দূরে কিছু তালগাছ—তার অস্পষ্ট ছায়া এবং ঘরে ঘরে লম্ফের আলো দূরাতীত রহস্যের মতো।

এক আলাদা নির্জন পৃথিবী। শ্বাপদেরা এখানে নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়ায়। তবু জনহীন প্রান্তরে নিশীথে মানুষের ঘরবাড়ির ছবির আলাদা একটা মাধুর্য আছে। দিনের দাবদাহে দিবু যা টের পায় নি, জ্যোৎস্নার প্রান্তরে দাঁড়িয়ে তা টের পেয়ে কেমন বিমূঢ় হয়ে গেল সে।

সকালেই দেখা গেল, বাঁধের উপর দিয়ে সাইকেলে কেউ আসছে। মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে বোধহয়, যে কোন মানুষের আগমনের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। একজন সাইকেল আরোহী এই গ্রামের দিকে উঠে আসছে কারো নজর এড়াল না। কোন খবর বয়ে আনতে পারে—অথবা লোকটা কার বাড়ি যাবে, এ-সব কৌতূহল এখানকার সব মানুষের। কপিল জমিতে কোদাল মারছিল। আগাছা বেছে আলে ছুঁড়ে দিচ্ছে। অথবা ঝুড়িতে আলাদা তুলে রাখছে। দূর্বা-ঘাস, বাদলা ঘাস জড় করে জলে ধুয়ে বাড়ি নিয়ে যাবে। গাভীন গরুটার জন্য এখন কচি কাঁচা ঘাস দরকার। মাঠ ফুটিফাটা, ঘাসের বড় আকাল। সে জমির আগাছা বাছার সঙ্গে গাভীন গরুটার ভাবনার হিল্লে করছে। সে কাজ করার সময় একটু বেশি মনোযোগী হয়ে পড়ে। কারণ জমি শুধু ফসল দেয় না, জমি প্রাণের চেয়েও বেশি দামি। জমি সরেস করে রাখতে না পারলে বর্ষায় জল ধরে রাখবে না ঠিক মতো। চাষ-আবাদ, খাটনি সব বিফলে যাবে। ঘরে একটা পয়সা সঞ্চয় নাই। সে যে তরমুজ তুলেছিল ভাল, পাইকার জলের দামে নিয়ে গেছে। একটা গরুর গাড়ি থাকলে সে নিজেই

নিয়ে যেত বেলডাঙার হাটে। কত আর দূর, ক্রোশ পাঁচেক হবে, তবে অত দূরে মাথায় করে নিয়ে গিয়ে পড়তা পড়ে না।

ভূঁস ভূঁস। কোদাল মারার সময় কপিল এমন শব্দ করছিল। ভূঁস ভূঁস অর্থাৎ এক জোড়া বলদ হাল। ভূঁস ভূঁস এক জোড়া হাঁস। ভূঁস ভূঁস, পার্বতীর সুন্দর বর। ভূঁস ভূঁস পটল স্কুলে যাবে। দরদর করে ঘাম ঝরছে তার। ভোর রাতে সে মাঠে নেমে এসেছিল। রোদ উঠলে মাটি আর কোপানো যায় না। গরমে মাথার চাঁদি ফেটে যায়। দৈত্যের মতো চেহারা কপিলের। হাতের দাবনা যেন ফুঁসছে মুখে ফেনা উঠছে। আর ভূঁস ভূঁস শব্দের মধ্যে তাঁর জীবনের স্বপ্নের কথা মিশে রয়েছে।

বাঁধের উপর লোকটা ক্রিং ক্রিং করে ঘণ্টা বাজিয়ে কপিলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইল। সামনে এই হারমাদ চাষের লোকটা—একটু যদি হুঁশ থাকে। সে ফের ঘণ্টা বাজাল। নিচে ঘেরির পতিত জমিতে এই একটাই লোক! খাঁ খাঁ রোদ্দুরে এমন হারমাদ লোকের পক্ষেই সম্ভব ঘরের বাইরে থাকা। বাড়িটা সে চেনে না। মাথায় সোলার হ্যাট। সে বড় অধৈর্য হয়ে পড়েছে। না পেরে ডাকল, ভাই!

কপিল দেখল অনেক উঁচুতে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক। সে কাউকে সহজে বাবু মানুষ ভাবতে পারে না। বাবু মানুষ সে নিজেও কম ছিল না। দাঙ্গায় সর্বস্বান্ত না হলে সেও একজন বাবু মানুষ! জমিজমা চাষ-আবাদ বাপ-দাদার রেখে যাওয়া সব মিলে, সে ছিল কপিল। দেশ ছাড়া মানুষের থাকে কি! সে কোদালটা কাঁধে ফেলে সটান দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে? কথার মধ্যে তেজ ফুটে উঠেছে তার।

তোমাকে নাত কাকে? বেশ হাঁকাড় দিয়ে সাইকেল আরোহী কথাটা বলল!

কপিল চারপাশে তাকাল। আশপাশের জমিতে যারা হাল

বলদ নিয়ে নেমেছিল তারা কেউ নেই। কাজে লাগলে সে খুবই বেহুঁশ হয়ে পড়ে। আর ঐটুকু। আর কটা কোপ। আর কিছুটা করে গেলে আসান। লোকটার কথাবার্তা ভাল না। তবু দিনকাল মন্দ—কাউকে সে চটাতে চায় না। সেও হাঁকড়ে বলল, বলেন।

মল্লিক মশাইর বাড়ি কোন দিকটায়?

ঐ যে টিনের চাল দেখছেন, ওটা।

এই বাড়িঘরে একটাই টিনের ছাউনি দেয়া বাড়ি। লোকটার মনে হল মল্লিক তাকে যেন কথাটা বলেও এসেছিল। গেলেই দেখতে পাবেন। টিনের চাল চারঘরের চার মাথায়। ওটাই আমার বাড়ি। মল্লিক মশাই বললে, একটা রাস্তার কুকুরও আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। কপিলকে কুকুর না ভাবলেও মানুষের ইজ্জত দিতে লোকটার বাধছিল। কপিলের পরনে গামছা। মাথায় অসুরের মতো কোঁকড়ানো চুল। সামনে পথ আগলে দাঁড়ালে বুকের রক্ত হিম হয়ে যাবার কথা। তবু সে যে এই লোকালয়ে একটা সুখবর নিয়ে এসেছে জানান দেবার জন্যই ফের হাঁকাড় দিল, কোন দিকটায় বলবে ত?

দেখতে পাচ্ছেন না! চোখ নেই।

লোকটার ইজ্জতে লাগল। সে সত্যি দেখতে পাচ্ছে না। বাঁধ এখানটায় মোড় নিয়েছে। হারামাদ লোকটার কথাবার্তা ভাল লাগছে না। যা একখানি কোদাল, রোদে চকচক করছে, ঘাড়ে বসিয়ে দিলেও কেউ দেখবার নেই। সে সুড়সুড় করে সাইকেলে উঠে গাঁয়ের ভেতর ঢুকে যেতেই বাঁকের মুখে শেষ প্রান্তে দেখতে পেল টিনের ছাউনি, প্রখর রোদে ঝলকাচ্ছে। সে গাঁয়ের ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছে। সাইকেল চড়ে কেউ গেলে খবর—খবর কেউ এলে, ঘরে ঘরে খবরটা রটে গেল—মাথায় হ্যাট পরা একটা লোক মল্লিক মশাইয়ের কাছে যাচ্ছে।

মল্লিক মশাই জানে আজ বিশ্বম্ভর আসবে। সে অনেক দূরে

সাইকেল আরোহী দেখেই বুঝেছিল, বিশ্বম্ভর আসছে। কিছুটা এগিয়ে যেতে পারত ছাতা মাথায় দিয়ে। ইচ্ছে করেই যায় নি। সবাই জানুক মল্লিক কাউকে তোয়াজ করে না। সবাই জানুক, মল্লিকের বাড়ি খুঁজে বের করতে হয়। বৈঠকখানা থেকে নেমে মল্লিক হাত জোড় করে বলল, আসতে আজ্ঞা হউক। কি সৌভাগ্য। আমাদের কথা তবে সত্যি মনে আছে আপনার।

হরেন কাঠের চেয়ার ছুটো বারান্দায় বের করে দিল। গাঁয়ে তিনখানা কাঠের চেয়ার। ছুটোর মালিক মল্লিক—একটা আছে রায়মশাইর বাড়ি। দরকারে ওটাও নিয়ে আসতে হয় মল্লিককে। আজ অবশ্য বিশ্বম্ভর একা। তাকে বসতে দিয়ে গলার পৈতাটা ছুবার এ'দকে ওদিকে করে নিল। কোন কারণে মল্লিক উত্তেজিত হলে এটা করে থাকে। বিশ্বম্ভরকে এখন হাওয়া করছে হরেন। এ-সব আগে থেকেই ঠিক করা আছে। এবং হরেনের এরপর আর কি কি কাজ তাও সে জানে।

বিশ্বম্ভর বলল, আপনারা সত্যি দেখালেন। ভাবা যায় না।

মল্লিক দেখল, গন্ধে গন্ধে ফটকি বুড়ি ধীরেনের মা, দীনবন্ধু মরণ সরকার সব হাজির। ওরা বাইরে তালগাছের ছায়ায় বসে আছে। মল্লিক তাদের জ্যান্ত ঠাকুর—যা কিছু করছে একা মল্লিক। শহরে হাঁটাহাঁটি ত্রাণ দপ্তরে ছোটাছুটি মল্লিক মশাই আছে বলেই সম্ভব হচ্ছে। মল্লিক চেয়ারে ছু'দণ্ড সুস্থির হয়ে বসতে পারছে না। একবার শুধু বিশ্বম্ভরকে উদ্দেশ্য করে বলল, দেখছেন ত ভিড় বাড়ছে। আগে কিছু মুখে দিন। বলে শরবত এবং এক গণ্ডা তালের শাঁস সামনে রেখে বিনয়ের অবতার হয়ে গেল।

বিশ্বম্ভর ব্যাগ থেকে কাগজপত্র বের করছে। একটা নামের তালিকা বের করে উল্টে পাল্টে দেখছে। নামগুলোর সঙ্গে আসল নামের মিল খুঁজে দেখার ভার তার। সে শরবত সবটুকু একটানেই মেরে দিয়েছে। তালের শাঁসগুলো ধরছে না। ঘরে ছুধ আছে—

মল্লিক এর পর এক গ্লাস দেবে ভাবল। মোয়া নাড়ু সাজিয়ে দেবে থালায়। কাজ নির্বিঘ্নে সারা নিয়ে এখন প্রশ্ন। সে বুঝেছে মানুষকে তোয়াজে না রাখতে পারলে কাজ উদ্ধার করা যায় না। এই মানুষটা লোন বের করার সব সন্ধান জানে। এখন কাজ শুধু তালিকার সঙ্গে মানুষগুলোর চেহারা মিলে যাওয়া নিয়ে।

বিশ্বম্ভর আসবে বলেই, সকালে মল্লিকের কিছু বাড়তি কাজ ছিল। দাড়ি কামানো বাড়তি কাজের মধ্যে পড়ে। খুব সকাল সকাল উঠে কাজটা সেরেছে। শহরে গেলেও তাকে সাফ-সুতরোর কাজটা তাড়াতাড়ি সারতে হয়। নাহলে গালে দাড়ির জঙ্গল গজিয়েই থাকে। পাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি—এই নিয়ে সকালে হল্লা গেছে কিছুটা। এত হম্বিতম্বি সত্ত্বেও জায়গার জিনিস জায়গায় থাকে না। নিজস্ব একটা কাঠের আলমারি তার দরকার। একটা ট্রাংকের মধ্যে জমি-জমার পরচা, দলিল-দস্তাবেজের কাগজ দোয়াত কলম সব। ওতে আর ধরে না। এবারে, তার ফন্দি মতো কাজটা উদ্ধার হয়ে গেলে হাতে অনেক টাকা। সে লোকজন ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছে। হরেনকে পাঠিয়েছে, ঘরে ঘরে খবর পৌঁছে দিতে—লোনের বাবু এয়েছেন। হাউজ লোন।

মরণ সরকার ঢুকে বলল, আমার নামটা দেখেন কর্তা আছে কিনা?

বিশ্বম্ভর বলল, কি নাম?

সে তার নাম বলল।

মল্লিক ইশারায় ডাকল মরণকে। মরণ কাছে গেলে বলল, কথা মনে আছে ত?

সে বলল, খুব বেশি হয়ে গেল।

বেশি কি রে! সই দে ব্যাটা।

মরণ বলল, রায় মশায়কে ডাকি।

ত্যাঁদড়। এত করে তার পরিণাম এই। মল্লিক ক্ষেপে গেল।

তোর রিফুজি কার্ড আছে ?

না।

তোর বর্ডার শ্লিপ আছে ?

না।

মল্লিকের মজ ভাল না। আকথা কুকথা বলেই ফেলত। কেবল সরকারের লোক আছে বলে বড় সমীহ করে কথা চালাচালি করছে। যেন খুবই মসকরার বিষয় অথবা আবাল মানুষ মরণ। বোঝে না। হাহা করা কৃত্রিম হাসি গলায়।—সরকার তোর বড়কুটুম নারে ?

না বলছিলাম, টাকার অর্ধেকটাই নিয়ে নেবে।

নেবে না বলছিস। হাঁটাহাঁটি, এখানে ওখানে গোঁজা দিতে হয়, খুঁটি ধরতে হয়, কার্ড নেই, বর্ডার শ্লিপ নেই—লবডঙ্কা সব তোদের হারামের পয়সা—পাইয়ে দিচ্ছে তার উপর কথা ! বিশ্বম্ভরের দিকে তাকিয়ে বলল, কত বড় মানুষ জানিস। তোকে এক কথায় পুলিশে দিয়ে দিতে পারে।

মরণ একেবারে চুপ মেরে গেল। পুলিশকে তার খুবই ভয়। তার কাগজপত্র কিছু নেই—সে সই করে দিয়ে ব্যাজার মুখে বের হয়ে গেল।

বারান্দার দরজায় মুখ বাড়িয়ে মল্লিক বলল, তোমরা সব বস। নাম ধরে ডাকবে। কারো নাম বাদ যায় নি। বিশ্বম্ভরের দিকে তাকিয়ে বলল, দেখলেন তো স্যাম্পলখানা।

এই ডাকাডাকির মধ্যে একবার বিশ্বম্ভর গম্ভীর মুখে মল্লিককে বলল, এতো মশাই বালিকা, এর নাম কেন ?

মেয়েটা জড়সড় হয়ে এক কোণায় দাঁড়িয়ে আছে। বাপের নাম লেখা হরেন ভৌমিক। ত্রাণের নামে যতই লুণ্ঠনের সুযোগ থাকুক, একজন বালিকার নামে লোনের টাকা স্যাংশন করতে বিশ্বম্ভরের মতো জাঁদরেল মানুষেরও হাত কাঁপছিল। সংশয় দানা বাঁধলেই প্রশ্ন, নাহলে মল্লিকের কথাই শেষ কথা। মল্লিকই এ অঞ্চলের অলিখিত

সরকারী স্ট্যাম্প। ওর স্ট্যাম্প থাকলে, চোখ বুজে বিশ্বম্ভর সই করতে পারে। কংগ্রেস মহলে হরদম হাঁটাহাঁটি। কোথাও আটকে গেলেই, মল্লিক বলবে, সুরেশদাকে তালে বলব। বাস হয়ে গেল। সরকারী কর্মচারীর এক কথাতেই পিলে চমকে যায়। তারও চমকে ছিল। পরে মল্লিক বুঝিয়ে বলেছে আরে মশাই আমিওতো মানুষ। দোষে গুণে সব। অত ধরলে হয়। যে নিয়মে যা হয় তাই করবেন। কেবল দেখবেন, আমার হাতটা না তুবলা হয়ে যায়। সে বলল বালিকা না, গায়ে-গতরে তেমন বাড়েনি। তবে বাড়তে শুরু করলে—কোথায় শেষ কেউ জানে না। নারী বলতে পারেন। বিধবা : দশ নং কলজে বিধবার জন্য ত্বটো লাইন লেখা আছে।

বিশ্বম্ভর আর কথা বাড়াল না। নামের পাশে টিক মেরে দিল। সই নিল। এই করে মল্লিকের তিন নম্বর গোলমেলে কেস উৎরে গেল। আর তুটো কেস আছে। একজন তার সহোদরা। ভগ্নীপতি উধাও। তার নাম তালিকায় আছে। মাঝে সাজে লোটা-কম্বল সার করে এখানে উদয় হয়। আবার ঠেলা খেয়ে সরে যায়। সহোদরার নামটাও রেখেছে। এখন কাছে নেই। বৃক্ষ আছে, তবে শেকড়-বাকড় আলগা। মাটিতে বসে যেতে কতক্ষণ। সেই সুবাদে নাম রাখা। এ-কেসটার বেলায় মল্লিক বলল, সহোদরা আমার, নবদ্বীপে থাকে। লোনের টাকা পেলে বাড়িঘর বানাবে।

শেষ কেসটা হরেনের বৌর। একবার বৌ বলে দেখানো অন্যবার বিধবা বলে দেখানো। তালিকায় তু জায়গায় নাম রাখার সময় কুমীরের গল্পটা মনে বড় ধরেছিল মল্লিকের। একটা ইতর প্রাণীর বেলায় যা খাটে, মানুষের বেলায় তা খাটবে না, সেটা সে বিশ্বাস করে না। আর বিশ্বম্ভর তো ধোওয়া তুলসীপাতা নয়। তার চেয়ে বড় কথা শেষ তুরুপের তাস, সুরেশদাকে বলব। এই সব নিরাপদ আশ্রয় থাকতে হরেনের বৌ'র তু জায়গায় নাম রাখতে কুণ্ঠা থাকবে কেন! কিন্তু লোকটার কথাবার্তা শুনে আজ কেমন একটু ধন্দ এসেছে মনে

—আসলে চাপ সৃষ্টি। ভাগ বাড়াও। সব ভণ্ডুল করে দেবে ভাবছে! এই আমার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ। মল্লিক নিজের মুখের সামনেই ওটা নাড়তে থাকল। তুই না করিস তোর বাপ করবে। বাপ না করলে পিতামহ, তস্য প্রপিতামহ। জল ঘোলা করিস না বাপ, যা লিখেছি তাই টিপ ছাপ দিয়ে নিয়ে যা। খোদ বৃক্ষ হাজির না থাকলে বকলমে টিপ ছাপের দরকার তাও করিয়ে দিচ্ছি। হামলা হুজ্জোতি মল্লিকের বড় গা-সওয়ারে বাপ।

হরেন ডাকল, নন্দ মণ্ডল হাজির!

হাজির। দৌড়ে আসছে।

ফটিকি বোনদি হাজির!

হাজির! লাঠি ভর করে একটা কাঁকড়ার মতো হেঁটে আসছে।

আর কে হাজির! বিশ্বম্ভর বলল, মধু রায় এসেছেন কিনা দেখ!

মল্লিক বলল, ওরা লোন নেবে না?

নেবে না মানে! এমন অপার্থিব কথা সে কখনও শুনেছে বলে মনে হয় না! বলে কি! বিশ্বম্ভর এই পরিবার সম্পর্কে কিছু খোঁজখবর রাখে। উপেন রায়, মধু রায় লোন নেবে না, কেন নেবে না, এই প্রশ্নটাই বড় করে কাঁটা ফুটিয়ে দিয়েছে।

বিশ্বম্ভর মল্লিকের দিকে চোখ তুলে আবার তালিকাটা নামিয়ে নিল। দু'জনেই একটু যেন দমে গেছে। ঘরে বগলা, অমৃত টিপ ছাপ দিচ্ছে। বিশ্বম্ভর মুখ খুলতে পারছে না। ওরা চলে গেলে তালিকাটা বিশ্বম্ভর নিচে ফেলে দিল—যেন উচ্ছিষ্ট বস্তু নিয়ে ঘাঁটা-ঘাঁটি করেছে এতক্ষণ।

বগলা বলল, আবার যাব বাবু?

কোথায়?

ডাকতে?

কাকে?

উপেন রায়মশাইকে।

না। যেতে হবে না। তোমরা যাও। ওরা চলে গেলে মল্লিককে বলল, চলুন বরং আমরাই যাই।

মল্লিক বলল, হুঁম। এর মধ্যে তার ক্ষোভের প্রকাশ আছে বোঝা যায়। জাঁতাকলে পড়েছে। রায়মশাই লোন নেবেন না। এ-বাড়িতে আসতে তার যদি মান-সম্ভ্রমে বাধে। মল্লিক ফের বলল, হরেন গিয়েছিল। বলেছে, ওদের সরকারি লোনের দরকার হবে না।

বিশ্বম্ভর বলল, আরে ওটা বুঝতে পারছেন না, আপনি তো সাতঘাটে জলখাওয়া মানুষ মশাই, কোথায় পা দিলে কাঁটা ফোটে ভালই জানেন। জেনে-শুনে কাঁটাগাছটা বাড়তে দেবেন! নিজে না পারেন ছাগল-গরু দিয়ে খাইয়ে দিন।

মল্লিক বলল, সেই। রায়মশাই লোন নিয়ে কোন চক্রান্ত করার মতলবে থাকতে পারে। খুব গোপনে বলে দিয়েছে সবাইকে, আধা-আধি বখরা—কেউ জানবে না। জানলে, শালা তোমাদের ঢাকী সুদ্ধু বিসর্জন। মনে রেখ আমি মল্লিক। বগুড়া কোর্টের স্ট্যাম্প-ভেণ্ডার। বাপ মোক্তার। পিতামহ পেশকার। তিন পুরুষ ধরে আদালতই বংশের মোক্ষ। কাকে কিভাবে কোমরে দড়ি দিয়ে মোক্ষ দর্শন করাতে হয় জানি।

মল্লিক গায়ে ফতুয়া চড়িয়ে বিশ্বম্ভরের আগে রওনা হল। ছাতা মাথায় মল্লিক, সাইকেল নিয়ে হ্যাট মাথায় বিশ্বম্ভর—আর এই জনপদের কচি-কাঁচা বুড়ো। কিছুটা তামাশার মতো—সঙ্গে হরেন, বগলা, মরণ। মল্লিক রায়মশাইর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বড় বেশি সাধুসজ্জনের মতো বলে গেল, মহাজ্ঞানি মহাজন যে-পথে করে গমন হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয় সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরে আমরাও হব বরণীয়। রায়মশাই অধমেরা হাজির। সাধু সন্দর্শনে এসেছি।

উপেন রায় একটা বাঁশের মাচানে বসে তাঁর ওষুধপত্র ঘাঁটাঘাঁটি

করছিলেন। রাস্তা থেকে মল্লিকের বেশ উদাত্ত কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। কেউ তাঁর বাড়িতে এলে তিনি খুবই খুশি হন। মল্লিকের কবিতা আবৃত্তি সম্ভাষণ এত আন্তরিক যে তিনি বের হয়ে, না বলে পারলেন না যে, আসতে আজ্ঞা হউক।

চিন্তাহরণ মল্লিক বলল, বিশ্বম্ভর দাস। ত্রাণ দপ্তরের কর্মী। আমাদের যা কিছু এনার দয়ায়।

উপেন রায় হাত তুলে নমস্কার করল।

ইনি উপেন রায়। বড় সজ্জন সাধু প্রকৃতির মানুষ। অসহযোগ আন্দোলনে জেল খেটেছেন। আমাদের গর্ব বলতে পারেন।

বিশ্বম্ভর বলল, হরিহর আপনার ভাই হয় ?

আমার মামাতো ভাই।

ওর কাছে আপনাদের সব খবর পেয়েছি।

ভিতরে আসুন।

আমরা একটা কাজে এসেছিলাম।

বসুন। বসে কথা হউক। এ-বাড়িতে অতিথি-অভ্যাগতের আপ্যায়ন একটু বেশি মাত্রাতেই হয়ে থাকে। এত দূর থেকে আসা একজন সরকারি কর্মচারিকে তুষ্ট করার চেয়েও পারিবারিক ঐতিহ্য রক্ষার্থেই রায়মশাই বেশি যত্নবান। চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললেন, খবর পেয়েছি। কিন্তু রাজদর্শনে যাওয়া হয়ে উঠল না। কিছু মনে করবেন না।

মল্লিকের বলার ইচ্ছে হল, শালা তোমাকে আমি চিনি না। হেসে বলল, পর্বতই হাজির। আপনাদের কিছু টিপছাপের দরকার।

বিশ্বম্ভর বসেই তালিকাটা বের করে বলল, হাউজ লোন দিচ্ছে সরকার। সঙ্গে দু' বাণ্ডিল করে টিন। আপনাদের দেখছি চার-জনের নাম আছে।

শোনলাম লোনের টাকা সব নাকি পাওয়া যাবে না।

মিছে কথা। সবটাই পাবেন।

পেলেই ভাল।

মল্লিক বলল, দুর্জনের অভাব নেই রায়মশাই। বিদ্যাসাগরমশাই ঠিকই বলেছিলেন, উপকার করলে সে আপনার অপকার করবেই। দেখেছেন তো দৌড়াদৌড়িটা। কার দায় পড়েছে বলুন। তবু করি, রক্তে আছে বলে। মল্লিক এখন এত সজ্জন হয়ে গেছে যে উপেন রায় আর বেশি কিছু বলতে সংকোচ বোধ করছিল। বাড়ি বয়ে টিপ ছাপ নিতে এয়েছে এতেই বোধহয় তার ভেতরে যে গর্বের একটা উত্তুঙ্গ শিখর খাড়া হয়েছিল তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। তবু বললেন, লোন নেবার ইচ্ছে নেই। বাড়িঘর তো হয়েই গেছে।

মল্লিক এ-বাড়ির কত আপনজন তার আরও বেশি প্রমাণ দিতে থাকল। —দিদি এক গ্লাস জল দিন। বাতাসা দেবেন দুটো। সকাল থেকে একদম ফুরসত পাইনি। দিব্যেন্দু নাকি এয়েছে। কৈ রে বাবা, এদিকে আয় দেখি। তোর কথা আমি সবাইকে বলি। তোরাই তো আমাদের মান রাখবি।

মধু রায় বলল, যাও প্রণাম করগে। শত হলেও গুরুজন।

দিব্যেন্দুর পছন্দ নয়—তবু পিতৃআজ্ঞা পালনে, বিশেষ করে জ্যাঠা-মশাইও চান তাঁর পরিবারের ছেলেদের যশ সবাই করুক। যেন বাপ-জ্যাঠার এই মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্যই সে বাইরের ঘরটায় ঢুকে মল্লিক এবং জ্যাঠামশাইকে প্রণাম করল। মল্লিক দেখল, গৌরবর্ণ এক তরুণ, মাথায় কোঁকড়ানো চুলের বাহার, দীর্ঘকায় এবং চোখ উদ্ভাসিত—দেখার সঙ্গে সঙ্গে গূঢ় একটি ইচ্ছে তার মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সে বলল, বেঁচে থাক বাবা। তোমার মঙ্গল হোক। তোমার মাসিমার বড় ইচ্ছে তোমাকে দেখে। কঙ্কণকে নিয়ে একবার যেও।

বিশ্বম্ভর বলল, আপনাদেরটাই বাকি। কি রোদ, দু'ক্রোশ ঠেঙিয়ে স্টেশন।

উপেন রায় বলল, টিপ ছাপ থাক। মানুষ অঋণী অপ্রবাসী হয়ে

বাঁচতে চায়। কপাল ফেরে প্রবাসী, ঋণটা থাক। কে শুধবে বলুন। কতদিন আর আছি নিজেই যখন জানি না। ছেলেপুলেদের আর ঋণের মধ্যে রেখে যেতে চাই না।

মল্লিক জানে এর পর আর কথা নেই। না যখন করেছে, তখন নাই! হ্যাঁ করায় শিবেরও অসাধ্য। সে বলল, নিলে ভাল করতেন।

উপেন রায় বেশ বিনীত জবাব দিলেন।—না। নেব না যখন ভেবেছি, নেব না। রায়মশাই মনে করেন এতে কোন ঈশ্বর নির্দিষ্ট নির্দেশ রয়েছে। মনের বোঝাপড়াকে তিনি কখনও নিজের বলে ভাবেন না। কল্যাণ-অকল্যাণ সবই তাঁর। মনের ভেতর কোন অকল্যাণবোধে তিনি যে পীড়িত, চোখ-মুখ দেখলেই বোঝা যায়। এখানে এসে ওঠার ব্যাপারেও মল্লিকের হাত ছিল। জবরদখলী জমি এটা আগে তাঁর জানা ছিল না। টাকাটা যে মল্লিক হাজিদের নামে তছরুপ করবে একবারও মনে হয়নি। পরে ধরতে পেরে কিছুটা অনুশোচনার মধ্যে আছেন। অবশ্য তখন এমন জলেপড়া অবস্থা ছিল যে সবদিক খতিয়ে দেখারও ফুরসত ছিল না। একটা ক্যাম্পে হাজার দশেক উদ্বাস্তু এক সঙ্গে হাগা-মোতা সহ্য হচ্ছিল না। ক্যাম্পের দূষিত আবহাওয়া থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন। এর জন্য এত বড় মূল্য ধরে দিতে হবে তিনি জানতেন না। ফের বললেন, নিলে ভাল হত জানি কিন্তু নিতে পারছি না।

তোমার এত কি জেদ হে বাপু! সব কাজেই তোমার একটা বিঘ্ন ঘটাবার প্রয়াস। বুঝি। মল্লিক উঠে দাঁড়াল। তালিকা নিয়ে বলল, তালে নাম কেটে দিচ্ছি।

তাই দিন। তবে কিছু মুখে না দিয়ে যাবেন না। বিশ্বম্ভরবাবু গৃহস্থের অকল্যাণ করবেন না।

যা এল তা বেশ ভর্তি ভর্তি। মল্লিকও বাদ গেল না। যাবার সময় মল্লিক তেরচা চোখে দেখল উপেন রায়কে—ফুটানি। মরবে।

ভেতরে কাঁটাটা বড় খচ্‌খচ্‌ করছে। টিপ ছাপ নিয়ে জড়িয়ে দিতে পারলে এতটা খচ্‌খচ্‌ করত না তবে সম্বল, বিশ্বম্ভরবাবুর মতো মানুষেরা। তারা আছে বলেই মল্লিক এক জায়গায় গাছ অন্য জায়গায় তুলে নিয়ে সহজেই লাগাতে পারে। সার জল দিতে পারে। ফুল ফোটে। ফল ধরে। কোন কীট বাসা বাঁধতে পারে না। রায়মশাই কীট হয়ে যতই দংশন করার চেষ্টা করুক সার জল, ঠিকঠাক দিতে পারলে তার বাগানে ফুল ফুটবেই। কে আটকায়!

একখণ্ড মেঘ দেখা নিয়ে সবার মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। কেউ বলছে ওটা মেঘই নয়, দূরে খড়ের জমিতে কেউ আগুন দিয়েছে—তার ধোঁয়া। ঘূর্ণিঝড়ে ধুলোবালি ওড়াও অসম্ভব নয়।

কপিল মাথলা মাথায় বাইরে এসে দাঁড়াল। সে-ও দেখল। পার্বতীকে ডেকে বলল, উঠে আসছে মনে হয়। দেখ ত?

পার্বতী দেখল, পটল দেখল। ফটকি বোনদি লাঠি নিয়ে বের হয়ে এল। পিঠ সোজা করতে পারে না। তবু বলল, কৈ রে? কোন দিকে রে? কপিল বলল, ঐ তো, দেখছ না ভেসে যাচ্ছে।

ধীরে ধীরে ওটা গোকর্ণ খোসবাসপুরের দিকে সরে যাচ্ছে। তার পর এক সময় সব মিলিয়ে গেল।

বড় দুঃসহ অবস্থা মানুষের—এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। গাছের পাতা বিবর্ণ। গাছপালা মাঠ সব ধূসর রঙ ধরে আছে। সেই মায়াবী মেঘের খণ্ডটি মিলিয়ে যেতেই কপিল বলল, তেনার মায়ার অন্ত নাই। উসকে দিয়ে গেল। দেখ আমি কত মূল্য ধরি বোঝ, আমি না হলে তোদের মরণ! তা ঠিক, তুমি আছ বলেই আমরা আছি। খ্যাপা প্রকৃতির কাছে কপিল বড় অসহায়। তখনই মনে পড়ল, সেই সুরে গান—আল্লা ম্যাঘ দে পানি দে—বাড়ি বাড়ি দম মাথা দমের লাঠি নিয়ে পাইক খেললে কিংবা কাদায় গড়াগড়ি দিলে, বরুণ দেবতা তুষ্ট হয়। জারি গানের মতো গান—সুর ধরে—হেই ধারা নামোরে

নাম। স্বর্গ মর্ত্য উথাল করি নামোরে নাম। পান দিমু গুয়া দিমু দিমু গুড়ের বাতাসা, সকালবেলার পানি দিমু, দিমু অঙ্গ ভরে কাঁসা। কাঁসি বাজোরে বাজো—ট্যাং ট্যাং ট্যাং

কপিলের মাথায় এ-সব আসতেই হাঁকল, পার্বতী ছেঁড়া তেনা-কানি দে একখান। বরুণদেবের কলজের খোঁচা না মারলে জল ঝরাবে না।

পার্বতী বুঝতে পারল না, বাপের কী ইচ্ছে। বৈশাখ গেল জ্যৈষ্ঠ যায় যায়—একফোঁটা বৃষ্টি নেই। গরমে মানুষের মাথা ঠিক থাকে না। বাপ তেনাকানি দিয়ে কী করবে কে জানে।

পার্বতী বাপের চণ্ড রাগকে ভয় পায়। একখানা ছেঁড়া তেনা-কানি দিলে কপিল একটা লাঠির মাথায় তা ভারি যত্ন করে বাঁধল, উঠোনের মাঝখানে পুঁতে দিয়ে সে এক কলসি জল ঢেলে হাঁকাড় দিল, নামোরে নাম। জয় বাপ বরুণেশ্বর। তারপর দুহাতে দণ্ডটি তুলে একবার পুবে একবার পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে প্রদক্ষিণ করে বিড়বিড় করে কী বকল আর দণ্ডটিকে মাথায় ঠেকাল।

এখন অগতির গতি এই দণ্ডটি।

পার্বতীও হাঁটু গেড়ে দণ্ডটিকে প্রণাম জানাল। তারপর ঘর থেকে আর এক বালতি জল এনে উঠোনে ঢেলে দিলে কপিল জলে কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে দণ্ডটি মাথার উপর তুলে বের হয়ে গেল। পটল পেছনে। পার্বতীর লজ্জা করছিল বের হতে। বাপ এমন বেশে যাচ্ছে দিবুদা দেখে না আবার হাসে। কিন্তু তাদের দেশগাঁয়ে এই দণ্ড দেবতাটির বড় প্রবল প্রতাপ। দিবুদার দেশে এই পূজা হয় কিনা তার জানা নেই—বাপ ত এখন বাড়ি বাড়ি ঢুকবে। দেশের লোক মরণকাকা, বগলাদা এরা টের পেলে ঠিক বাপের মতো তারাও দণ্ড মাথায় নিয়ে বের হয়ে পড়বে। পটল হাতে একটা কাঁসার থালা নিয়েছে। বাপের পেছনে সে ট্যাং ট্যাং করে সেটা বাজাচ্ছে। যে একখণ্ড মেঘ উড়ে চলে গেল, তার দোহাই দিয়ে এখন বাড়ি বাড়ি

যার যেটুকু জল আছে, তাই দিয়ে উঠোন ভিজিয়ে দিতে হবে। বাপ তার দলবল নিয়ে তাতে গড়াগড়ি যাবে। সারা শরীর কাদায় মাখা-মাখি হবে। আজ বাপের এই চলবে দিনমান। ফটকি ঠাকুমা তার দেশের মানুষ। সে বাড়িতেই বাপ প্রথম হাজির। ঠাকুমা জানে সব। জলের যতই আকাল থাকুক যেখানে বাপ যাবে, উঠোনে জল ঢেলে দিতে হবে। দণ্ডটি মাথায় নিয়ে বাপ ঘুরে ঘুরে নাচবে। তার পর জয় হরি, বিষ হরি, দেবতা পঞ্চজন, কৃপা করি দেহ দরশন এমন বোলে গান ধরবে।

বাপকে যতক্ষণ দেখা যায়—পার্বতী রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকল, চোখের উপর থেকে বাপ অদৃশ্য হয়ে যেতেই দেখল দূরে উত্তরের বাঁধে তাল গাছের মাথায় একটা শকুন বসে আছে। শাঁ করে আরো গোটা কয় শকুন মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। মরা জীবজন্তু সব ও দিকটায় ফেলা হয়। আজ আবার কার গেল কে জানে। রোজই যাচ্ছে।

ঘেরির সর্বত্র ছাড়া গরু-বাছুর। জল নাই, ঘাসপাতা কিছু নাই, শুখা মাঠে গরু-বাছুর চরে বেড়ায়। রাতে বাঁধেই শুয়ে থাকে। কেউ ফেরে, কেউ ফেরে না। তখন খোঁজ হয়, কার গেল। বর্ষা না এলে ঘরে নিয়ে কোন লাভ নেই। খড় বিচালি শেষ। পার্বতীর বুকে তরাস লাগে। বাপ খুঁটে খুঁটে দিনমান শুধু ঘাস সংগ্রহ করে। কোদাল নিয়ে হন্যে হয়ে খোঁজে কোথায় চাপড়া ঘাস প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যেও রস শুষে নিচ্ছে বসুন্ধরার। কেমন এক আতঙ্কে পেয়ে বসে পার্বতীকে। ঘরে জল নেই। হয়তো গিয়ে দেখবে পাতকুয়োর জলও শেষ। এই আতঙ্ক এত প্রবল পার্বতীর যে, এক দণ্ড সে বসে থাকতে পারে না। ঘড়া নিয়ে সে বাঁধের নিচে নেমে গেল।

বেলা বাড়ছে। হরেন ছাতা মাথায় পাতকুয়ো পাহারা দিচ্ছে। কে কত জল নেয় তার হিসাব রাখছে। ঢেঁড়া পিটিয়ে দিলেই হল—মানুষগুনতি জল, মাথাপিছু হিসাব, তখন পার্বতী ঘরের জালা-কলসি হাঁড়ি সব ভরে রাখতে পারবে না। বিশার কষ্ট হবে। তরাসে বিশা

যেন গামলা-ভর্তি ক্যান-জল খেয়েও তুষ্ট থাকতে পারে না। আরও চায়। যখন বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকে, বুঝতে পারে বিশার তেষ্টা নিবারণ হয়নি। সে দরকারে রাতে চুরি করে জল তুলে আনবে— কেউ আটকাতে পারবে না।

পার্বতী জল তোলার সময় দেখল, দূরে বাঁধের উপর দিয়ে একদল লোক দণ্ড কাঁধে চলে যাচ্ছে। বাপের দোসর সব। যে যায় তারই পুণ্য। সংসারে সব হয় পুণ্যফলে। পুণ্যফলে বাড়িঘর। পুণ্যফলে আকাশ ফুঁড়ে বৃষ্টিও নামবে। বাপ বরুণদেবের হয়ে ছড়া কাটছে। দণ্ডপূজা দিচ্ছে। তেনাকানি দণ্ডের মাথায় বেঁধে নাচছে। তাঁর কৃপা হবেই। যে আতঙ্কটা সে পুষে রেখেছিল বাপের দণ্ডপূজার মিছিল দেখে তা উবে গেল।

পাতকুয়োর চারপাশে ভিড়। কেবল জল উঠছেই। পাতাল থেকে জল আসছে জল অপচয় নয়—নোটিশ টাঙানো। পার্বতী জানে কোন কিছু অপচয় করতে নেই। জল নিয়ে আসার সময় ঘড়া থেকে জল চলকে একফোঁটা বাইরে পড়ে না। বড় সতর্ক থাকে পার্বতী। সতর্ক থাকতে হয় সেই হাড়বজ্জাত বনমালীটার জন্য। আবার হাজির। ঠিক বাড়ির মুখে হিজলের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। বাপ বাড়ি নেই টের পেলেই হল। পার্বতী তাড়াতাড়ি ভাল করে দেখল নিজেকে। সে যে বড় হয়ে গেছে! বাপ শাড়ি কিনে দিতে পারে না। লজ্জা নিবারণের জন্য ফ্রকের উপর সব সময় একটা গামছা গায়ে জড়িয়ে রাখতে হয়। বনমালী তাকে ভাল করে দেখার জন্য কেমন তক্কে তক্কে থাকে। মাছের গন্ধে বেড়ালের ঘুরঘুর করার স্বভাব তোমার বের করে দেব!

আসলে দিবুদাকে দেখার পরই তার মনের মধ্যে কোত্থেকে যে এত প্রবল জোর এসে গেছে বুঝতে পারে না। আগে বনমালী এলে, একা বাড়ি থাকতে সাহসই পেত না। পটলকে বলত. তুই যদি বাড়ির বার হস ভাল হবে না। মাঝে মাঝে বেশ ভারিক্কি চালে

বলত বই-স্লেট নিয়ে বোস। আমি দেখছি। তার অধীত বিদ্যার তখন ঝালাই চলত। এটা-ওটা দিয়ে পটলকে বাড়িতে আটকে রাখত। দিবুদা আসার পর মনে হয়েছে তার একজন প্রবল গার্জেন হাজির। আর ভয় নেই। দিবুদার সঙ্গে সাহস করে আজ পর্যন্ত একটা কথা বলতে পারেনি। সাইকেলে দিবুদা বাঁধের উপর দিয়ে মাঝে মাঝে যায়। বেড়ার ফাঁকে সে উঁকি দিয়ে দেখে। দিবুদাকে দেখলে কোথা থেকে যে রাজ্যের আড়ষ্টতা এসে তার উপর ভর করে। সে কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ে। চুলে হাত দেয় অজান্তে। আয়নায় মুখ দেখে। নিজেকে দেখতে দেখতে ভারি কাতর হয়ে পড়ে।

হিজল গাছের নিচে কেউ দাঁড়িয়ে নেই। রোদে মুখ পুড়ে যাচ্ছে। পার্বতী ঘড়া থেকে ঠাণ্ডা জল নিয়ে চোখে-মুখে ছিটিয়ে দিল। কিছুটা মাথায়। বনমালী এত ভাল মানুষের ছা হয়ে যাবে সে ভাবতে পারেনি। এদিক-ওদিক থাকতে পারে। সে চারপাশে তাকাল। কোথাও কেউ নেই। আর বাড়িতে ঢুকে সে ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠল। বনমালী বারান্দায় বসে আছে। পার্বতীকে দেখে বলল, পিসি পাঠাল তোমার কাছে।

কেন পাঠাল. আসলে অজুহাত খাড়া করতে চাইছে বনমালী। ছল ছুতোয় বাড়ি ঢুকে যাবার মতলব। একটা বড় পেতলের ঘটি পাশে। বনমালী ঘটিটা এগিয়ে দিয়ে বলল, জল নিতে পাঠাল।

জল চাইলে দিতে হয়। ঠাকুমাকে সে এমনিতেও ঘড়া করে জল এনে দেয়। পাঠাতেই পারে। বনমালীকে কেন জানি আগের মতো খারাপ লাগল না। দূরে দাঁড়িয়ে অসভ্য অঙ্গভঙ্গী করলে কার না খারাপ লাগে। সে ঘড়া থেকে ঘটিতে জল ঢেলে দিল।

বনমালী বলল, তুমি আমার সঙ্গে কথা বল না কেন, আমি বাঘ না ভালুক। ধুবুলিয়া গেছ? খুব সুন্দর জায়গা।

পার্বতী কথা বাড়াতে চায় না। সে ঘরে ঢুকে গেল।

ধুবুলিয়াতে আমার চায়ের দোকান। বিক্রিবাট্টা খুবই ভাল।

আলতা পর না কেন? আলতার শিশি এনেছি একখান। স্নো পাউডার যা লাগে বলবে।

পার্বতী ঘর থেকেই জবাব দিল, আপনি যান! বাবা এক্ষুনি চলে আসবে।

তোমার বাবা একখানা মানুষ বটে। মরতে আর জায়গা পেল না। বাড়িঘর করবি ত রেলের ধারে কম্ম। যখন তখন শহর, সিনেমা, রিকশায় চড়ে হাওয়া খাওয়া—কত কিছু আছে জীবনে।

পার্বতী ফের বলল, বাবা আসবে। আপনি যান।

যাচ্ছি। ধুবুলিয়া গেলে, রোজ সিনেমা দেখতে পেতে। রামের সুমতি চলছে রাণাঘাটে। কী সুন্দর বই। স্বয়ংসিদ্ধা আসছে। হিট বই। আমার তো চার বার দেখা হয়ে গেছে। কোন জবাব নেই ভেতর থেকে।

বনমালী এবার জলের ঘটিটা নিয়ে উঠে পড়ল।—পিসি তোমাকে ডেকেছে।

পরে যাব।

আলতার শিশিটা নেবে না!

বাপ টের পেলে মারবে।

অঃ। তারপরই গালাগাল, কী লোকরে বাবা নিজেও দিতে পারবি না, অন্যে দিলেও দোষ। আমরা তোমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয় হই। পিসি তো বলল, কপিল তার জ্যাঠশ্বশুরের নাতি।

পার্বতী হঠাৎ হি-হি করে হেসে দিল ভেতরে। —আপনি তবে আমার মামাবাবু?

আরে না না আমি কিছু না। লতায় পাতায় সম্পর্ক—ও-সব মানতে নেই।

পার্বতী ফের বলল, অনেক কথা বললেন। এবারে যান।

তুমি আসবে ত!

পার্বতী এবার বলল, হাতে দেখছেন এটা কি!

বনমালী দেখল, ধারালো একটা ঘাসকাটার হাসুয়া। পার্বতী মুহূর্তে রণরঙ্গিণী। পার্বতীকে দেখা যাচ্ছে না। সে নিজেকে আড়াল করে হাসুয়াটা কেবল হাতে ঝুলিয়ে রেখেছে। হাতে কাচের চুড়ি—শ্যামলা রঙ মেয়ের উঠোন থেকে দৃশ্যটা দেখে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল পার্বতী নেই, শুধু একটা যেন কাটা হাত বাতাসে ভেসে আছে। হাতের মুঠোয় হাসুয়া। সে পড়িমড়ি করে বেড়া ডিঙিয়ে এক লাফে পিসির সীমানায় চলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে পার্বতীর কি হাসি। হাহাকার হাসি। কিছুতেই আর তার হাসি থামছে না।

আর একটু পরেই পার্বতী পিসির বাড়িতে গিয়ে ডাকল, কৈ বনমালীদা, তুমি যে আসতে বলেছিলে।

ফটকি বুড়ি মুসুরি ডাল রোদ থেকে তুলছিল। কিছু আমচুর. তেল সরষে। সব রোদ থেকে তোলার সময় পার্বতী বলল, দাও আমি তুলে দিচ্ছি। কোথায় রাখবে বল।

বনমালী ঘরের ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে দেখল—সাড়া দিল না। হাত খালি। তবু বিশ্বাস নেই—সে চুপচাপ মাদুরে শুয়ে থাকল। পার্বতীকে নিয়ে সে কত স্বপ্ন দেখেছে। পিসিকে একবার বলেওছিল কথাটা তোল না, আমার তো আয় মন্দ না। বিয়ে থা হলে তোমায় তীর্থ করিয়ে আনব। নবদ্বীপ যেতে চাও তো বল, নিয়ে যাব।

ফটকি বুড়ি মাথা পাতেনি। বনমালীর গুচ্ছের বয়েস। মেয়েটা সেদিনের। বয়সে বড় হয়নি—বাতাসে বড় হয়েছে। নাহলে গায়ে গতরে এত ফনফনিয়ে ওঠা কখনই সম্ভব নয়।

খোঁজ নিতেই আসা। ভাল প্যাণ্ট শার্ট, নতুন স্লিপার গরমের দিনেও গলায় কম্ফর্টার। এসব না হলে সে একজন বড় মানুষ হয় কী করে! দামী চেক কাটা লুঙ্গি—গলায় পাতলা সোনার চেন, এ সবও দেখিয়েছে পার্বতীকে শিস্ দিয়ে। কিন্তু কাছে যায়নি। সেই মেয়ে তার খোঁজে এয়েছে। বিষয়টা বড় গোলমেলে। সে পাতলা একটা

বটতলার বইয়ের মলাট খুলে মুখে ধরে রেখেছে। পার্বতী ঘরে ঢুকলেই দেখতে পাবে বনমালী যে সে মানুষ নয়। একটা আবাল মেয়ের জন্য সে হাদিয়ে মরে না। তার আরও অনেক জরুরী কাজ আছে দুনিয়ায়।

পার্বতী বলল, বনমালীদা বুঝি পালিয়েছে ?

পালাবে কেন রে। এগুলো তো ওই এনেছে। আমায় কেউ দেখার নেই—তবু যা হক আনে, খোঁজখবর নেয়। জল নিয়ে এল না ?

ডাকছি—কেউ সাড়া দিচ্ছে না যে ! আসতে বলেছিল !

ও বনমালী, পার্বতী তোকে ডাকছেরে। তুই নাকি আসতে বলেছিলি !

না তো, কখন বললাম।

উঠোন থেকেই বলল পার্বতী, তুমি যে আলতার শিশি এনেছ বললে।

কারো জন্য আমি কিছু আনি না। এখন আমাকে ডিস্টার্ব করবে না। আমি পড়ছি।

কী পড়ছ ?

বই পড়ছি।

কী বইগো ?

গল্পের বই।

কী নাম ?

শাঁখা সিঁদুর।

বেশ নাম বইয়ের। আমাকে পড়তে দেবে ?

আসলে বনমালী সম্পর্কে সব ভীতি পার্বতীর দূর হয়ে গেছে। লোকটা এমন চরিত্রের জানলে, সে কখনও সইকেও বলত না, শিস দেয় লোকটা। আসলে ভয় থেকে বলা। এমন কি ওই লোকটার ভয়েই সে বাড়িতে একা থাকতে সাহস পেত না। খালি বাড়িতে

ঢুকে মুখ চেপে, কত রকমের ঘটনা ঘটে, কাগজে কত সব খারাপ খবর বের হয়, মুখে মুখে তারপর রটে যায়, শহর থেকে কেউ ফিরে এলেই—এমন সব খবর পার্বতী শুনতে পায়। মেয়ে চালান হয়ে যায় এক দেশ থেকে আর এক দেশে—লোকটা যে সেই দলের নয় কে জানে! এ-সব কারণেই সে তার সইকে বলেছিল, ভয় করে।

এখন মনে হচ্ছে কোন সার্কাসের জোকার বনমালী। রোগা ঢ্যাঙা তালপাতার সিপাই। সে ভিতরে ঢুকে হাঁচকা টান দিয়ে বইটা তুলে নিয়ে বলল, জান আমার কাকা পুলিশে কাজ করে।

বনমালী তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসল। বলল, পিসি তো আমাকে সে-কথা বলেনি।

জান আমার কাকা এলে তোমার খোঁজখবর নেয়।

আমার খোঁজখবর কেন! আমি কি দোষ করেছি!

তুমি শিস্ দিয়েছিলে মনে নেই।

আর দেব না। পার্বতী কথা দিচ্ছি। আর এখানে আসব না।

পার্বতী এবারেও হেসে দিল। হাহাকার হাসি। তারপর বলল, তুমি পুরুষমানুষ না, তুমি বিয়ে করবে কিগ! আলতা বের কর।

আনি নি। সত্যি বলছি আনি নি।

তবে বলে এলে কেন!

বনমালীর মনে হল, আলতার শিশি দিলেই সে বামাল সহ ধরা পড়ে যাবে। ও-লাইনে আর হাঁটে! কাকা পুলিশে কাজ করে। ছুতোয় নাতায় লটকে দেবে। সে বলল, বিশ্বাস কর আমি ঠাট্টা করেছি। আলতার শিশি তোমার জন্য আনতে যাব কেন, তুমি আমার কে?

এ সময়ে দূরের কোন সোরগোলে পার্বতী কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। বাপ তার বড় গোঁয়ার মানুষ। ঠ্যাঙাড়ে। সব সময় পার্বতী বাপকে নিয়ে শঙ্কায় থাকে। কোথায় কি নিয়ে বচসা বাধিয়ে দেবে, তেড়ে যাবে, লাঠালাঠি করতে, এমন শঙ্কায় সে দৌড়ে ঘর

থেকে বের হয়ে দেখল, দণ্ড নিয়ে মিছিলটা আসছে। বগলাদার কাঁধে বাপ, সেই হাডুডু খেলে বাপ যখন মেডেল গলায় ঝুলিয়ে ফিরত তেমন একখানা দৃশ্য। হঠাৎ মানুষজন বাপের এমন কি কৃতিত্বে ক্ষেপে গেল কাছে না এলে বোঝা যাবে না। এবং তখনই দেখল, ঈশান কোণে কালো গভীর ঘন মেঘ কালনাগিনীর ফণার মতো-আকাশের প্রান্তে মাথা উঁচিয়ে দিয়েছে। দণ্ড পূজার মাহাত্ম্য এবং বাপের মাথায় এটা প্রথম উদয়—দেশছাড়া হয়ে সবাই আচার-অনুষ্ঠান ভুলতে বসেছিল—বাপ যেন মনে করিয়ে দিল, নিস্তার নাই হে। প্রকৃতির লীলাখেলায় বাঁচন-মরণ, তারে তুমি অবহেলা কর।

পার্বতী সহসা খুশিতে ডেকে ফেলল, ও বনমালীদা, দেখ এসে কি একখানা মেঘ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে গ। ও ঠাকুমা এসে দেখ না—এবং এই নতুন জনপদে কতদিন পর বৃষ্টি নামবে, বৃষ্টি না ঝড় না আরও কোন বড় প্রলয়ঙ্কর ঘটনা—কে জানে পার্বতী দৌড়ে বাড়ি ঢুকে কোথায় কি আছে দেখল। কোথা থেকে কি উড়িয়ে নেবে দেখল। সংসারে কুটোগাছটিরও বড় প্রয়োজন। সে বড় হতে হতে তা বড় বেশি টের পেয়েছে। দুটো কলাই করা থালা বাইরে পড়ে। সে তা ঘরে তুলে রাখল। বিশা বাঁধে খোঁটায় বাঁধা, সে দৌড়ে নিয়ে এল বিশাকে। মেঘ মাথার উপর ক্রমে দূরবর্তী অন্ধকারের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। হাওয়া নেই। দম বন্ধ হয়ে আসার মতো এখন এই বিশ্বচরাচর। তালগাছের মাথা থেকে শকুনগুলো উড়ে যাচ্ছে। এবং ক্রমে আকাশের নিচে ছড়িয়ে পড়ল। এসব দেখলেই পার্বতী বুঝতে পারে ঝড় উঠবে—পরে ঘন বর্ষণ। খড়কুটো সব জড় করে তুলে নিল ঝুড়িতে। বারান্দায় এককোনায় রেখে দিল। ঘুটেগুলো জাবদা করে ফেলে রাখল মাচানের নিচে। দড়ি থেকে কাপড়-জামা তুলে নিয়ে গেল। ক'টা বাঁশ দাঁড় করানো —ঝড়ে উড়িয়ে নিতে পারে। বাঁশগুলো সব মাটিতে ফেলে টেনে এক জায়গায় জড় করে রাখল।

পার্বতীর এখন নিশ্বাস ফেলার ফুরসত নেই। বৃষ্টি নেই শুধু দাবদাহ মরণ-বাঁচন নিয়ে সংশয়, কি হবে সব কিছু গোছগাছ করে, পুড়ছে পুড়ুক কেমন এক লণ্ডভণ্ড অবস্থা—আর বৃষ্টি নামবে ভেবেই ঘর-দোর যেন ফের গুছিয়ে তোলা। বাছারির নিচে উনুন হাঁ করে আছে। বৃষ্টি হলে জল পড়বে। সে একটা কাঠের পিঁড়ি দিয়ে মুখ ঢেকে দিল। মেঝে থেকে ধান তুলে ডোলের মধ্যে পুরে রাখল। ঘামে জবজবে হয়ে গেছে মুখ। মাঝে মাঝে রাস্তায় নেমে উঁকি দিচ্ছে, বাপের মিছিল আর কতদূর! পটল থাকলে কত সুবিধে। দিদির সঙ্গে সেও দৌড়াদৌড়ি করত। সব কিছু ধরাধরি করে তোলা। সব চেয়ে দরকার শুকনো কাঠকুটোর। বাপ তাল পাতার ডিগ কেটে রেখেছিল, হিজলের ডাল কেটে রেখেছিল—বৃষ্টি বাদলায় ঘরে কাঠ-কুটো না থাকলে মরণ। সব এখন তুলতে হচ্ছে। গোয়ালঘরের মাচানে সাজিয়ে রাখতে হচ্ছে। সাপের উপদ্রব বড় বেশি। আড়াল-আবডাল পেলেই তেনারা উঠে আসেন। মাথা গোঁজ করে গা মুড়ে পড়ে থাকেন। গেল পুজায় বগলাদার মাকে কালে খেল। বৃষ্টি বাদলায় খড় জমা রাখা ছিল বারান্দায়। হাত পড়েনি। কে জানত তেনার ঘর সেখানে। হাত দিতেই ছোবল। যতীন ওঝার দিনমান কি নাচানাচি, মন্ত্রপাঠ, লাল কৌপীন পরনে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, বাড়িতে তার মা মনসার থান। কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা। ভাদ্র মাসে পদ্মাপুরাণ পাঠ—এই করে যতীন ওঝার মনে হয়েছিল একদিকে বিষহরি আর অন্য পানে সে। দু-পক্ষের লড়াই। সারা গাঁয়ের মানুষ তেমাথার মুখে ভেঙে পড়েছিল। ঝড়বাদলা হলে সবচেয়ে ভয় পটলকে নিয়ে। বাপকে নিয়েও তার কম ভয় না। বড় বেশি মাছ ধরার বাই। জলে ভেসে যায় সব। ডাঙা জমিন বলতে এই বাঁধ এলাকা। তেনারা শীতে গ্রীষ্মে মাঠে থাকেন। চরে বেড়ান. জলে ভেসে গেলে সব করেন কি। গাছের ডালে, ডাঙার হুলোতে ঘরের আনাচে কানাচে উঠে আসেন। বড় সতর্ক থাকতে হয়।

আর এই সময়ই এল সেই ঝড়। প্রলয়ঙ্কর ঝড়। তালগাছের ডিগগুলি সব খাড়া হয়ে গেল শোঁ শোঁ গর্জন। ধুলো বালি উড়ছে। খড়কুটো উড়ছে। ঝাপটা মারছে। চোখ মেলে পার্বতী তাকাতে পারছে না। ঘরের ঝাঁপ ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। মড়মড় করে উঠছে ঘরবাড়ি। পার্বতী ডাকছে, পটল, পটলরে। ঝড়ের মধ্যেই বাপ-বেটা এল। গায়ে কাদামাখা। অঝোরে বর্ষণ শুরু হয়েছে। আকাশ কালো অন্ধকার। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কড়কড় করে বাজ পড়ল কোথাও। ঝড়ের ঝাপটায় ঘরের খুঁটি নড়ে যাচ্ছে। পার্বতী ঝাঁপ আলগা করে ডাকছে, এস বাবা। পটল ভিতরে আয়। কিন্তু কে যায়—বর্ষণে দাঁড়িয়ে ভিজতে কার না আরাম বোধ হয়!

বাপের এখন কত উল্লাস। পটলও নাচছে। ঝড় বইছে প্রবল বেগে। দুজনার একজনের যদি কোন হুঁশ থাকে। ঝাপটায় জল ঢুকছে। পর্বতী একটা বস্তা টানিয়ে দিল খিড়কির জানালায়। অন্ধকার আর শনশন হাওয়া। বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ বাজছে। মুহূর্তে পৃথিবীটায় অন্য রকমের রঙ ধরে গেল। বনমালীদা আলতার শিশি যদি সত্যি এনে থাকে—স্নো পাউডার। তার বড় ইচ্ছে হয়, পায়ে আলতা দেয়। মুখে স্নো পাউডার। সব ভাবতে গেলে আজকাল কেমন ঝিমঝিম করে মাথাটা। মার শাড়ি, তোলা সুটকেসে দু-একখানা আছে এখনও! ঝড়-বাদলায় মনে যে কী সব উদয় হয়! কাউকে বলা যায় না কেবল কোন সন্ধানী পুরুষ চোখ মুখ দেখলে টের পাবে, পার্বতীর শরীর ঠিকঠাক নেই! লণ্ডভণ্ড অবস্থা। আবেশ বড় বেশি।

পটল দৌড়ে ঘরে ঢুকে গেল। বাপ বারান্দায়। বলছে, গামছা-খান দে। পটলকে তখন পার্বতী মাথা মুছিয়ে দিচ্ছে। প্যাণ্ট এগিয়ে দিচ্ছে। একটা খোঁট ভাঁজ করে দিয়েছে গায়ে দেবার জন্য। গামছাটা বাপ হাতে নিয়ে বলল, কাঁঠালবীচি ভাজা আছে দু-চারখানা, দেনা খাই।

পটল বলল, আমাকে দিদি।

পার্বতী হাঁড়ি থেকে ভাজা কাঁঠালবীচি তুলে গোনাগুণতি বাপকে দিল, পটলকে দিল, নিজের জন্য কোঁচড়ে ক'খানা রাখল। বাইরে জলে ভেসে যাচ্ছে। চড়াৎ চড়াৎ বৃষ্টির ফোঁটা বড় বড় ফোঁটায় কবুতরের ডিমের মতো আকাশ থেকে অঝোরে পড়ছে, ভাঙছে ফুটছে। ঝাঁপ গলিয়ে পটল বারান্দায় বাপের পাশে গিয়ে বসেছে। ঘরে পার্বতী থাকে কী করে আর! সেও গিয়ে বাপের আর এক পাশে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে পড়ল। আসলে ঝড়-বাদল দেখা। তাল গাছগুলির মাথা কেমন হাওয়ায় যেন উড়ে যেতে চাইছে—কোন আদ্যিকালের ডাইনীর চুলের মতো তালগাছের ডিগগুলি বাতাসে খাড়া হয়ে গেছে। খোসা ছাড়িয়ে কাঁঠালবীচি ভাজা খাওয়া আর ঘন ঘোর বাদল দেখার মধ্যে কী যেন এক মজা! দিবুদা এখন কী করছে! জানালায় না ওর পড়ার টেবিলে বসে। দিবুদা এখন কার কথা ভাবছে! দিবুদার কথা ভাবতে ভাবতে নিজের মধ্যেই পার্বতী কী এক আবেশে গুটিয়ে যায়। শরীরে তার কেমন এক ঘোরলাগা অবস্থা। নিজেকে বড় ভয় পায় এখন পার্বতী। বাপের আরও গা ঘেঁষে সে বসে। কোন এক জাদুকর যেন তাকে বাপের কাছ থেকে পটলের কাছ থেকে আলগা করে নিতে চায়!

কপিল বলল, বিশা সকালে ফ্যান জল খেয়েছে?

পার্বতী বুঝতে পারে না বাপের এমন কথা কেন! সে বলল, খায় না। কালও খায়নি।

কপিল কি ভেবে বলল, মাথলাখান দে ত, দেখি। বলে সে উঠে দাঁড়াল।

বাপের মনে এ-হেন সংশয়ে পার্বতী ঘাবড়ে যায়। বাঁধের ধারে বিশা শুয়েছিল। ঝড় দেখেও হুঁশ হয়নি। অনেক ঠেলাঠেলি করে তুলতে হয়েছে। নড়তে-নচড়ে কষ্ট। তা সময়কালে এমন হবারই কথা। ঠেলেঠুলে নিয়ে আসতে হয়েছে। বিশার মুখে অরুচি কেন!

সে তো বিশার জন্য ক্যানজল, খড় ঘাসের জাবনা খুব যত্ন করে রেখে দেয়। নুন মিশিয়ে না দিলে একদম মুখে দেয় না। বাপের বড় সোহাগী কন্যা। পার্বতীর তখন হিংসে হয়—যাব চলে যেদিকে দুচোখ যায়। আমি যেন কেউ না! সব চেয়ে খারাপ লাগে সংসারের রান্নাবান্না উঠোন ঝাড়, খড়কুটো সংগ্রহ, জল তোলা থেকে সব কাজ করার পর বাপের যখন মন পায় না। বিশারে তুই জল দিলি না, বিশারে তুই ঘরে তুললি না, হতভাগী মেয়ে কেবল রাস্তায় নেমে ধিং ধিং করে টোলানো! সারা ঘরটা চনিয়ে কি করে রেখেছে। চোখে দেখতে পাস না পার্বতী! এইভাবে মা ভগবতীরে রাখিস!

কপিল মাথলাখান মাথায় দিয়ে উঠোন পার হয়ে গেল। কি যেন বাপ বলল, বৃষ্টির শব্দে শোনা যাচ্ছে না। উত্তুরে হাওয়া বলে বারান্দায় ছাঁট আসছে না। পটল ডাকল, দিদি।

বল।

বিশা মরে যাবে না ত!

অলুক্ষণে কথা বলিস না!

মরণ কাকার আজ যে গেল!

গো-মড়কে সব সাফ হয়ে যাবে, ভয়ে বাপ পাঁচ ক্রোশ রাস্তা হেঁটে গো-বদ্যির কাছ থেকে কলাপাতায় পুঁটলিতে ওষুধ নিয়ে এসেছে।

গো-মড়কের গন্ধ ওঝা-বদ্যি টের পেয়ে যায়। গাঁয়ের রাস্তায় কখনও কখনও হেঁকে গেছে, কপিলের মন ধরেনি। আসলে শালাদের টাকা উপায়ের ধান্দা। এত করেও বৃন্দাবন কর মড়ক আটকাতে পারেনি। ঘোষেদের দুটো তরতাজা গরু গেল, একটা বাছুর গেল। ভাগাড়ে বসে থাকে চামার। ভাগাড়ের পাশে তালগাছের নিচে বসে মুড়ি-গুড় খায়। ট্যাকে শানানো ছুরি। লোভে পড়ে গেলে যা হয়, ভাগাড়ে গরু না এলে নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে ওঠে। গো-মড়কের নামে কলাপাতায় কালবিষ অদৃশ্য করে ছুঁড়ে দিয়ে যায় যখন তখন

সবাই তক্কে তক্কে আছে—ধরা পড়ে না, পড়লে একখানা রামধোলাইয়ের ব্যবস্থাও হয়ে আছে—এসব সলাশুলুকের মধ্যে বেঁচে থাকা—কানে আসে কথাবার্তা পটল জানে, ঐ যদি হয়, কেমন এক আতঙ্ক তখন, বিশা মরে যাবে না ত!

গোয়ালঘর থেকে ছুটে বের হয়ে আসছে তখন কপিল।

পার্বতী ত্রাসের গলায় চিৎকার করে ডাকল, বাবা!

বৃষ্টির ছাঁট প্রবল। কপিল পার্বতীর আর্ত ডাকে বুঝতে পারে, মেয়েটার তরাস লেগেছে।

সে দৌড়ে ঢুকে হাসি হাসি মুখে বলল, বিশা জননী হবেরে মেয়ে। দে দে দুখান বাঁশ দে। বড় ছাঁট আসছে।

পার্বতী দুখান বাঁশ বাপের সঙ্গে ধরাধরি করে নিয়ে গেল। এখন মাথায় মাথলা নেই। পটল বলল, আমি যাব বাবা।

না, গম্ভীর মুখে পার্বতী কথাটা বলল। ছেলেমানুষ পটল। জননী হওয়ার বিষয়টা বেশি জানাজানি হলে যেন মেয়েজাতের মান থাকে না। পার্বতী আর কিছু বলতে পারেনি। কেবল গোয়ালে ঢোকার আগে দেখেছে, পটল না আবার বৃষ্টিতে নেমে আসে। পটল তেমনি বাঁশের খুঁটিতে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখে দিদিকে দেখছে। বৃষ্টি পড়া দেখছে। শনশন হাওয়া বইছে। পটলের চোখ এত নিবিষ্ট যে দেখে মনে হয়েছে পার্বতীর, কান পেতে সে তাও শুনছে। আসলে প্রকৃতির লীলাখেলা। জননী হবার তাগদ কে যে দেয়! কে যে ডুমুক বাজিয়ে যায়—শস্য ফলে কীটপতঙ্গ বাড়ে, পাখিরা ডিম পাড়ে—বিশা জননী হয়। দিবুদা কী কিছু বোঝে না। শরীরে তার প্রকৃতির কূট কামড় কোন দাগ কাটে না!

কপিল বলল, এদিকে ধর।

পার্বতী বাঁশটা তুলে ধরল। ঝড়ে সামনের বেড়াটা পড়ে গেছে। খুঁটি একটা আলগা হয়ে গেছে। ছাঁটে বিশার শরীর ভিজছে। মুখ তুলে বিশা পার্বতীকে দেখল। কান নাড়ল। মাথা নাড়ল। টল-

টল করে চেয়ে আছে পার্বতীর দিকে। পার্বতী বলল, ঠাট দেখ। মহারাণী! বৃষ্টি ভিজে মরছি, মহারাণী আদর খাবার জন্য টগবগ করছেন! না এখন কিছু হবে না। তোকে আদর করলে বেড়া বাঁধবে কে!

ক্রমে সন্ধ্যা নামে। আকাশ আরও ঘন কালো। ধারা বর্ষণ চলছে। ব্যাঙের গোঙরগোঙ আওয়াজ কেমন মাতাল করে দিচ্ছে পার্বতীকে। বিশা একবার উঠে দাঁড়াচ্ছে, আবার পা-মুড়ে শুয়ে পড়ছে। বাপ বসে আছে কোণায়। লম্ফ জ্বলছে। পার্বতী বসে আছে কোণায়, বিশার কষ্টটা তার মধ্যে কেমন সংক্রামিত হচ্ছে তার ঘুম আসছিল। লম্ফের আলোতে চোখ টলটল করছে পার্বতীর। আতঙ্ক ভয় আনন্দ বিস্ময় এবং রহস্যময়তা মিলে পার্বতী কেমন দিশেহারা। খড় এগিয়ে দিচ্ছে। বিশা কিছু মুখে দিচ্ছে না।

পটল ও-ঘর থেকে চিৎকার করছে, আমি যাব। আমার ভয় করে।

পার্বতীকে কপিল বলল, তুই যা! বসে থেকে কি হবে।

পার্বতীর উঠতে ইচ্ছে করছিল না। সেই কখন থেকে বিশার কষ্ট। বাপ ঠিক বুঝছে না। ওর যেতে ইচ্ছে করছে না। পটলের উপর রেগে কাঁই হয়ে আছে। এখানে আসার মতলব।

বিশা জননী হল একসময়। কপিল থাবড়া মারল বাছুরটার পিঠে।

বিশা গা চেটে দিচ্ছে। পার্বতী কাছে গেলে ঢুঁ মারতে এল।

তখনই পার্বতীর হুঁশ হল তার ভাইটা একা ঘরে বসে আছে লম্ফ জ্বালিয়ে। সে এবারে দৌড়ে গেল ঘরে। ভাইকে জড়িয়ে ধরে বলল, আয়। দেখবি বিশার কী সুন্দর বাচ্চা হয়েছে।

পটল দিদির পিছু পিছু গামছা মাথায় দিয়ে দৌড়ে গেল। লম্ফটা তুলে ধরে দেখাচ্ছে পার্বতী।

কপিল তখন, বাচ্চাটার নাকে মুখে ফুঁ দিচ্ছে। তিড়িংবিড়িং করে নড়ছে, উঠতে চাইছে। কী মজা। পটল বলল, দিদিরে।

পার্বতী ভাইকে জড়িয়ে কেমন এখনও সম্মোহনের মধ্যে আছে। একবার শুধু বলল, কি সুন্দর চোখ! ও মা আমাদের দেখছেরে পটল।

আসলে পার্বতীর মনে হচ্ছিল, বাচ্চাটা তাকিয়ে জানতে চাইছে, তারা কে?

পার্বতী বলল, আমার ভাই পটল।

পার্বতী ফের বলল, আমার নাম পার্বতী, আমি পটলের দিদি!

পার্বতী বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, আমার বাবা!

বাচ্চাটা আবার হাঁটু মুড়ে পড়ে গেল।

পটল ধরতে গেলে কপিল বলল, কাছে যাস না, বিশা ঢুঁ মারবে।

কী হিংসুটেরে বাবা!

কপিল হাসল। মায়ের প্রাণ, কত শঙ্কা।

পার্বতী বলল, শঙ্কা না ছাই। এত করি, তবু তেনার বিশ্বাস নেই। আয়রে পটল, আমরাও রাগ দেখাতে জানি গ। কাল তোমার ঘর কে সাফ করে দেখব। কে ফ্যান জল দেয় দেখব।

কপিলের কেমন এক মায়া জাগে—এই দুই সন্তান, বিশা, আর ঘরবাড়ি, বৃষ্টিপাত, প্রকৃতির সুষমার লীলাখেলার মধ্যে ফের জীবনপাত সবই যেন কোন এক প্রবল কেন্দ্রবিন্দু থেকে উৎপত্তি। কে কোথায় থাকে কোথা থেকে আসে, ভাসমান প্রাণের মধ্যে নিত্য রূপ নেয় আবার মিলিয়ে যায়, প্রকৃতি তারে হজম করে নেয়—সুরূপা থাকলে এই ঝড়-বাদলার দিনে সে আরও বেশি সাহসী হতে পারত। পটলার হবার দিনে, ঠিক এমনি ঝড়-বৃষ্টি। সে মাথায় করে নিয়ে এসেছিল, গুঁড়ি কাঠ, ঘর বেঁধে দিয়েছিল উঠোনে। চালে শণ পেতে দিয়েছিল, নাপিতবাড়ির বড় বৌকে বলে এসেছিল, উঠেছে, চলে আসেন। এবং প্রহর গোনা বারান্দায় বসে। পটলাকে মাটিতে রেখে সেই যে জ্ঞানহারা হল, আর তা ফিরল না। বিশার বাচ্চা

হওয়া নিয়ে সে এজন্য বড় উচাটনে ছিল—কপাল পোড়া মানুষ সে। সুখ তার কপালে সয় না। অধিক সুখেও সে প্রাণ খুলে হাসতে পারে না। কেবল মনে হয়, কোন এক আছি বুড়ো তাকে তাড়া করে ফিরছে। খেতে-বসতে, কোদাল মারতে, দেশছাড়া হতে, ট্রেনে, বাসে, ক্যাম্পে সে শুধু তাড়া খাচ্ছে। এখানে এসেও আর এক তাড়া, বনমালী ছোঁড়াটা পিছু লেগেছে মেয়েটার। মধুদা, রায় মশায় আছে বলেই তার সাহস। মল্লিকমশাই গাঁজাখোর লোক—নাহলে একটা বালিকাকে পুষে বড় করে কেউ! বিশার বিপদ কেটে যাওয়ায় কেমন ঝাড়া হাত-পা কপিলের। গোয়ালের ঝাঁপ বন্ধ করার আগে, বাঁশের বাতা দিয়ে তিনপাশে খোঁয়াড়ের মতো করে দিল। পার্বতী পটল এখন সবাই তার সাহায্যকারী।

পটল বলল, এটা নাও।

পার্বতী বলল, দেব বাবা পুঁতে।

কপিল দেখে বলল, দে ঠিক আছে।

তারপর কোনরকমে বেড়া বেঁধে সে বাইরে বের হয়ে এল শাবল খোন্তা হাতে নিয়ে। গোয়ালের চারপাশটা দেখল। ঝাঁপ খুলে কেউ যদি বিষটিস ছুঁড়ে দিয়ে যায়—মেঘলা ঝড়ো হাওয়ায়, পঙ্গপালের মতো মানুষের অপকারকেরা ঘুরে বেড়ায়। তার চিন্তা বাড়ে।

কপিল, বর্ষণের ধারাতেই উঠোনে দাঁড়িয়ে চান করল। বারান্দায় লম্ফ জ্বলছে। জল-ভাত আর আধখানা কাঁচা পেঁয়াজ থারগন পাতা বাটা বড় মধুর খাদ্য। একটু কাগজিলেবুর পাতা আর শুকনো লঙ্কা পোড়া, অমৃত আর কাকে বলে। হুস-হাস খাচ্ছে। পটল খেতে খেতে বলল, বাচ্চাটার নাম রাখবে না বাবা?

কপিল বড় খুশি মনে বলল, তুই একটা নাম রাখ না।

পটল ভারি বিজ্ঞজনের মতো খাওয়া থামিয়ে ভাবতে থাকল।

পার্বতী বসে আছে। বাপ ভাইয়ের খাওয়া হলে সে খাবে।

বাবা তাকে বাচ্চাটার নাম রাখার দায়িত্ব দিচ্ছে না বলে বেশ গোমড়া মুখে তাকিয়ে আছে।

পার্বতী বলল, এই খাবি তো খা, না হয় ওঠ। আমার খিদে পায় না বুঝি!

পার্বতীর কথা পটল কানে তুলল না। দিদিটা মাঝে মাঝে কেমন হয়ে যায়। তাকে ভালবাসে না। বাবা তাকে কত বড় দায়িত্ব দিয়েছে! দিদির খুশি হবার কথা! ফুটফুটে বাচ্চাটার যে সে নাম হলে হবে কেন! ভেবে-চিন্তে একটা সুন্দর নাম রাখবে সে। তা নয়, তাড়া লাগাচ্ছে। সে বলল, হিজল।

পার্বতী বলল, হয়েছে, এই নাম! হিজল! হিজল কেন হবে।

বারে আমরা হিজলে থাকি না। হিজল বিল, হিজল গাছ, বাচ্চাটার নাম হিজল।

পদ্য ধরেছে!

কপিল বলল, রাগ করছিস কেন পার্বতী। হিজল তো বেশ সুন্দর নাম।

মেয়ে বাছুরের নাম হিজল হবে কেন? হিজলী হবে।

তা একখানা কথা বটে।

পটল বাবার কথায় দমে গেল।

পার্বতী বলল, আমি নাম রাখব বাবা!

কী নাম!

হরিণা। হরিণের মতো গায়ের রঙ, হরিণা। সুন্দর নাম না বাবা?

কপিল বলল, দুটো নামেই ডাকিস। যার যেমন খুশি। ঘরের জীব, নাম থাকবে না হয় না

পটল বলল, তুমি কিন্তু আমার নামে ডাকবে বাবা!

পার্বতী সঙ্গে সঙ্গে বলল, না আমার নামে।

পটল দিদির সঙ্গে পেরে না উঠে খাওয়া পাতে উঠে গেল। আমি খাব না। তোর কোন কাজ যদি করি!

পার্বতী তাড়াতাড়ি লাফ দিয়ে পটলের হাত ধরে ফেলল। বলল, খা ত আগে। না খেলে, দেখবি আমার কি হয়! কপিল এমন কথায় ভারি মুহ্যমান হয়ে যায়। খেতে খামারে সে জন্য পড়ে থাকতে পারে. দিনমানে মেয়েটা তার সব দেখেশুনে রাখে। পটলকে চোখে চোখে রাখে। পটলের জন্য বাতা দিয়ে চাকা বানিয়ে দেয়। পটল চাকাটা রাস্তায় চালিয়ে নিয়ে যায়—ব্যালাঞ্চের খেলা খেলে। এভাবে বুঝি ভরে থাকে জীবন—কপিলের ক্লান্তিতে ঘুম পায়।

বৃষ্টিটা ধরে আসছে। শোবার আগে কপিল আর একবার গোয়ালে ঢুকে সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে এল। পা ধুল জালা থেকে জল নিয়ে। পার্বতী মাচানে বাপের বিছানা পেতে দিয়ে, নিজেদের বিছানা করে ফেলল। পটল, দিদির যদি সত্যি কিছু হয় ভয়ে বাকি ভাতটুকু খেয়ে খালি মাচানে শুয়েছিল। ওকে ডেকে তুলেছে। তারপর বাবা শুলে লম্ফ নিবিয়ে ভাইয়ের পাশে সেও শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম এল না।

অন্ধকার ঘরে ছুটো একটা জোনাকি জ্বলছে। গরুটা বাচ্চা হওয়ার বিষয়টা মাথা থেকে যাচ্ছে না। গাভীন হবার আগে কী ডাকাডাকি। সে বালিশে মুখ গুঁজে ফিক করে হেসে দিল। তারপর কিছুক্ষণ চিৎ হয়ে শুয়ে থাকল। বনমালীদা যদি আলতা এনে দেয়। বাপকে বলতে পারে না। লজ্জা করে। বাবা তাহলে বুঝতে পারবে, সে বড় হয়ে গেছে। বনমালীদাদা দিলেও পরতে পারবে না। একটা ফন্দি আঁটতে হবে—বলবে সই জোর করে পরিয়ে দিয়েছে। আলতা পরা পা দেখলেই বাবার রাগ হতে পারে—কোথায় পেলি, কে দিল! সে যত বড হয়ে উঠছে, বাবার সংশয় বাড়ছে। কোথায় গেছিলি রে! এতক্ষণ লাগে! কার সঙ্গে কথা বলছিলি!

পটল ডাকল, ও দিদি, তোর ঘুম আসছে না।

ঘুমোচ্ছি ত।

তুই ঘুমোচ্ছিস ত পা নড়ছে কেন! মাচান নড়ছে।

সঙ্গে সঙ্গে পার্বতী পা নাচানো থামিয়ে দিল।

শুলেই এটা হয়। আর বিদঘুটে ভাবনা মাথায় ঢুকে গেলে এটা আরোও বেশি হয়। ফ্রক পরে বের হতে লজ্জা করে।

কপিলেরও দুশ্চিন্তায় ঘুম আসছিল না। খুট করে কোথাও শব্দ হলে, সে কান পেতে আরও ভাল করে শোনার চেষ্টা করছে। তারপর শব্দটা কোত্থেকে হতে পারে এমন একটা আন্দাজ করতে পারলে পাশ ফিরে শুচ্ছে। পটলের কথায় বুঝতে পারল পার্বতী ঘুমায়নি।

কপিল বলল, পার্বতী কাল একবার বড় বৌঠানকে খবর দিস। বলবি, বাড়িতে বিপদনাশিনী ঠাকুরের পূজা দেবে বাবা। তোর সোনাকাকি, ছোট কাকিকেও বলবি। তোর ফটকি ঠাকুমাকেও বলবি।

পার্বতী কোন উত্তর করল না। দিবুদাদের বাড়ি সে কিছুতেই ফ্রক গায়ে দিয়ে যেতে পারবে না।

কিরে কানে যায় না?

পার্বতী পাশ ফিরে বলল, আমি পারব না।

মেয়ের কথায় মাথায় রাগ চড়ে যায়। সহসা উঠে বসে কপিল। ঠাকুর-দেবতা নিয়ে অবহেলা!

কি বললি!

পারব না।

পটল বলল, আমি যাব বাবা?

না, তোমায় যেতে হবে না। কপিল ভাবে পটল নেহাতই ছেলেমানুষ। তার কথার কোন গুরুত্ব দিতে নাও পারে। তার সংসারে ত এমন হয় না! পার্বতী তার মুখের ওপর কখনও না করে না। মেয়েটা তার দিনকে দিন এমন হয়ে যাচ্ছে কেন! আগের মতো ভয়ডরও কমে গেছে। মাঝে মাঝে তেজ দেখায়। সে সব

সহ্য করতে পারে, কারো জেদ সহ্য করতে পারে না। সে ভাল কথার মানুষ। নিজের মেয়ে হয়ে মুখের উপর কথা বলিস। যেন সংসারে তার প্রতিপত্তি নিয়ে এটা একটা প্রশ্ন। এত করে শেষে তোরা আমার এই হলি !

তোমার বাবা যাবে। যাবে না মানে।

না, না আমি পারব না, পারব না।

অন্ধকার রাত, ঝিরঝিরে বৃষ্টি। ঠাণ্ডা ভাব। কোথাও শেয়াল ডাকছে। জল নামার শব্দ, কীটপতঙ্গ ডাকছে। এবং বাঁধের শেষে কপিল আলো দেখতে পেল, জানলায় ফাঁক দিয়ে। বৃষ্টিতে জল নামছে। জলা জায়গা থেকে মাছটাছ উঠে আসতে পারে। কেউ হয়তো মাছ খুঁজছে। শরীর দিচ্ছে না বলে সে যায়নি। মাছধরার নেশা তারও কম ছিল না। কিন্তু এই রাতে বাড়িটা ফেলে তার কোথাও যেতে শঙ্কা বোধ হচ্ছিল। তার ঘুম আসছিল না। রাজ্যের চিন্তা মাথায়। কাল সকালে কোদাল নিয়ে জমিতে নামতে হবে। সারা দিনমান কাজ। বছরখানেক আগে হলে, পার্বতীর মেজাজ বের করে দিত। দুগালে কষে চড়। কিন্তু পার্বতী বড় হয়ে যাচ্ছে। এখন তুলে যে ঠ্যাঙাবে সে সাহসও তার নেই। সে কেমন অসহায় বোধ করতে থাকে। মেজাজ তিরিক্ষি থাকে না। পার্বতী ঠিক ওর মার চোখ মুখ পেয়েছে। যত বড় হচ্ছে পার্বতী তত সেই হুবহু এক ছবি। এই রাত এবং ঠাণ্ডা আমেজ, বৃষ্টির ঝিরঝির শব্দ তাকে স্ত্রীর স্মৃতির প্রতি কেমন আরও তলিয়ে নিয়ে গেল। বড় একা লাগে। নিঃস্ব লাগে। খালি খালি। পার্বতীর জেদী থাকা স্বভাবটাও উধাও।

কপিল তার বিছানায় দু-হাঁটুর মধ্যে মাথা গোঁজ করে বসে আছে।

পার্বতী এর প্রথম তার উপর রুখে উঠেছে। কি রকম একটা জ্বালাবোধে সে পীড়িত হচ্ছিল।

পার্বতী অন্ধকারেও টের পাচ্ছে, বাবা ঘুমোয়নি। মাচানটা নড়ছে। ঝাঁপের জানালা থেকে একটা আবছা আলো এসে পড়ছে। বাবা মূর্তিমান পাথরের মতো মশারির নিচে বসে। মাথা গোঁজ করা। আবছা ছায়া থেকে সে টের পায় বাবা ভাল নেই। সে ডাকে, বাবা।

বল।

আমি যাব। তুমি ঘুমোও।

কোথা থেকে অজস্র বারিপাতের মতো আবেগ সঞ্চার হতে থাকে কপিলের শরীরে। মুহূর্তে মনে হয়, সে যতটা নিজেকে নিঃস্ব ভাবছিল, তা নয়। আশ্চর্য মায়া বোধ করে ঘরবাড়ির জন্য। সে বলল, আজ কি বার রে?

সোমবার।

তালে ত দুদিনও বাকি নেই। কেউ সাটুইর বাজারে গেলে পয়সা দিয়ে দিস। পান সুপারি আরও কী সব লাগে যেন। বিশার জন্য মানত করেছিলাম, না দিলে ঠাকুরের কোপ বাড়তে কতক্ষণ।

পটল বলল, আমি দিয়ে আসব বাবা?

না। পার্বতীই দেবে।

পার্বতী মুখের উপর আজ প্রথম বাবাকে পারব না বলেছে। এতে সে নিজেও কেমন অস্বস্তির মধ্যে ছিল। বাবা তো বোঝে না ফ্রক গায়ে দিয়ে সব জায়গায় যেতে পারলেও দিবুদাদের বাড়ি যাওয়া যায় না। টিনের বাক্সে বড় যত্ন করে তোলা আছে মায়ের শাড়ি, ব্লাউজ। বাবা ওটা পার্বতীকে পরতে দেয় না। মার চিহ্ন। স্যুটকেসটার মধ্যে আর আছে সিঁদুরের কৌটা, একজোড়া শাঁখা। ঘরের কাড়ে বাতায় ঝোলানো। লক্ষ্মীপূজার দিন, বাক্সটায় বাবা সিঁদুরের ফোঁটা দেয়। অমঙ্গল থেকে বাবা বাড়িটাকে, তাকে পটলকে, বিশাকে এভাবে রক্ষা করে। বাবা বোধ হয় টের পায়, মা লক্ষ্মী ওর মধ্যে পোরা আছে। শরীর অশুচি থাকলে ওটা

ছোঁয়ারও নিয়ম নেই। বাবা ওটা খুলতে গেলে স্নান আহ্নিক করে খোলে। মার শাড়ি পরার জন্য মনটা তার বড় বেশি বেপরোয়া হয়ে যায়। বাবার ভয়ে ধরতে পারে না। বাবা বড় দীন দুঃখী। সে তবু সাহস করে ফের ডাকল, বাবা।

কপিল, উদোম শক্ত বালিশটা ঠিকঠাক করে নেবার সময় বলে, কিছু বলবি।

পার্বতী আবার চুপ।

মেয়েটার কী যে হয়েছে। কদিন থেকেই দেখছে, কী বলতে গিয়ে বলে না। অন্য কথা বলে। সে খুব জোর দিয়ে জানতেও পারে না। মেয়ে আবদার করে বসলে যদি রক্ষা করতে না পারে। মুখ ব্যাজার হয়ে যায় তার। তবু বলল, কিরে ঘুমিয়ে পড়লি ?

না বাবা !

কপিলের ক্লান্তিতে হাই উঠছে। এমন চোখ জুড়িয়ে আসছে যে আর কোন প্রশ্ন করতেও ইচ্ছে হচ্ছে না। সে শুয়ে পড়ার সময় শুনল পার্বতী যেন কি বলছে। ঘুমের ঘোরে সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে না। পার্বতী ঠিক তার মার মতো গলা করে আব্দার জানাচ্ছে। দূরাতীত গ্রহ থেকে কথাবার্তা কানে ভেসে আসছে। আমায় আলতা এনে দেবে বাবা. তারপর কথাগুলি স্পষ্ট নয়। ঘোরের মধ্যে থাকলে মানুষের কথাবার্তা যেমন অবিশ্বাস্য ঠেকে, রূপকথার মতো মনে হয় তেমনি কপিলের মনে হচ্ছে—আলতা স্নো পাউডার। শাঁখা সিঁদুর। শাড়ি সায়া ব্লাউজ। এক রূপবতী কন্যের চুল চোখ আকাঙ্ক্ষায় ডুবে আছে। কোন শস্যক্ষেত্র অথবা যব গমের গাছ মাড়িয়ে সে ফিরছে মেলা থেকে। পাশে তার সুরূপা। পায়ে রুপোর ঝুমুর। ঝনঝন করে বাজছে। তার ঘুম আসছিল তোড়ে। বাঁধের উপর দিয়ে কে দৌড়ায়—আঁচল ওড়ে, আকাশে তারা ফোটে। নিশুতি রাতে বাদলা দিনের ঠাণ্ডায় শরীরে সে শীতল স্পর্শ পায়।

তার হাত নড়ে। বুকে টেনে আনে কিছু। তারপর কেউ মাথা গুঁজে দেয় বুকে। কপিল নিঃসাড় হয়ে যাচ্ছে।

পার্বতী কান খাড়া করে রেখেছে। বাবা আর কিছু বলছে না। পার্বতী দেখে কুঁকড়ে শুয়ে আছে পটল। গায়ে কাঁথা তুলে দেয়। কে বলবে এই কিছুক্ষণ আগে ধরণী ছিল তপ্ত এবং উদাসীন। যেন সে জানেই না তার মাঝে বিচরণ করে বেড়ায় মানুষেরা। ঠাণ্ডা জলো বাতাসে পার্বতীরও শীত শীত করে। বিস্ময় মতো সে টল-টল করে চেয়ে থাকে। বাবা ঠিক কিছু এবার বলবে।

কিন্তু কপিলের কোন সাড়া না পেয়ে সে ফের ডাকল, বাবা আমি কী বললাম শুনতে পাচ্ছ!

সে শুনল, বাবার নাক ডাকছে।

কপিল ঘুমাচ্ছে।

পার্বতী পাশ ফিরে কপালে হাত রেখে ঘুমোবার চেষ্টা করল। বাবা তার কোন কথাই হয়তো শুনতে পায়নি। সকাল হলে বাবার সামনে মুখ ফুটে আর কখনও সে চাইতে পারবে না, বাবা, সই পায়ে আলতা পরলে কী সুন্দর লাগে। আমায় আলতা এনে দেবে?

দিব্যেন্দু সারা রাত অঘোরে ঘুমিয়েছে। ঝড় বাদলায় ঠাণ্ডা পৃথিবী। শেষ রাতের দিকে একটা চাদরও গায়ে দিতে হয়েছে। ঘুম ভাঙলে দেখল, মা, সোনা কাকিমা ছোট কাকিমার স্নান সারা। ওদিকে বাছারি ঘরে ধোঁয়া উঠছে। জেঠিমা আঁচ দিয়েছেন উনুনে। বড় কাঁসার থালায় এক তাল আটা মাখা। জ্যাঠামশাই বাঁধের দিক থেকে হেঁটে আসছেন। কানে পৈতা ঝোলানো। বাবা বাড়ি নেই, সকালেই মুনিষের খোঁজে বের হয়েছে। সে বুঝতে পারল, তার ঘুম ভাঙতে খুবই বেলা হয়েছে।

বড় প্রসন্ন সকাল। আকাশ পরিষ্কার। দিব্যেন্দু বাইরে বের হয়ে আড়মোড়া ভাঙল। অফুরন্ত সময়। জায়গাটাতে কিছুই নেই

এখনও। লাইব্রেরি নেই, গল্পের বই পাওয়া যায় না। দিন কাটে না তার। কেবল বৃন্দাবন করের ভাইপো ললিত, মোড়ে একখানা চায়ের দোকান খুলেছে। বাঁশের বাতা কেটে খুঁটি পুঁতে মাচান। একটা ভাঙা তক্তাপোশ ভিতরে, এক কোণায় ললিতদার বসার জায়গা। কাগজ পেনসিল লজেন্স বিস্কুট রাখে। পাশ দিয়ে বড় সড়ক বাঁধ থেকে নেমে কান্দ বরাবর চলে গেছে। মাঝে মাঝে দেখা যায় গরুর গাড়ি অথবা কোন সাইকেল আরোহী। ওরা গাছের কাণ্ডে সাইকেল হেলান দিয়ে ঠাণ্ডা জায়গায় জিরিয়ে নেয়। চায়ের তেষ্টা পেলে চা খায়। দু'একখানা লেড়ে বিস্কুট। এখানে আসার পর থেকেই দিব্যেন্দুর জায়গাটার প্রতি কেমন নেশা জন্মেছে। ললিতদা তার দেশের মানুষ। তাকে নিয়ে ললিতদার একটা প্রচ্ছন্ন অহংকার আছে। পাশের গাঁয়ের ছেলে দিব্যেন্দু, এখানে আসার পর এক গাঁয়ের হয়ে যাওয়ার টানটা বোধহয় আরও বেড়েছে মুখটুক ধুয়ে একবার সেখানে যাওয়া দরকার বোধ করে দিব্যেন্দু।

মাচানটায় বসলেই অনেক দূর পর্যন্ত চোখ চলে যায়। এমন খাঁ খাঁ মাঠ, রোদ্দুর সে জীবনে বড় দেখেনি। মাইলের পর মাইল চলে গেছে শস্যবিহীন মাঠ। অনেক দূর থেকে ভেসে আসে গরুর গাড়ির চাকার কঁ্যাচকঁ্যাচ শব্দ। অথবা মনে হয় দূরে কোথাও কোন ডাইনী বুড়ি, পথ হারিয়ে গোঙাচ্ছে। তার গ্রাম মাঠ ছিল, বড় কাছাকাছি। যোজন-ব্যাপী দূরত্ব সেখানে ছিল না। খোলা প্রান্তর দেখতে দেখতে কখনও সে বড় উদাস হয়ে যায়। ইতস্তত দুটো একটা তালগাছ কিংবা তিজুল গাছ বাদে আর কিছু চোখে পড়ে না।

পড়া নেই, পরীক্ষা নেই। কেমন সে মুক্ত মানুষ। এ-কদিনে, অঞ্চলটা তার ভাল জানা হয়ে গেছে। এখানে আসার দিন সে পথ হারিয়েছিল। বাঁধে বাঁধে অনেক দূর যাওয়া যায়। আর কিছুদূর গেলে রেল লাইন। স্টেশন। ললিতদার সঙ্গে একদিন সাইকেলে স্টেশনেও গিয়েছিল। সাইকেলে ঘণ্টাখানেক লাগে না। রাস্তা-

ঘাট দুর্গম বলে এত সময় লাগে। নদীর চরা পার হতে হয়। বর্ষায় অঞ্চলটা যে দ্বীপের মতো হয়ে যাবে সহজেই সে বুঝতে পারে।

এখানে এসে অদ্ভুত সব খবর সে ললিতদার কাছে পেয়েছে। যেমন এই সুমার মাঠে কাউকে খুন করে রেখে গেলে দেখার নেই। দূরে দূরে ঘেরির মাথায় চালাঘর, বর্ষায় গরু বাছুর নিয়ে জল সাঁতরে সব গরু মোষ নিয়ে আসবে মানুষজন। চালাঘরে থাকবে খাবে আর বাঁধের পাড়ে পাড়ে গরু মোষ চরাবে। যেমন বান বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে আসে কাঠের সিন্দুক, মরা মানুষ এবং গরু বাছুর। এমনকি একবার এক যুবতী ভেসে এসেছিল, পরনে লাল পেড়ে চেলি, মাথায় রক্ত জবার মতো সিঁদুরের ফোঁটা, নাকে নথ, গা ভর্তি অলংকার। যে-পায় সে রাজা হয়ে যায়। চট্টরাজদের ঘেরির পাশেই দুর্গা-ঘেরি। ঘেরিটার নাম ঐ যুবতীর নামে। লাশ ওখানে আটকে পড়েছিল।

ললিতদা সব সময় বলবে, একটা কিছু করব। কি করবে বলতে পারে না। হাতের কাছে যা পাওয়া যায়—যা পাওয়ার সূত্রে চায়ের দোকান। উদ্ভট সব পরিকল্পনা ললিতদার। এখন যে ইচ্ছেটা ললিতদাকে পেয়ে বসেছে সেটা এক সার্কাসের। সে সার্কাসে সিংহের খেলা দেখে ভুলতে পারছে না। যে-মেয়েটা খেলা দেখিয়েছিল, ললিতদার ধারণা—মেয়েটা আর জন্মে ইন্দ্রসভায় নাচত। ইন্দ্রের অভিশাপে উর্বশী এখন সিংহের খেলা দেখাচ্ছে। খুব ভাব করার ইচ্ছা ছিল। বহরমপুর শহরে লালদীঘির মাঠে শিরিষ গাছের নিচে উঁকি দিয়ে বসে থাকত। রেলিং লাগোয়া তাঁবু। একদিন সে তাকে দেখতে পেয়েছিল, সার্কাসের হাতীশালার পাশে। মেয়েটা একটা বাচ্চা হাতীকে খাবার দিচ্ছে। ললিতদা চেঁচিয়ে উঠেছিল, জীবন সার্থক। একটা সার্কাস খোলার সেই থেকে ফন্দি মাথায়। একটা মেয়ে দেখে জীবন কতটা সার্থক হয় ললিতদা নাকি এর আগে জানত না।

দিব্যেন্দু দেখল ততক্ষণে জ্যাঠামশাই বাড়ি ঢুকে গেছেন। এখন

তার চানের তাড়া। সোনা কাকীমা ঠাকুরঘরে ঢুকে পূজার আয়োজনে ব্যস্ত। জ্যাঠামশাই বাড়ির কাজ বলতে এই পূজাটুকু করেন। অন্য সময় নিজের কাঠের চেয়ারটায় বসে থাকেন—আর কাঠের বাক্সটা খোলা থাকে। জ্বর জ্বালায় ওষুধ নিতে আসে যারা, লম্বা কাঠের পাটাতনে তারা বসে। দেশে থাকতেও জ্যাঠামশাই এই করতেন। হাতযশ আছে। এখানে সেই হাতযশটা আবার ঝালিয়ে নিচ্ছেন। সব সময় কেমন একটা নির্লিপ্তভাব চলাফেরায়। তাকে দেখে বললেন, এতক্ষণে ওঠা হল: একবার ললিতকে নিয়ে কাঁদি যা। দেখে আয় কলেজটা। এতদূর যাবি, রাস্তাঘাট চিনে রাখবি না। সে বুঝতে পারে জ্যাঠামশাই এ-দেশে খড়কুটো অবলম্বন করার মতো তার পড়ার কথা ভাবছেন। আজকাল জ্যাঠামশাই মাঝে মাঝেই কাঁদি যাবার জন্য তাড়া দিচ্ছেন। সংসারে কার কি করার কথা জ্যাঠামশাই দেশে থাকতে ঠিক করে দিতেন, এখানে এসেও তাই। তার উপর কথা বলার কেউ নেই। বাবা খুব বেশি বললে বলবেন, বড়দা যে তোকে বলল কলেজটা দেখে আসতে, গেলি না!

সে বাবাকে শুধু বলতে পারে, যাব। জ্যাঠামশাইকে তাও বলতে পারে না। মানুষটা কম কথা বলেন, কাঠের চেয়ারে বসে থাকেন আর রোগীপত্তর না থাকলে কালী কালী করেন। এই মানুষটাই যে একদিন দেশের হয়ে জেল খেটেছেন, দেখলে বিশ্বাসই করা যাবে না। কখনও তার সংগ্রামের দিনগুলি সম্পর্কে কাউকে কিছু বলেন না। বাবার অঢেল সম্পত্তি—ছোট ভাইরা সব দেখাশোনা করে, তার যেন কথা ছিল, দেশের হয়ে কাজ করার। কি বুঝে ঠাকুরদা বোধহয় বুদ্ধিমানের মতো বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন। সংসারে তখন মেজর বিয়ে হয়ে গেছে। সেজর বিয়ে ঠিক। একটু বেশি বয়সে জেঠিমা ঘরে এলেন। বয়সের ফারাক বেশ। কিন্তু জেঠিকে মান্য করতে কেউ ভুলল না। জেঠির সঙ্গে জ্যাঠামশাইও গৃহী হয়ে গেলেন

পুরো দস্তুর। এ সব তার শোনা কথা। সে বড় হয়েছে, মার চেয়ে বেশি জেঠির কোলে।

সংসারের প্রতি নির্লিপ্ত ভাবটাই জ্যাঠামশাইকে এই জায়গা করে দিয়েছে। এখানে আসার পর সে লক্ষ্য করেছে জ্যাঠামশাই আগের মতো কাজটাজের কথা ভুলে যান না। এই নিয়ে তিনবার হল। যেন সে না গেলে, সংসারের বড় একটা কাজ করা বাকি থাকছে। সংসার কি ভাবে চলছে, চলবে তার দায় বাবার। তিনি শুধু বলে খালাস। সংসারে ছোটদের তিনি অভিভাবক। পড়া-শোনার প্রতি আগ্রহ তার অন্য ভাইদের তুলনায় একটু বেশি। দিব্যেন্দু বুঝতে পারে ছোটদের ঠিকঠাক মানুষ হওয়ার মধ্যে বাপ-ঠাকুরদার ইজ্জত রক্ষা হবে এমন ধারণা জ্যাঠামশাইয়ের। তাই তাড়া দিচ্ছেন কদিন থেকে। আগের মতো নির্লিপ্ত স্বভাব নিয়ে বেঁচে থাকলে বিদেশ-বিভুঁইয়ে টেকা দায় এমনও মনে হতে পারে তাঁর। দিব্যেন্দু কিছু বলল না! যেন কিছু বললেই মুখের উপর কথা হয়ে যাবে—সে শুধু ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাল।

যেতেই হয়। ললিতদার সাইকেল আছে। ঘরে ছোটকাকার সাইকেলও একখানা আছে। কিছু ভাল না লাগলে সাইকেলে চক্কর দেয়। ঘুরে বেড়ায় এই ঘেরির পাড়ে পাড়ে—কখনও সড়ক ধরে চলে যায়—উধাও হতে তার আজকাল কেন জানি ভাল লাগে। কখনও কোন গাছের নিচে একা বসে থাকতে তার ভাল লাগে। সে কী হবে জানে না তবু তার কেন জানি জ্যাঠামশাইর মতো মানুষ হতে ইচ্ছে হয়। সে এখানেও দেখেছে মানুষজন বেশ সম্মান করে তাঁকে। পরিবারের মর্যাদা এই মানুষটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ললিতদার মতোও ইচ্ছে হয় কোন সার্কাসের মেয়ের প্রেমে পড়ে যেতে। এই বয়সটা বড় তাকে কাবু করে দিচ্ছে। কেউ যেন তার জন্য বড় হচ্ছে কোন শস্যক্ষেত্রের পাশে নদীর পাড়ে। সে কে জানে না। মাঝে মাঝে মনে হয়, কোন পাহাড়ী উপত্যকায় মেয়েটা

লাফিয়ে উঠছে, অথবা স্কিপিং করছে লাল নীল দড়ি নিয়ে। বব করা চুল তার, লম্বা ফ্রক গায়, পায়ে রঙিন জুতো। পার্বতীর মুখটা ভারি সুন্দর। মল্লিকের মেজ মেয়ে মীনা একদিন বাঁধের পাড়ে দাঁড়িয়ে তাকে লুকিয়ে দেখছিল। সে উদোম গায়ে স্নান করে ফিরছে। তার কেমন লজ্জা করছিল চোখ তুলে তাকাতে।

সকালে তিনখানা সেঁকারুটি, আলুর তরকারি—বেশ মনোরম লাগে খেতে। সোনা কাকীমা কলাপাতায় মোড়া ফুল বেলপাতা জলে ধুয়ে তামার টাটে রাখছেন। ফুলের বড় অভাব। রাতে ছোট কাকার আর কিছু না আনলেও চলে, কিছু ফুল বেলপাতা দরকার সব সময় এই পরিবারে। বাবা কিছু দোপাটি ফুলের গাছ লাগিয়ে রেখেছেন—জল নেই বলে বাড়ছে না, ফুল ধরছে না। জবা ফুলের কলমও লাগানো হয়েছে। বছর দু-বছর পার না হলে ফুল ফুটবে না। একটা স্থলপদ্মের গাছও আছে বাড়িতে। কিছু না থাক বাবা কাকাদের ফুলের বড় দরকার জীবনে। ফুলের যত্ন আত্তি দেখলে সে বোঝে সংসারে বাপ-কাকারা বড় বেশি শুভাশুভের কথা ভেবে থাকেন। ক্যাম্পে থাকার সময় দেশের ঠাকুর-দেবতা ট্রাঙ্কে তোলা ছিল—বাড়িঘর হতেই সব নামিয়ে যেখানে যা সাজানো দরকার এক বছরের মধ্যে তা করা হয়ে গেছে। বাসি ফুলে পূজা। কী করবেন, বাবার কথায়—যে দেশে যে আচার। না মিললে কী করা যায়!

জেঠিমা বললেন, আর একখানা নে। খেতে আজ অনেক বেলা হবে। দিব্যেন্দু আর নিল না। ললিতদার দোকানের এক পাশে সেও গিয়ে বসে থাকবে। ললিতদা যখন চা খায়, তাকেও এক কাপ দেয়। বাড়িতে চায়ের পাট নেই। তবে অতিথি অভ্যাগত এলে চা হয়। সে যে ললিতদার ওখানে চা খায় কেউ জানে না। গোপনে খেতে হয়। চা খায় জানলে, জ্যাঠামশাই রুষ্ট হবেন। মনোকষ্টে ভুগবেন। সংসারটাকে যে ভাবে রাখতে চান, সে ভাবে থাকছে না, উচ্ছন্নে যাচ্ছে সব এমন মনে হবে তাঁর।

দিব্যেন্দু উঠে পড়ল। একটা হাফ শার্ট গায়ে দিল। তারপর বের হয়ে গেল। সে যখন হেঁটে যায়, মনে হয় তার, সবাই তাকে লক্ষ্য করছে। এখানকার মানুষজন কিছু পরিচিত কিছু অপরিচিত। নানা জায়গা থেকে লোক এসেছে। কথা এক রকমের না। কে কোথাকার কোন জেলার এ-সব তার এখনও ভাল জানা হয় নি। ললিতদার দোকানে গিয়ে বসলেই সবার পরিচয় পেয়ে যায়, ঐ যে বুড়িটা আসছে, ওদের দেশ হোগলা পাড়ায়। লোকটাকে দেখলে, কে বলবে ওর দীঘিতে এক মনি রুই কাতলা ভেসে থাকত। নায়েব ছিল উদ্দবগঞ্জের বাবুদের। সব গেছে, আছে শুধু গোঁকখানা। ফণী আসে না! ফণী মণি দু-ভাই! তোর সঙ্গে কথা বলল—ওদের বাবা। তখনকার দিনে এণ্ট্রান্স পাস।

দিব্যেন্দুর এ ভাবেই এ-জায়গার সঙ্গে পরিচয়। কে কী করে, কী ছিল কার, এখন কার কি-ভাবে সংসার চলে ললিতদার জানা। ঘেরিতে যেই উঠে আসুক তার দোকানের পাশ দিয়ে উঠে আসতে হয়। ঘেরিতে উঠেই সংশয় দেখা দিলে. প্রথম যে মানুষটাকে পাওয়া যায় সে হল ললিতদা। তার কাছেই খোঁজখবর নিয়ে ভিতরে এগোনো। ললিতদা পায়ের নিশানা দিয়ে বলবে বাড়ির সামনে দেখবেন, একটা জামরুল গাছের চারা বড় হচ্ছে। অথবা বলবে, ভদ্রলোকের দুই মেয়ে। নাকে নথ আছে। এখানে কোন বড় পুকুর নেই বাঁশঝাড় নেই কিংবা বড় শিশু গাছ বাড়ির নির্দেশ ললিতদা এভাবেই দিয়ে থাকে। বলতে পারে না বড় বাঁশঝাড় আছে, পুকুর আছে কিংবা শিশু গাছের ছায়া।

এই যে দিবুবাবু ঘুমিয়েছ খুব. কী বৃষ্টি। দেখছ মাঠ ঘাট।

দিবু পা তুলে তক্তপোশে উঠে বসল। সে চারপাশ দেখছিল। খাঁ খাঁ রোদ্দুরের পর ঠাণ্ডা আমেজ মানুষকে বোধহয় ভারি বিস্ময়ে ফেলে দেয়। দিবু সে বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে পারছে না। ঘুম গভীর হলে চোখ মুখ ভরাট হয়ে যায় লাবণ্য বাড়ে মুখের।

দিবু চোখ তুলে তাকাল তারপর খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে বলল, যা ঝড় ঘরবাড়ি উড়িয়ে নেয়নি এই রক্ষা।

ঝড়ের সঙ্গে জল বল। খালি মাঠ তো ঝড়টা লাগে বেশি।

আমি তো ভাবলাম সব উড়িয়ে নেবে।

নেবে, সময় হলে নেবে। আসল ঝড় তো দেখলি না। তবে দেখতে পাবি। ঝড় জলের আলাদা মজা আছে। বিকেলে বৃষ্টি নামলে ঘরে থাকিস না। এখানে এসে বসবি। সারা প্রান্তর জুড়ে ঝড় জলের ছবি তোর দেখতে ভারি ভালো লাগবে। কেমন ঘন কুয়াশার মতো—মেঘ নিচু দিয়ে ভেসে যায় যেন। আর গুমগুম আওয়াজ। কানে যেন বাদ্য বাজে। মহরমের ঢোল বাজনা শুনেছিস কখনও!

দিবু বলল, না।

মাদল বাজনা।

না।

দ্রিম দ্রিম—বাজছে। বৃষ্টি পড়ছে, আকাশে ঝিল্লি, দাদুরি ডাকছে প্রেমের আর্তি। সে ডাক শুনতে শুনতে শস্য কেন ফলে বুঝতে পারি। প্রকৃতি গর্ভবতী হতে চাইছে!

ললিতদার মধ্যে কেমন একটা স্বপ্ন এই পৃথিবীকে নিয়ে। কথায় কাব্য আছে। একটা খাতা আছে তাকে তোলা। তাতে কাব্য লেখার বাতিক। যা কিছু দূরের, সবই তার কাছে রহস্যময়। রোগা ঢেঙা মানুষ। পেটে আলসার। বিড়ি মুখে সব সময়। খাবি নাকি একটা, খেয়ে দেখ না। দিবু এতদূর যেতে সাহস পায় না। ললিতদা দু-দুবার ক্লাস এইটে ফেল করে পড়া ছেড়েছে। ঝাণ্ডাপার্টি করত, এখন করে কি না সে জানে না। যাত্রা এবং রামায়ণ গান শোনার নেশা। পাঁচ সাত ক্রোশ হেঁটে মাথায় ফেটি বেঁধে যাত্রা শুনতে অহরহ চলে যায়। ভাঙা হারমোনিয়াম রেখেছে তক্তপোশের নিচে। যখন খদ্দের থাকে না, মানুষজন দেখা যায় না, একা থাকে, তখন গলা মেলে গায় হে আনন্দ, আনন্দ হে……!

দিবু বলল, বাড়িতে তাড়া খাচ্ছি।

তাড়া কেন?

একদিন চল কান্দি! রাস্তাঘাট দেখে আসা দরকার।

বলবি ত।

তুমি কাজের মানুষ।

ধুস তোর কাজ। কবে যাবি, আজ! কাল! কখন, বলবি।

বাবাকে বলেছিলাম একাই যাব। রাজি না। তুমি না গেলে ছাড়বে না।

তার উপর বাবা জ্যাঠার এমন আস্থা দেখে ললিতদা ভারি খুশি। বলল, তবে আজই চল। তারপর হুস করে টান দিল বিড়িটায়। নেশায় চমৎকারিত্ব বোঝা যায় কত! চোখ মুখ কেমন ভারি হয়ে আসে। খদ্দের হাজির। চা চাই। একই সঙ্গে তিন কাপ, খদ্দেরকে একটা দিয়ে বাকি দুটো কাপ নিজেদের জন্য। চা খাওয়া হলে বলল, বস। আমি জল নিয়ে আসছি। পাতকুয়োটা বেশি দূর না। দোকানের পাটাতনে বসেই দেখা যায়। কিছুটা ঘেরির পাড়ে পাড়ে ডানদিকে হেঁটে নিচে নেমে যেতে হয়। এখানটায় বসলে যারা জল আনতে যায় তাদের দেখা যায়। কার বাড়ির বৌ ঝি ললিতদার মুখস্থ। দোকানটা আলগা জায়গায়। গাঁয়ের মানুষ খুব জরুরী কাজ না থাকলে এদিকটায় ঘেঁষে না। সে ইচ্ছে করলে এখানে বসে চা বিড়ি সব নির্ভাবনায় খেতে পারে।

আজ জল নিয়ে আসার পর ললিতদা সহসা বলল, মাইরি একটা কাণ্ড হয়ে গেল।

দিবু ললিতদাকে ভালই চেনে। সব কিছুই তার কাছে জগৎ সংসারে একখানা কাণ্ড। ললিতদা জলের বালতিটা পাটাতনের নিচে রেখে বলল, নতুন পাখি এয়েছে।

কথাটা না বুঝতে পেরে দিবু বলল, কি পাখি।

নাম জানি না। দেখলাম। একবার ঘাড় তুলে শর্মাকে দেখল

না পর্যন্ত। না ভাই বেশি আশা করি না। এ পাখি আমার কাছে পোষ মানবে না। হড়কে যাবে। পাখি বড় দুরন্ত।

দিবু এবার খুঁটি থেকে সোজা হয়ে বলল, এতদিন এখানে আছ. পাখি চিনতে পারছ না :

বললাম, না নতুন আমদানি।

এতক্ষণে দিবু ব্যাপারটা বুঝতে পেরে জোরে হেসে উঠল। বলল, এই। খুব ঘাবড়ে গেছ দেখে ?

কী জানি।

আমার মনে হয় ফণির দিদি। সে উর্বশী, হাজির। সার্কাসের মেয়েটা।

যাঃ ওর দিদি সার্কাসের খেলা দেখায় জানতাম না ত।

আরে সব অজানা অচেনা ! কে কোথায় কি করে জানব কি করে ! একেই আমি সার্কাসে সিংহের খেলা খেলতে দেখেছি।

তুমি ঠিক চিনেছ !

কেমন থতমত খেয়ে গেল প্রশ্নটা শুনে। বলল, সুন্দরী মেয়েদের দেখতে কেন জানি একইরকম লাগে। দূর থেকে দেখলে আরও বেশি একরকম। তবে মাইরি বলছি, দেখলে মজে যেতে হয়। আসতে ইচ্ছে করছিল নারে—

আমি ত ছিলাম, না এলেই পারতে !

একটা হাই তুলে, কেমন আড়মোড়া ভেঙে বলল ললিত, বড় টানে। ললিতদা কথা বলছে, কাজ করে যাচ্ছে। উনুনটা ক'বার খুঁচিয়ে দিল। তারপর নিচ থেকে ঝুঁকে কি দেখল। কিছু কয়লা দিয়ে বলল, শালা সব এখন ফেরববাজ। বগলার কয়লা, যত রদ্দি মাল।

বগলাচরণের কয়লার কোন ডিপো নেই। গরুর গাড়িতে স্টেশন থেকে কয়লা আনে, যারা কাঁচা পয়সা হাটকায় তাদের ঘয়ে ঘরে পৌঁছে দেয়। রদ্দি মাল ছাড়া এখানে কিছু চালানো দায় সে ললিতও

জানে। সস্তার মাল না রাখলে বিকোয় না। বগলাকে গাল দিয়ে লাভ নেই।

অনেক দূরে দু-তিনটে গরুর গাড়ি দেখা যাচ্ছে। ললিত তা দেখেই আঁচ খুঁচিয়ে দিল। ঝুড়িতে ডিম আছে। বাসি পাঁউরুটি। আলুর ঝোল কড়াইয়ে। এরা ঘেরির নিচে গাড়ি রেখে ওর দোকানে ঠিক উঠে আসবে। চার পাঁচ ক্রোশ রাস্তা ভেঙে জল তেষ্টা পায়। ললিত এর জন্য দুটো জালা রেখেছে। জল ভরে রাখে। দূরের মানুষের কাছে তার চটানটা জলসত্রের কাজ করে। জল খেলেই অন্য তেষ্টা পায়। কিছু খেতে ইচ্ছে হয়। জলটা রেখেছে রাস্তার মানুষজনকে লোভে ফেলে দেবার জন্য। দোকান চালাতে হলে, মানুষের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করতে হয় সে জানে। —তা ভাই যা রোদ, জল খাও। গাছতলায় গামছা পেতে শোও আরাম পাবে। লোকজন ধরে রাখতে পারলেই কাজ হাসিল। এটা-ওটার দরকার। বিড়ির বাণ্ডিল সাজানো। পান সাজানো। এ সব দেখে রাস্তার মানুষের চোখ লোভে চকচক করে। ট্যাঁকের পয়সা সর্বস্বান্ত করে কেড়ে রাখার এটাও একটা ফন্দি যেন তার।

দিবু বলল, দিদি কি করে জানলে ?

জানব না ! ফণীর বড়দা আসামে রেলে কাজ করে। ফণীরা দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান। ওর দিদকে কেন পাঠিয়ে দিয়েছিল এখন বুঝতে পারছি। একেবারে আগুন !

সে দেখল, সেই মেয়েটা বালতি দিয়ে জল তুলছে। ফ্রক গায়। যাবার সময় দোকানটার পাশ দিয়ে যাবে।

তোমার দোকান পার হয়ে গেল দেখনি।

তুই দেখেছিস !

আমি তো এই এলাম। তুমি তো সেই সকাল থেকে দোকান খুলে বসে আছ।

মেয়েটা মনে হয় ফাঁকা জায়গা দিয়ে যেতে ভয় পায়। বাড়ি ঘরের ভেতর দিয়ে গেছে। টের পাইনি।

দিবু লক্ষ্য রাখছে। কোনদিকে উঠে যায় দেখার ইচ্ছে। ফ্রক গায়ে দেয়া। ফণীর বড় হলেও বেশি বড় না। পিঠাপিঠি হবে। এদিকেই আসছে। দূর থেকেই বুঝতে পারল ললিতদা মিছে কথা বলে নি। একেবারে আপেলের মতো রঙ। চোখ বড় বড়। জলের বালতি নিয়ে হাঁটার সময় কেমন একটা অস্বস্তি। যত কাছে আসছে, তত পা দ্রুত হয়ে উঠছে। কবে এল! ওদের পাড়ায় থাকলে জানতে পারত। পেছনে বৌ মতো কেউ ওর সঙ্গে আসছে। একা না। কাছে আসতেই দিবু ভারি অবাক হয়ে গেল। এমন একটা সুমার মাঠে এ মেয়ের বড় হওয়াও বিপজ্জনক। সে কেমন মেয়েটিকে দেখে কেঁপে উঠল। চুল নীলাভ। সামান্য রোদে মুখ ঝলসে যাচ্ছে। চুলে ক্লিপ আঁটা। শহরে থাকলে যে কমনীয়তা লক্ষ্য করা যায় নারীদের শরীরে, দিবু সেই কমনীয়তা লক্ষ্য করল মেয়েটির মধ্যে।

এই কি হচ্ছে!

দিবু লজ্জায় পড়ে গেল।

কী নেশা ধরিয়ে দিল!

বাঃ কি যে বলছ!

ঠিকই বলছি। তোকে মানায়। তুই দেখ না একবার চেষ্টা করে।

ললিতদা মারব। আসলে মারব নয়, ললিতদাকে তার এ-জন্যই ভাল লাগে। সব ভাল কাজ একমাত্র সেই করতে পারে এমন বিশ্বাস ললিতদার। সে নামী-দামী মানুষ হবে, না হওয়াটাই অস্বাভাবিক ললিতদার কাছে। প্রথম দিন থেকেই বলেছিল, আমাদের দেশ গাঁয়ের নামটা রাখিস। বৃত্তি পাওয়া ছেলে, সোজা কথা। এটা ঠিক সে প্রাইমারি পরীক্ষায় একটা বৃত্তি পেয়েছিল। মেট্রিক পরীক্ষায় কি হবে এখনও জানে না। এ-নিয়ে তার ভেতর একটা অহমিকা

আছে। তার কথাবার্তা যত সহজ সরল হোক ভেতরে সব সময় একটা দম্ভ পুষে রাখে।

ফণীর দিদি একেবারে মুখোমুখী এখন। তাকাবে না ভেবেছিল —বরং সে এখানে ললিতদা ছাড়া দোকানটা ছাড়া আর কিছু বোঝে না—কথাবার্তা ললিতদার সঙ্গে শুরু করে দিয়ে সেটা প্রমাণে সচেষ্ট থাকলেও কখন যে চোখ চলে গেল—আর চোখ যেতেই ধারালো চোখের দৃষ্টিতে সে কেমন থতমত খেয়ে গেল। বুকটা ছাঁত করে উঠল। সে যে দিবু, এই নতুন বসতের সেরা ছেলে ফণীর দিদি কি খবর পেয়ে গেছে! তা না হলে এ-ভাবে দেখল কেন! একেবারে শানে ধার দেয়া চোখ। সারা শরীরে বিদ্যুৎ তরঙ্গ বয়ে গেল দিবুর। সে অন্যমনস্ক হবার সময় শুনল ললিতদা বলছে—কোন বাড়ির দেখতে হবে। তবে আমার ধারণা ভুল হতে পারে না। ফণী বলছিল, ওর দিদি আসামে থাকে। ওর বাবা ভয়ে দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে আসামে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ঘরবাড়ি হয়ে যাওয়ায় নিয়ে এসেছে। আর যে বৌটি গেল, ফণীদের পাশের বাড়ির। এ সব দেখে ললিতের দৃঢ় ধারণা, ফণীর দিদি না হয়ে যায় না।

যাবি নাকি?

কোথায়?

ফণীদের বাড়ি?

কেন যাব। আমি কাউকে চিনি না।

ফণীর বাবা তোকে চেনে।

কী করে জানলে?

বলেছিল।

তুমি মিছে কথা বলছ।

আরে মিছে কথা না। ফণীর বাবার চা দিতে গেছিলাম। খুব দামী চা। চায়ের নেশা খুব। ফের হপ্তায় আনতে হয়।

এটা ঠিক ললিতদাকে সাঁটুইর বাজারে না হয় বেলডাঙ্গার হাটে যেতে হয়। নিজের সওদার সঙ্গে অন্যের ফাই ফরমাস মতো সব কিনে আনে। চা এনে দিতেই পারে।

মধু রায়ের ছেলে এসেছে দেখলাম। ললিত ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে সম্ভার ছেড়ে দিয়ে বলল, বোঝ এবার। নজর পড়েছে রে। তুই এসেই কিনা খবর হয়ে গেলি। বেঁচে থাকলে হয়।

আর ঠিক তখনই হৈ চৈ গণ্ডগোল। বাঁধের উপর দিয়ে লোকজন ছুটে আসছে। কী খবর! কী খবর! তাড়াতাড়ি উনুন থেকে কড়াই নামিয়ে ফেলল ললিত। দিবু লাফ দিয়ে বাঁধের পাড়ে উঠে দেখতে থাকল। বাঁধের ও-পাশ থেকে কিছু লোক গড়িয়ে নিচে নামছে। ললিত ঝাঁপ বন্ধ করে জ্বলা উনুনটা গাছের ছায়ায় রেখে দৌড়োল। এখানে বাড়িঘর করার পর থেকে কত রকমের উৎপাত—সরকারের লোক থেকে হাজিদের গোমস্তা সবাই একরকম। তার উপর আছে বন্যায় জলে ডোবা মানুষ, গোমড়ক, খরায় জরায় সব গ্রাস করে নেয়। কে কখন যায় ঠিক থাকে না। বুকে তরাস লেগেই থাকে। একজন ছুটে যাচ্ছিল বলতে বলতে, হরেনের মেয়েটাকে তুলে নিয়ে গিয়েছে কে!

এ-সব সময় ললিতের কাজ বাড়ে। ললিত, সুখো, ল্যাংড়া গোপাল, ধীরেন, সুবোধ সমবয়সী ছেলে ছোকরা। দায়ে আদায়ে তারাই। হম্বিতম্বি সব ওদের। ওরা বসে থাকে কী করে। মল্লিককে ওরা গিয়ে শাসিয়েও এসেছিল, যা শুনছি, হলে ঠ্যাং ভেঙে দেব। মল্লিকের চুল খাড়া থাকে এমনিতেই। ছেলে ছোকরাদের অপমানে চুল একেবারে সব শজারুর কাঁটা হয়ে গেছিল যেন। চোখ লাল। গাঁজা ভাঙের নেশা থাকলে যা হয়। খড়ম নিয়ে তাড়া করবে ভেবেছিল—কিন্তু ছেলে-ছোকরারা তেরিয়া হয়ে উঠতেই জোঁকের মুখে নুন পড়ার অবস্থা। হলে কী হবে ছটফটানি যায় না। মামলা ঠুকে দেব। ঐ এক জায়গায়, যখন তখন মল্লিক জুজু দেখিয়ে সবাইকে

আতঙ্কিত করে রাখে। কিন্তু ললিত দৌড়ায় আর ভাবে, জেল হাজতের ভয় দেখাও, বামুনের পো। তারপরই থুথু ফেলে। কেমন বামুন কে জানে! ভড়ং বেড়েছে দেশ ছেড়ে। এখানে এসে গলায় পৈতে ঝুলিয়ে অং বং করতে শিখে গেছ! দেব একদিন টিকি নেড়ে।

সে ভিড়টার সামনে যেতেই সবাই বলল, ঐ ত ললিত, ওরে শুনেছিস, দুলি পগার পার।

দিবু পেছনে পেছনে দৌড়চ্ছে, ললিত টেরই পায় নি। সে থামতেই দেখল পাশে দাঁড়িয়ে দিবু। দিবু বলল, দুলি কে?

আরে হরেনের মেয়েটা। একটা আবাল মেয়ে উধাও হয়ে গেল! মেয়েটা যে এখানে আছে টেরই পাওয়া যেত না। সে ফের বিষয়টা পরিষ্কার করে বোঝাবার জন্য দিবুকে বলল, মল্লিক তো তাই বলছে। কারা রাতে ছিল বাড়িতে ত্রিনাথের মেলা বসেছিল। দুই আউল বাউলের কাণ্ড।

ললিত ভিড়টার দিকে তাকিয়ে বলল, কখন গেল!

আর গেল! যাবে কতদূর—হরেন বলেছে, গেলে ভোররাতে গেছে। সে এক ঘরে আউল-বাউল নিয়ে শুয়েছিল। সকালেই দেখে নেই।

হরেনের বৌ কী বলে শোনার আগ্রহ ললিতের নেই। ল্যালা ক্ষেপা। একটা হাত কী রোগে অচল। শুকনো কলার খোলের মতো শরীরে ঝোলে। আর থাকে মল্লিক। ও শালা তো হারমাদ। হরেন নেশা ভাঙে ওস্তাদ। মল্লিকের দোসর—সেও ঠিক বলবে বলে বিশ্বাস হয় না। কোন কূট খেলা মল্লিক চেলেছে কে জানে! দুলি লম্বা রোগা পাতলা আর চোখ দুটো সম্বল। হাড়ে মাস লাগলে রূপবতী হবে এই আশায় ছিল মল্লিক। এখন ঘটনা সব না জেনে কোথায় খোঁজ করবে! কিন্তু ভিড়টার হাতে বল্লম সড়কি। বগলাদা সবার আগে। বড় বেশি হৈ-চৈ করছে। মুণ্ডু নেব। ইজ্জত নেই। বসতের কন্যা তুলে নিয়ে যাবে। মগের মুল্লুক! দেশ গেছে বলে

কী ইজ্জত গেছে। এমন হরেক রকম কথাবার্তা হৈ-চৈ, কে কী বলছে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।

ললিত হুঙ্কার দিয়ে উঠল, থামবে ত।

সবাই কেমন স্তব্ধ হয়ে গেল।

ললিতদা যে এমন হুঙ্কার দিতে পারে দিবুর ধারণায় ছিল না।

আর ঠিক এ-সময়ে সেই দুই আউল-বাউল বাঁধের ও-পার থেকে উঠে আসছে। প্রাতঃকৃত্য সারতে বাঁধের ওদিকটায় গেছিল। মল্লিকের বাড়িতে ত্রিনাথের মেলায় ওরা ছিল বলে চিনতে পেরেছে। চিৎকার করে বলল, ঐ তো ওরা!

সবাই দেখল। তারপর বলল, তালে!

ধর শালা মল্লিককে!

একজন বলল, অদের জিজ্ঞাসাবাদ কর।

আরে দেখছ না দাঁত মাজছে। ওরা জানবে কী করে! বাঁধের ওপারে থাকলে দেখা যায় না। মল্লিক বুঝেছিল, ঐ দিয়েই কাজ হবে। দুই মূর্তিমান এখন এদিকেই ছুটে আসছে।

প্রাতঃকৃত্যে এত সময় লাগবে কেন? এটা একটা কূট প্রশ্ন বটে। সেই সকাল থেকে দুই মূর্তিমান তবে এতক্ষণ বাঁধের ও-পারে কি করছিল! ... লা হয়েছে, তাতে করে খুব সকালে বের হলে ক্রোশখানেক পথ হেঁটে আবার ফিরে আসা যায়। ক্রোশখানেক দূরে হিজলের গভীর জঙ্গল আছে একটা। পর পর ঘেরি আছে বলে বাঁধের উপরে দাঁড়িয়েও দেখা যায় না! নিচু জায়গা। গো-ডাঙ্গায় উঠলে কেবল বনটা দেখা যায়। দিবু ওদিকটায় এখনও যায় নি।

ললিত বলল, তোমরা দাঁড়াও। দেখি। বলে সে দিবুর দিকে তাকাল। যাবি নাকি?

দিবু বলল, চল।

ওরা সেই দুজনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলে, দেখল ওরা থমকে দাঁড়িয়ে আছে। ঘেরিটা বড়, মাইল খানেক লম্বা। মাঝামাঝি

জায়গায় ওরা। ললিতের কী মনে হল, দৌড়াতে থাকল। ভিড়টাকে সঙ্গে আনে নি। উত্তেজনার মাথায় যদি লাঠিপেটা শুরু করে দেয়। রক্তারক্তি বিষয়টা ওর মাথায় আসে না। বিচার-বুদ্ধি তার বড় প্রখর বলে সবাই জানে।

সে বলল, দিবুয়ে পালাবে না ত ?

ডাক না !

ললিত ডাকল, হাই।

ওরা হাত তুলে ইশারায় বলল, আমাদের !

হ্যাঁ তোমাদের চাঁদ। এদিকে এস। পালাবার চেষ্টা করবে না :

ওরা ভাল মানুষের মতো হেঁটে আসতে থাকল।

কাছে এলে ললিত বলল, তুলিকে কোথায় রেখে এলে !

তুলি !

মারব শালা থাপ্পর। গরীব গুরবোর মেয়ে পাচার করার তালে ছিলে। সব মরে গেছে ভেবেছ !

তুই আউল-বাউলের কেমন বিমূঢ় অবস্থ ·

আমরা হিজলে গান গাই দাদা। পাখ-পাখালি দেখি, ভিক্ষা করি। প্রভুর দাস আমরা।

ললিত গোঁয়ার প্রকৃতির মানুষ বলে ধর্ম ভয় থাকবে না সে কী করে হয়। তার ধর্মভয় বরং একটু বেশিই। প্রভুর দাস কথাটাতে তার মনে ধন্দ ধরিয়ে দিয়েছে। বলল, বাঁধের নিচে কী করছিলে !

কিছুই না। প্রকৃতির ঢং পাল্টেছে—নয়নাভিরাম। বলে দু হাত তুলে, মন আমার কি যে বলে ওলো সখী ললিতে। বলে নাচতে শুরু করে দিল।

মরণ ছিল ভিড়ের মধ্যে। সে ছুটে বের হয়ে এল। গাট্টাগোট্টা শরীর। বেঁটে পেশী মজবুত। রোদে জলে চোখ লাল—জবা ফুলের মতো। হাতের রগ ফুলে-ফেঁপে থাকে সব সময়। মেজাজটা তিরিক্ষ। তেরিয়া হয়ে বলল, থাম থাম। প্রভুর দাসগিরি বের

করছি। শালা তোমাদের গাছপেটা করব। বল শিগগির রেখে এলি কোথায়? প্রভুর দাস ফলানো হচ্ছে।

ললিত মরণকে সরিয়ে বলল, কোমর দোলানি থামা। সঙ্গে আয়। তুলিকে না পেলে ছাড়ছি না।

প্রভুর দাস তুজন আজ্ঞা পালনে ওস্তাদ। ভিড়টার আগে আগে হাঁটতে থাকল।

দিবু বলল, মিছেমিছি ওদের ধরে নিয়ে যাচ্ছ।

আরে তুই তো সবে এ-দেশে এলি। এ-দেশের লোকদের তুই কতটা চিনিস। বেটারা কুঁড়ের হদ্দ। অপকম্ম ছাড়া মাথায় কিছু থাকে না। বাঙ্গাল মেয়ে দেখলে ক্ষেপে যায়। তারপরই বলার ইচ্ছে ছিল, এ-দেশের বাবুরা ষাঁড় রাখে। কিন্তু দিবু বুঝতে পারে না ষাঁড় কথাটা কি, তার গুরুত্ব কতখানি এদের সমাজে। বাবুদের জমিজমা, পয়সা, কুঁড়েমি সব মিলে আস্ত একখানা গোলাঘর। তুলিকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত ছাড়া যাচ্ছে না। তুলির শ্যামলা রঙ, ভাসা চোখ, মাংস ল্যাগলে পরী। বেটারা সং সেজে কু-কাজ করতে কতক্ষণ!

দিবু তুলিকে দেখে নি। কানাঘুষা শুনেছে, মল্লিকের দ্বিতীয় পক্ষের বৌ হবে মেয়েটা। মল্লিকের দাপট সে চোখের উপর একদিন দেখছে। পুলিশ দারোগা এলে মল্লিকের বাড়িতে থাকে। প্রভাব আছে লোকটার। দিবুর কেন জানি মনে হল, সজুত করতে হলে, আগে মল্লিককে করা দরকার। এই বেচারাদের ওপর হামলা ওর একেবারেই পছন্দ হচ্ছিল না। দিবু বলল, আপনারা রাতে কোথায় ছিলেন!

মল্লিকের বাড়িতে বাবুমশাই।

কি করছিলেন।

ত্রিনাথ ঠাকুরের মেলা, মেলা হলেই আমরা শিবঠাকুরের পরম-ঠাকুর—ধন্যি রাজার দেশ। তার রাজ্যে গোরা নাচে, আমরা তাহার কেশ।

অদ্ভুত কবিতা করে কথা বলার স্বভাব। ওর মজা লাগছিল। সংসারে কেউ বেপাত্তা হয়ে যায়। কেউ বনে-জঙ্গলে ঘোরে, কেউ একতারা বাজিয়ে গান গায়, কারো চাষ-আবাদ ঈশ্বর লাভ—সে কোন মানুষকেই ছোট ভাবে না। সে বলল, ললিতদা ওদের গায়ে কেউ হাত দিলে খুব খারাপ হবে।

কথাটাতে ললিত চমকে গেল। দিবুকে এত জোর দিয়ে কখনও সে কথা বলতে শোনে নি।

দিবু ফের বলল, ওদের আটকে রাখতে হয় রাখ। তার আগে দরকার খুঁজে দেখা সব জায়গায়। মল্লিক সব করতে পারে।

কথাটা মনে ধরল ললিতের। বাঁধের পাড়ে আরও লোকজন, স্ত্রী-পুরুষ দাঁড়িয়ে। হরেন বসে বসে কপাল চাপড়াচ্ছে। আমার সোনার অঙ্গরে, তুই আমার জাল কেটে কোন্‌খানে উড়াল দিলি রে!

ললিত বলল, হরেন কাকা বাড়ি যাও। পুলিশে খবর দেব। তুমিও রেহাই পাবে না।

ললিত দিবুর দিকে তাকিয়ে বলল, তোর কি মনে হয়?

ঠিক বুঝতে পারছি না।

মল্লিক শুনেছি হাত করার চেষ্টা করত!

কী করে জানলে।

অপকম্ম চাপা থাকে! তুলিকে ফুসলে ফাসলে কব্জা করার তালে আছে।

মল্লিকের বাড়ি গিয়ে দেখল, তিনি সোজা থানায় রওনা হচ্ছেন। বগলে ছাতা একখানা। হাতে কাপড়ের ব্যাগ। সঙ্গে আরও দুই স্যাঙাৎ, নরেন আর শ্রীহরি।

ভিড়টা দেখেই বলল, কার কাজ আমি জানি। কেউ রেহাই পাবে না। আমার নাম মল্লিক। তিন পুরুষ আমার আদালতে বাস। তোমরা বাবারা লোক দুজনকে মারধোর কর না। নিজের হাতে আইন নেবে না।

ললিত বলল, কাকা তুলি এক কাপড়ে গেল।

আমার সর্বস্ব নিয়ে পালিয়েছে। আমি কাউকে ছাড়ব না। সব ফাটকে দেব।

দিবু বলল, দেখছ লোকটার কি হম্বিতম্বি। তারপর বলল, লোকটা মিছে কথা বলছে। তারপরই ভিড়ের মধ্যে বোধহয় মল্লিক দিবুকে দেখতে পেয়ে একেবারে চোখ মুখ অমায়িক করে ফেলল, আরে দিবু বাবাজীবন—এস এস! অরে বাপ্ আমার কি সৌভাগ্য দিবু এয়েছে। অ-হরেন, রাখ বেটা কান্নাকাটি, আমি যখন আছি ভয় কি! থানা পুলিশ আছে, আদালত আছে, দিবুর মতো আমার বাবাজীবন আছে, ও ললিত, লোক তুটাকে ছাড়িস না। আটকে রাখ।

ললিত ফের বলল, আপনার কি নিল? সোনাদানা কিছু!

দিবু বলল, ললিতদা বৃথা সময় নষ্ট করছ। তুলিকে খুঁজতে হলে বের হয়ে পড়া দরকার।

দিবুর বার বার মনে হচ্ছিল, তুলি এই চামার লোকটার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই পালিয়েছে। তুলি ভারি শান্ত স্বভাবের মেয়ে শুনেছে। আসলে তুলি প্রকৃতির মধ্যে বড় হয়ে ওঠা পাখি। উড়তে চায়—পৃথিবীর দারুণ মোহময় সব কিছু তার এখন দরকার। অস্থির প্রাণ। যেমন সে মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে ওঠে এক অজানা রহস্যে। তুলির মধ্যে তার তাড়া শুরু হয়েছে চামার লোকটা একটা বড় অজগর হয়ে তুলিকে গিলতে চাইছিল। শ্বাস-প্রশ্বাসে তুলি টাল সামলাতে পারছিল না। হাঁ করা মুখ আগুনের মশাল ঢুকিয়ে দিলে তুলির প্রাণ জুড়াত। বাবা তুবলা, মা হাবলা, সে প্রাণান্ত পাখি। তার সবদিকে ভয়। সে নির্ঘাত পালিয়েছে। মল্লিকদের বৈঠকখানা ঘরে যখন ত্রিনাথ ঠাকুরের নামে ময়ফেল শুরু হয়েছিল, তখন পাখি টের পেয়েছে শেকল আল্গা। উড়ে গেলো এই সময়। দিবুর আফসোস হচ্ছিল, এখানে আসার পর সে একবারও মেয়েটিকে দেখার আগ্রহ বোধ করেনি।

দিবু বলল, ললিতদা আমার সঙ্গে এস।

ললিত দিবুকে গুরুত্ব দেয়। এতক্ষণ যে লাফালাফি করেছে, যেন দিবুকে দেখানোর জন্য, সে সমাজের সব গণ্ডগোলে আছে। অশুভের বিরুদ্ধে সব সময় তার লড়াই। কিন্তু দিবুর দিকে তাকিয়ে এখন মনে হচ্ছে, এই হামলাতে দিবুর সত্যি সায় নেই।

কী কিছু বলবি?

চল।

কোথায়।

খুঁজে দেখি। তুমি কি বুঝতে পারছ না, ছুলির কেউ নেই।

কেউ নেই মানে, হরেনকা, কাকী সব তার আছে।

ওরা কেউ না। সে একা।

তার মানে।

সে ভেবেছে, মল্লিক তার সর্বনাশ শেষ পর্যন্ত করবেই। মল্লিকের ভাগ্য খুনটুন হয়নি।

কী বলছিস তুই।

ঠিকই বলছি।

ছুলি চোখ তুলে কথা বলতে শেখেনি।

সেটা কবে?

ক্যাম্পে যখন ছিলাম।

এক বছরে মেয়েরা কত পাল্টে যায় জান না। দিবু যেন কত বড় অভিজ্ঞ মানুষ! দিবুর কথায় ললিত হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারল না। নাক টানলে ছেলেটার প্যাটা গড়াবে, সে কি না এত বুঝদার মানুষের মতো কথা বলছে!

সেই মতো তারা আর দাঁড়াল না। ললিত তিনদিকে লোক পাঠাল। একদল গেল চুমড়িগাছার দিকে। একদল খোসবাসপুর গোকর্ণের দিকে। অন্য দল সালারের দিকে। সে আর দিবু ঠিক করল, সেই হিজলের বন ধরে কাঁদির দিকে যাবে। আগ

তিন জায়গায় খবর দরকার। আস্ত একটা মেয়ে লোপাট হয়ে গেল।

দিবু আর ললিত কাঁদির দিকে রওনা হবার আগে সাইকেল চেপে কিছুটা মাঠ, বাঁধ ভেঙে খুঁজে এল। কাছাকাছি জায়গাগুলি বিশেষ করে জলা জায়গা নদীর ধার, বাঁধের আড়াল সব। গুম খুন হতে পারে অথবা আত্মহত্যা করতে পারে মেয়েটা। সব সময় দিবুর বুকে কেমন একটা ত্রাস। যেন দেখে ফেলবে চিতপাত হয়ে জলে ভেসে আছে মেয়ে, অথবা শাড়ির আঁচল পদ্মপাতায় আটকে—ফড়িং উড়ছে পদ্মপাতায়, আঁচলটা পদ্মফুলের কাঁটায় আটকে আছে। পায়ের ছাপও লক্ষ্য করল। নদীর চরায় বালিয়াড়িতে শুধু পাখির পায়ের ছাপ, মানুষের পায়ের ছাপ চোখে পড়ল না। বেলা বাড়ছে, রোদের তাপ বাড়ছে।

এরই মধ্যে জায়গায় জায়গায় খড়ের বন। গ্রীষ্মকাল বলে, হাঁটু সমান গাছ, শুকনো, সেখানে লুকিয়ে থাকতে পারে। ভয় দেখাবার জন্য কিংবা যে মেয়ে বিদ্রোহ করতে চায় তার পক্ষে সবই সম্ভব। ললিত মাঝে মাঝে জোরে ডাকল, তুলি! তুলি! কেউ সাড়া দিল না। ওরা ফিরে এল।

তিন জায়গা থেকে একই খবর, না নেই।

ঘরে ঘরে তুলিকে নিয়ে হা-হুতাশ। এই পর্যন্ত। তুলি ভেগে গেছে। কোথায় যেতে পারে! কিছুই চেনে না। ললিত ক্যাম্পে থাকতে দেখেছে, তুলি কলে জল আনতে কিংবা ক্যাশডোলে যেখানেই জাইন দিক বড় উদাস চোখ দেশভাগ, বাপের বজ্জাতি, মার অসহায় মুখ-চোখ জীবন সম্পর্কে কোথায় কখন কারা যেন একটা বড় ক্ষত সৃষ্টি করে গেছে। সেই মেয়ে নেই—কষ্ট হয়। মল্লিক হরেনকে কব্জা করার পর তুলিকে কখনও আর বাইরে দেখা যায়নি। মল্লিকের বাড়ির বাইরে যাওয়া ছিল তুলির বারণ। কথা বলা বারণ। বিশ্বম্ভর এলে শুধু ঘর থেকে সাক্ষী প্রমাণের জন্য একবার বের করে

দেখিয়েছিল। তখনই দেখেছিল, ছুলির চোখ আপাত ক্লান্তিতে ভরা, ভেতরে অজগরের মতো তীক্ষ্ণ হিংস্র চোখ। যেন মেয়েটার পক্ষে সব কিছুই করা সম্ভব। দিবুকে এমন সব বলার পর ঠিক হল, বাউল দু'জনকে আটক রেখে লাভ নেই। ওদের ছেড়ে দেওয়া হল।

আর তখনই সুখো আসছে ছুটে। চিৎকার করে বলছে, পাওয়া গেছে! চুল···চু···ল।

এই সব পরোপকারী কাজে ললিতের মধ্যে যে আবেগ সঞ্চার হয়েছিল, পাওয়া গেছে খবরে সেটা কেমন নিমেষে উবে গেল।

কোথায় ছিল! চুল মানে!

সুখো হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, কোথায় ছিল!

বললি যে পাওয়া গেছে।

ছুলিকে পাওয়া যায়নি ত! চুল পাওয়া গেছে।

দিবু বলল, কি আজে-আজে বকছ সুখোদা।

আজে-বাজে মানে। স্বচক্ষে দেখে এলাম। গোছা গোছা চুল। দু বেণী কাটা।

কোথায়!

চল না দেখবে।

এই খবরে সবাই আরও অবাক হয়ে যায়। ছোটে: সারা বসত ভেঙে সবাই ছুটছে। সুখো দেখাল। তালগাছের নিচে দুটো বেণী আর গোছা গোছা চুল। একটা কাঁইচি পড়ে আছে। কার চুল, যে এভাবে ছুলিকে কুৎসিত করে দিয়ে হত্যা করতে পারে। খুঁজে আর লাভ নেই এমন মনে হল কারো। পুলিশে খবর দিতে হয়। মল্লিক গিয়েছে ঠিক, কিন্তু মল্লিক পারে না হেন কাজ নেই। ললিত কি এখন করবে—কিছুটা তাকে বিচলিত দেখাচ্ছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল, ফণীর বাবা এসে তার দুই পুত্রকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। দিবুর ছোট কাকা এসে বলল, ললিত এসব পুলিশের কাজ। দিবুর না। দিবু বাড়ি আয়।

ফটকি বোনদি পার্বতীকে বলল, চুল কাটা যখন, ঠিক জিন পরীর কাজ। যা তালগাছ সব, ব্রহ্মদত্যি থাকতেই পারে। পার্বতী সন্ধ্যা হলে বাড়ি থেকে বের হতে সাহস পেল না। পটলকে সঙ্গে নিয়ে ধূপ-ধুনো দিল বাড়িতে। লম্ফ জ্বেলে ভাই-বোন কেমন এক আতঙ্কের মধ্যে বসে থাকল। বাবাটা যে কোথায় গেল! এখনও আসছে না!

আলের উপর দিয়ে, কখনও বাঁধের উপর দিয়ে দু'জন সাইকেল আরোহী যাচ্ছে। সকালবেলা। প্রকৃতি আপন মনে তার লীলা-খেলায় মত্ত। আকাশ মেঘলা। বৃষ্টি হওয়ায় গাছপালার রুক্ষতা একদিনেই কেমন কমে গেছে। ঘাসপাতা গজাচ্ছে। পোকামাকড় উড়ছে। পাখিরা উড়ে যাচ্ছে আকাশে। মাঠে মাঠে চাষ। মানুষের মধ্যে আবার সেই বেঁচে থাকার আবেগ। গরু-মোষ দঙ্গল বেঁধে মাঠে চরছে। কেমন এক সবুজ প্রাণের আভাস সর্বত্র। ধুলো বালি উড়ছে না। পৃথিবীটা বড় শান্ত নিরিবিলি।

ললিত বলল, পোড়াডাঙা দিয়ে ঢুকে যাব। রাস্তা সটকাট হবে।

সাইকেল দুটো এখন পাশাপাশি। একটা সড়ক নতুন ঘেরি থেকে নেমে গেছে। গরুর গাড়ির লিক এড়িয়ে দিবু সাইকেল চালাচ্ছে। মাঝে মাঝে কথা বলার সময় অন্যমনস্ক হলে সাইকেল লাফিয়ে উঠছে। দিবু বুঝতে পারে লিকে সাইকেলের চাকা পড়ে এমনটা হয়। হিজলের বনটা বাঁদিকে। গভীর সবুজ একখণ্ড মেঘের মতো পাশাপাশি ভেসে যাচ্ছে যেন।

দিবু বলল, আজ আবার বৃষ্টি হতে পারে।

হলে ক্ষতি কি। ভিজব। লক্ষ্য রাখছিস তো!

কিছুই তো দেখছি না।

ওরা দু'জনই দু'দিকে লক্ষ্য রেখে যাচ্ছে। কোথাও যদি কিছু চোখে পড়ে। সংশয় হবার মতো কিছু চোখে পড়েনি। চাষ আবাদের মানুষজন দেখলে প্রশ্ন, কোনো মেয়েটেয়ে দেখেছ—এ পথ দিয়ে গেছে।

কেউ কিছু বলতে পারছে না।

ললিত বলল, রথ দেখা কলা বেচা একসঙ্গে। রাতে শুয়ে আছি ফুলিটা উধাও। কোথায় যেতে পারে। কাকা শাসিয়েছে এর মধ্যে থাকতে পারবে না। মল্লিক কাকে কখন কি ভাবে জড়িয়ে দেবে ঠিক নেই। আচ্ছা বল, মন মানে! বুদ্ধিটা তখনই মাথায় গজাল। তুই সঙ্গে থাকলে সাহস পাই। সকালবেলায় হাজির। কাঁদি যাবার রাস্তাটা তোর দেখা দরকার। বলেই হা হা করে হেসে উঠল।

আসলে অভিভাবকদের সতর্কতা এড়িয়ে ওরা দু'জনই ফুলিকে খোঁজার ব্যাপারে গোপন তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। দিবুর এক কথা। ফুলি একাই ভেগেছে। খাঁচার পাখি উড়তে চায়। উড়ে গেছে। যেটা বিপদ ফুলি বালিকা, পৃথিবীর নিয়মকানুন জানে না। মানুষজন মল্লিকের চেয়েও কত নিষ্ঠুর হতে পারে জানে না। বসন্তের কারো সঙ্গে ভেগে গেলে কথা ছিল। সবাই আছে। এমন কী বনমালী পর্যন্ত। কোথাও একা ভেগেছে, কিংবা পালিয়ে আছে। জীবনে তার বড় সংকট দিবু একা আসার সময় অনুভব করেছে, মানুষ একা হয়ে গেলে কত অসহায় বোধ করে। ভয়ে সারা রাস্তায় এত চোখ মুখ শুকনো ছিল, মানুষজনের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারেনি। দু'দিনের জন্য পৃথিবীটা তার কাছে দুর্জনে ভরে গেছিল। পুরুষমানুষের এই হলে, একজন বালিকার পক্ষে কত না বিপদ।

ললিতের অন্য কষ্ট। মেয়েটা দুরন্ত ছিল একদা বোঝা যেত। চোখ-মুখ দেখে সে টের পেত, এ মেয়ে সে-মেয়ে নয়। দেশ ভাগ, দাঙ্গা, ছিন্নমূল হওয়ার কষ্ট মেয়েটার ভিতর লেপ্টে থাকায় আর আগেকার দুরন্ত আবেগ তাকে তাড়িয়ে বেড়াত না। অবিশ্বাস ফুলিকে শান্ত নিরীহ করে রেখেছিল। খোলা আকাশের নিচে একবার ফুলিকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। ওরা হেঁটে সীমান্ত এলাকা পার হচ্ছিল তখন। সব ওরা তখন পান্থজন। ফুলি, পাশেই মানুষের জন্য জলাশয় থাকে ভেবে আগেকার স্বভাব মুহূর্তে ফিরে পেয়ে ছুটছিল—

ঐ তো এসে গেছি। আম গাছ, নারকেল গাছ, মানুষের অন্য ছবি তুলি জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সাঁতার কেটেছিল, রোদে শাড়ি-সায় শুকোতে দিয়ে বাপকে রেঁধেবেড়ে খাইয়েছিল। একটু আগুনের জন্য বলেছিল, দেশলাই আছে দাদা। তারপর ফিক করে হেসে দিয়েছিল। এই হাসিটুকু আর কখনও তুলির মুখে সে দেখেনি। মল্লিক ধীরে ধীরে অজগরের মতো গ্রাস করে মেয়েটাকে একটা ভয়ার্ত হরিণ শাবক করে ফেলেছিল। তুলির সেই দুরন্ত হাসি ললিত এখনও ভুলতে পারে না।

আমরা আসার সময় হিজলের বনটা দেখে ফিরব।

ওর ওখানে পালিয়ে থাকতে ভয় করবে না!

ভয় ঘরে, ভয় বাইরে। মানুষের বসতির চেয়ে বনটা অনেক বেশি নিরাপদ মনে হতে পারে তুলির।

দিবু ভাবল, ললিতদা ঠিকই বলেছে। বনটা দেখে আসা দরকার। আচ্ছা ললিতদা, চুল কাটা কেন! বেণী দুটো কার।

সেই! অবাক বিস্ময়। বুঝতে পারছি না কিছু। আচ্ছা খুনটুন কেন করবে। মল্লিক তো সব দিক সামলে ফুসলাচ্ছিল। জমিজমা লিখে দেবে বলেছিল।

দিবু বলল, ঘরের বার নাকি হতে দিত না। পাড়াতে গেলে হম্বিতম্বি করত। আচ্ছা সবাই মিলে কিছু একটা করা যেত না!

কী করবি। হরেনটা পুলিশে যদি ডাইরি করে। আমার নাবালিকা মেয়েটিকে অপহরণ করেছে। কে চায় ঝুটঝামেলা বাড়ুক। সবার তো এমনিতেই প্রাণ টানাটানি। নতুন জায়গা, কতরকমের ঝড়-জলের আশঙ্কা।

কাঁদি থেকে ফেরার পথে ওরা বনটায় ঢুকে গেল। কাঠঠোকরা পাখি ঠুকঠুক করে গাছ ফোকর করছে। আর কোন সাড়াশব্দ নেই। গাছের ডাল পাতা হাওয়ায় নড়ছে। সাপখোপের উপদ্রব খুব বেশি। সাইকেল নিয়ে বনটার ভেতরে ঢোকা যাবে না। ললিত বলল, খুঁজে

দেখা। পাব না জানি। জোরে কথা বলিস না। সাড়া পেলে সাপটি মেরে থাকতে পারে। যা একখানা মেয়ে!

একটা ছবি ভেসে যায় তখন ললিতের চোখে। জমিজমা, চাষ আবাদ, ছাল ঘর ঝাঁট দিচ্ছে, বিপদনাশিনী ব্রত করছে, জল আনছে। আসন পেতে খেতে দিচ্ছে। মেয়েরা এই চায়। চায় একজন সমবয়সী মানুষ, স্বামী এবং বন্ধুর মতো। ভেতরে ওর কেমন তুলির জন্য টান ধরে যায়।

দিবু বলল, বন-জঙ্গলের একটা আলাদা আকর্ষণ আছে।

কাঠবিড়ালি দৌড়ে বেড়ায়। কাঁটা ঝোপে দিবুর প্যান্ট আটকে গেল একবার। কোথাও খসখস শব্দ, গাছপালার ফাঁকে যদি কোন মানুষের অবয়ব চোখে পড়ে। হঠাৎ দিবু ফিসফিস করে বলল, ঐ দেখ।

কৈ!

দেখছ না!

ওরা হামাগুড়ি দিতে থাকল। কিছুটা গিয়ে হিজলের বড় বড় কাণ্ডের আড়ালে নিজেদের আড়াল করল। কাছে গেলে অবাক এক কাঠকুড়ানি মেয়ে গাছের নিচে শুয়ে আছে। এবং এভাবে তারা আবিষ্কার করল বনের গভীরে কেউ হেঁটে বেড়ায়। দুই সাঁওতাল বালকের দেখা পেল। একটা বড় গো সাপ মেরে বাঁশে ঝুলিয়ে বের হয়ে আসছে বন থেকে। ললিত বলল, এখানে কোনো মেয়েকে দেখেছিস?

ওরা কিছু বলতে পারল না।

বনটা বেশ বড়। মাইলখানেক জুড়ে।

ললিত বলল, হল না।

দিবু বলল, বেলা পড়ে যাচ্ছে। বাড়িতে চিন্তা করতে পারে।

একটা গাছের গুঁড়িতে বসে ওরা চিড়ামুড়ি আর গুড় খেল। ঝোরাই থেকে জল গড়িয়ে নামছে। স্ফটিক জল। খেলে উপকার হয়। বোধ হয় কোন উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে জলটা নেমে আসছে।

ওরা জল খেল। তারপর সামনের ছোট একটা ঢিবির মধ্যে উঠে চারপাশটা দেখার চেষ্টা করল। এই সেই জলার মুখ, বান-বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে কিছুটা জল আটকে থাকে। প্রখর তাপেও শুকায় না। কেমন বেলাভূমির মতো মনে হয় দূর থেকে।

পার্বতী সকাল থেকেই আজ বড় অধীর। কতবার যে আয়নায় মুখ দেখেছে। বাবা সকালে কোদাল কাঁধে মাঠে নেমে গেছে। সঙ্গে বিশা আর বাচ্চাটা। পটল জোরে জোরে পড়ছে—কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল, কোন্ দেশেতে চলতে গেলে দলতে হয় রে দূর্বা কোমল এই সব পড়াশোনার অন্তরালে থাকে এক কাব্য মহিমা, অজস্র নক্ষত্র এবং গাছপালা মিশে সবুজ এক পৃথিবী। পার্বতী টের পায় দিবুদা এসে যাওয়ায় জায়গাটার মহিমা আরও তার কাছে বেড়ে গেছে। সুমার মাঠ, হিজলের ঘেরি, ইতস্তত তালের বন, এবং দূরে একটা ছবির মতো আবছা ইস্টিশন, বড় অশ্বত্থ গাছ, সব যেন তার সঙ্গে এখন কথা কয়। সে সকাল থেকে কেমন ভাইটার উপর বড় বেশি প্রসন্ন। মাঝে মাঝে ঘরে ঢুকে বাক্সের ডালা খুলে উবু হয়ে দেখছে। কেউ জানে না, সে কি লুকিয়ে রেখেছে! তার কাছে কত অমূল্য সম্পদ আছে পটল যদি টের পায় তবে ভারি হামলা চালাবে। বাপও কতক্ষণে এখন তার বাবা জাম থেকে ফিরবে এই আশায় আছে। বেলডাঙা হাটে যাবার কথা। বাজার হাট করবে। বিপদনাশিনী ব্রতের তেল সুপারি পান সিঁদুর বাতাসা আনতে যাবে হাটে।

তার কাজ শেষ হচ্ছে না।

এই তো গেল জল আনতে। এই তো ঘর ঝাঁট দিয়ে এল। পটলকে খেতে দিল। উনুনে কাঠ গুঁজে দিল। বাঁধের ধারে সাইকেলের ঘন্টির শব্দ শুনে ছুটে গেল। আড়াল থেকে দেখল দিবুদা লালডদা কোথায় যেন যাচ্ছে! খচ করে উঠল ভেতরটা। কেউ

যেন কাঁটা ফুটিয়ে দিয়েছে কলজের মধ্যে। ছুলিকে খুঁজছে। গেল-কাল দিনমান খোঁজা। রাতেও কোন খবর পাওয়া যায়নি। কাটা চুলের রহস্যটা এখনও কাবু করে রেখেছে তাকে।

সে ফিরে এসে বলল, পটল, দিবুদা কোথায় গেল রে!

জানি না দিদি।

দিবুদার সব খবর পটল দেয়। কাল কোথায় গেছে খুঁজতে তাও পটল দিয়েছে। যেখানেই যাক দুপুরে বাড়ি ফিরবে। বিকেলে সে যাবে। সই দেখে বলবে ওমা পার্বতী শাড়ি পরে তোকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে রে। লজ্জায় নাক মুখ ঘামতে থাকবে। কিন্তু দিবুদা যদি বাড়ি না ফেরে।

এই পটল যা না।

কোথায়।

সইয়ের কাছে।

কেন?

দিবুদা কোথায় গেল জেনে আয় না।

পটল এক লাফে পড়া থেকে উঠে পড়ল। পুঁ-পুঁ সে ট্রেন চালায়। কী যে সুসময় তার, তার গাড়ি আর সে-চাকার মতো গাড়িটা বারান্দা থেকে বের করে গড়িয়ে দিল। তার আটকানো কাঠিটা লাগিয়ে সে দৌড়ায় আর পুঁ-পুঁ-তার গাড়ি যাচ্ছে, সাবধান, কেউ যেন সামনে না পড়ে যায়—নির্ঘাত অ্যাকসিডেন্ট। সে তখন শুনতে পায় দিদি ডাকছে, এই শোন, পটল শোন।

সে পেছনে তাকাল।

আয় না।

কী।

শোনই না।

কাছে গেলে দেখল, দিদি ভারি লজ্জায় পড়ে গেছে। কিছু বলছে না।

কী রে !

বলিস না কিন্তু !   তুই তো একটা হাবা ।

পটল দিদির কথা ঠিকমতো বুঝতে পারে না ।

পার্বতী ভাইকে জড়িয়ে ধরে কি বলল !

পটলের সুড়সুড়ি লাগছে । সে হাসছিল । মুখটা সরিয়ে নিচ্ছিল।

পার্বতী ভাইয়ের মাথায় এক আশ্চর্য ঘ্রাণ পায় । সে মাথা তুলতে পারে না ।

পটল জোরজার করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল । তারপর ফের বাঁশের বাতা দিয়ে তৈরি চাকাটা সামনে ঠেলে দিয়ে বলল, আচ্ছা, বলব না ।

লক্ষ্মী দাদা আমার ।

পটল বুঝতে পারে না, দিদিটা মাঝে মাঝে তার এমন হয়ে যায় কেন । সে বাঁধের পাড়ে পাড়ে যাচ্ছে. বাঁদিকে সব বাড়িঘর নিচে ঘেরি—চাষ-আবাদের জন্য বসত থেকে সব মানুষজন নিচে নেমে পড়ছে । পাড়ে দাঁড়িয়ে তার বাবা, বিশা হরিণা কতদূর একবার দেখার চেষ্টা করল । পেয়েও গেল । বাবা কোদালের মাথায় ভর দিয়ে আকাশ দেখছে ।

দিদির কথা মনে পড়ল তার । দিদি তাকে দিবুদার খবর নিতে পাঠিয়েছে—উষাদি যেন না জানে ।

সে বলেছিল, জানলে কী হবে ?

দিদি তার বলেছিল তবে আমি মরে যাব ।

তার দিদি, তার বাবা, বিশা হরিণা এই বাঁধ আর কঙ্কণ সব যেন বড় ভালবাসার জগৎ । গাছপালা পাখি পর্যন্ত । এমন কি এই চাকা-গাড়িটাও । তাকে সব কিছুই আকর্ষণ করে । এই পথে দিবুদার সাইকেল, ললিতদার চায়ের দোকান কিংবা দূরের তালগাছে ছায়া—সে কিছুতেই তাড়াতাড়ি ফিরতে পারে না । দিদিটা কেন যে তার এমন ভীতু ! কেবল বলবে, দেখে শুনে যাস । তাড়াতাড়ি ফিরিস ।

একা আমার ভয় করে পটল। সে জানে, দিবুদা সাইকেলে কোথায় গেল খবরটা না পাওয়া পর্যন্ত বার বার বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াবে দিদি। পটল কী করে বোঝাবে, একবার বের হলে সহজে তার ফিরতে ইচ্ছে হয় না। সে হয়তো ঐই গাড়ি নিয়ে কঙ্কণকে নিয়ে সুমার মাঠে নেমে যেতে পারে। একবার নেমে গেলে সব ভুলে যায় বাড়িঘরের কথা মনে থাকে না। দিদি প্রায়ই বলে, আমি মরে যাব দেখিস—এসব কথা তার একেবারেই মনে থাকে না। সে কিছুটা আসতেই দেখল, দূর থেকে কারা আসছে—মড়া নিয়ে যাচ্ছে, সাঁটুইর শ্মশানে। হঠাৎ চমকে যাবার মতো সে থমকে দাঁড়াল। হরিবোল ধ্বনি শুনে সব মানুষই সতর্ক হয়ে যায় সে বোঝে। এই বাঁধের উপর দিয়ে দূর দূর দেশ থেকে গঙ্গা পাইয়ে দেবার জন্য তারা আসে। কত দেখেছে—তবু কেন যে চমকে গেল। বড় বড় চোখে তাকাল—তারপর সেই কাটাবেণী ব্রহ্মদত্যি সব মিলে এক ভুতুড়ে ভয়ে সে ছুট লাগাল।

কঙ্কণদের বাড়ি এসে ঢুকে বলল, একটা মড়া উঠে আসছে কঙ্কণ।

তারপর সেই মড়া দেখার আকর্ষণে কঙ্কণ, পটল এবং সঙ্গে জড়ো হয়ে যায় সব সমবয়সীরা, ওরা বাঁধের উপর দিয়ে দৌড়াতে থাকে। তারপর জলাশয় পেয়ে হুপ-হাপ ঝাঁপিয়ে পড়ে। ডুব দেয়। কাদা ঘাঁটে। মাছ খুঁজে বেড়ায়। কিংবা আরও দূরে সেই হরিণা, সে লাফাচ্ছে। পটল সেখানেও দৌড়ে যায়। বেলা বাড়ে। ফিরে দেখে দিদি তার পথ চেয়ে বসে আছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই খচ করে কামড, ভিজে প্যান্ট—তার বলাই হয় নি। কিন্তু পটল সহজেই মিছে কথা বলতে পারে দিদিকে—সে বলে, দিবুদা চলে এয়েছে দিদি। বাড়িতেই আছে বেশিদূর যায় নি।

পার্বতী বলল, কখন ফিরল!

ঐ তো ফিরল।

কোথায় গেছিল!

তা জানি না।

ছুলিকে পাওয়া যায় নি!

না। ছুলিদিদি পালিয়ে গেছে। জঙ্গলে থাকবে বলেছে!

জঙ্গলে মানুষ থাকে!

কী জানি!

আসলে পার্বতী ছুলির জন্য ভাবে না। তার কষ্ট হয় একটা মেয়ে বসত থেকে উধাও হয়ে গেল ভেবে—কিন্তু যেভাবে দিবুদারা খোঁজাখুঁজি করছে, তাতে তার সংশয় জাগে ছুলি দিবুদার মাথা না ঘুরিয়ে দেয়। তখন ছুলিকে কেন জানি মনে হয় ডাইনী। সংসারে যাদের থেকে তার অমঙ্গলের আশঙ্কা তাদেরকেই সে ভারি অপছন্দ করে। দিবুদার এটা বাড়াবাড়ি মনে হয়েছে তার। দিন-রাত খোঁজাখুঁজি কিসের আকর্ষণে। তারপরই কেমন একটা পাপবোধ কাজ করে মনে। মানুষের জন্য খারাপ কামনা করতে নেই। ভগবান রাগ করে। তারও একদিন এমন হতে পারে। পটলকে হয়তো আর খুঁজেই পাওয়া গেল না। সে বলল, না ঠাকুর ছুলিকে তুমি বের করে দাও। এইসব ভাবতে ভাবতে স্নান করে এল। কপিল ফিরে এলে খেতে দিল। হাটে যাবে বলে ব্যাগ গুছিয়ে দিল। বাবা বের হয়ে যাবার সময় বলল, আজই সবাইকে বলে আসবি। এই একটা অজুহাত উপলক্ষ করে সে আজ আবার দিবুদার বাড়িতে যেতে পারবে। সে শুনেছে, দিবুদা ফণীর দিদির খোঁজখবর নিয়েছে। মনে মনে সে কেমন কষ্ট পায়। ফণীর দিদি জুতো মোজা পরে। কানে গোল সোনার ইয়াররিং। বেণী বাঁধে নীল রঙের ফিতায়। নখে লাল নেলপালিশ। আর সব সময় কি এক সুঘ্রাণ শরীরে। এই থেকেও একটা আশঙ্কা তার—দিবুদার মাথা না আবার ঘুরে যায়। সে যে কী করে!

পার্বতী পটলকে বলল, খেয়ে ঘুমাবি। রোদে বের হোস ত মার খাবি।

পটল খেলে, ঘুমালে তার ছুটি। সে এই ফাঁকে আলতা পরবে। পাউডার মাখবে মুখে। হাতে তার কাচের চুড়ি। মার শাড়ি সায়া ব্লাউজ খুলে মনের মতো করে সাজবে। বনমালীদা তাকে সব এনে দিয়েছে। মানুষটার সঙ্গে ভাল করে কথা বললেই কী খুশী। তবে সে বলে দিয়েছে, না ডাকলে তুমি আমার বাড়ি কখনও আসবে না। কাকা পুলিশে কাজ করে। সব দিকে তার নজর থাকে। গোয়েন্দা-গিরি তার স্বভাব। বনমালীদা পুলিশকে বড় ভয় পায়। তার আলতা, পাউডার বড় সংগোপনে রাখা। পটলের হাটকানোর বড় স্বভাব। দেখলেই আঁৎকে উঠবে। অমা দিদরে, আলতার শিশি। বানান করে নামটাও জোরে পড়তে পারে, কেশসুন্দরী তরল আলতা। বশীকরণ আছে আলতার দ্রব্যগুণে। রাঙা পায়ে সে হেঁটে যেতে চায়।

পার্বতী খুব সন্তর্পণে বাক্সের ডালা খোলে। আলতার শিশি বের করে। পাউডারের কৌটা ফ্রকের তলায় লুকিয়ে নেয়। তারপর তাকায়। পটল শুয়ে আছে। একটা বেড়াল ম্যাউ ম্যাউ করে তাকে মুখ দেখিয়ে গেল! ঘরের পেছনে সে বস্তা পেতে বসে পড়ে। ধোয়া পা নরম ঝকঝকে ধীরে ধীরে আলতার রঙে সে কেমন অধীর হতে থাকে। পা-দুখান দেখতে কী সুন্দর। দাঁড়িয়ে দেখল। সামনে থেকে পেছন থেকে দেখল। রুপোর মল পরলে সে লক্ষ্মী প্রতিমার মতো—দিবুদা দেখলে চোখ ফেরাতে পারবে না। মার শাড়ি সায়াব্লাউজ পরে কিছুক্ষণ কেমন থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। শরীর কেমন অবশ লাগছে। আয়নায় নিজেকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করতে পেরে বলল, ধুস পোড়ামুখী, তোর লজ্জা করে না। সে আয়নায় জিভ বের করে নিজেকে ভেংচাল।

পার্বতী কিছুতেই শাড়িটা সামলাতে পারছে না। হাঁটার সময় কেমন জবুথবু হয়ে যাচ্ছে। সে কাউকে রাস্তায় দেখলেই ঘরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ছে। রোদ এখনও প্রখর। কিন্তু তার তর

সইছিল না। সে সইকে ডেকে বলবে, বাবা পাঠিয়েছে। কাল ব্রত-কথা। তুমি যেও দিবুদার জন্য প্রসাদী বাতাসা দেবে আলগা করে। কত আশা তার। দিবুদা তাকালে সে দাঁড়াতেই পারবে না। মানুষের মুহ্যমান অবস্থা হলে যা হয়, পার্বতী যাচ্ছে আর ভাবছে—ভাল করে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। সে কোন রকমে ছুটে দিবুদের বাড়ি ঢুকে বড় আস্তে ডাকল, সই।

ফিসফিস করে জানালায় কেউ কথা বলছে—ঊষা লাফিয়ে মেঝে থেকে উঠে জানালায় দাঁড়াল—ওমা তুই। চেনাই যায় না। ও কাকিমা, দেখ এসে।

সঙ্গে সঙ্গে পার্বতী টুপ করে কোথায় ডুবে গেল।

ঊষা ফের তাকিয়ে দেখল, জানালায় কেউ নেই। কোথায় গেল।

কে রে ?

পার্বতী।

কোথায় !

এই তো ছিল।

ঊষা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে জানালার পাশে ছুটে গেল। দেখল পার্বতী উবু হয়ে বসে আছে।

পেছন থেকে ঊষা পার্বতীকে জাপটে ধরল। ভারি নরম কবুতরের মতো উষ্ণ প্রাণ কেমন ধুক-পুক করছে।

ধায়।

পার্বতীর আঁচল পড়ে গেছিল। তাড়াতাড়ি আঁচল তুলে শরীর ঢেকে নিল।

সোনাকাকিমা বলল, কিরে তুই আর আসিস না কেন ?

পার্বতী কথা বলল না। মাটির দিকে তাকিয়ে থাকল। দিবুর মা গলা পেয়ে বের হয়ে এল। কে এলরে ?

পার্বতী।

করুণা পার্বতীকে দেখে বলল, কপিল ঠাকুরপোকে বলব এবার তোর বর খুঁজতে।

পার্বতী উষাকে ছাড়িয়ে কেমন ছুটে পালাল ঘরের মধ্যে।

কপিল ঠাকুরপোর মেয়েটা আগে এ-বাড়িতেই ফাঁক পেলে চলে আসত। উষা কঙ্কণ শেফালীর সঙ্গে পলান্তি খেলত, গান গাইত, মেয়েটা এখন আসে না। এলেও আগের মতো আর দুরন্ত নেই। বড় সতর্ক চলাফেরা। কি যেন হয়েছে পার্বতীর। করুণা এমন যখন ভাবছিল, তখনই পার্বতী বলল, মেজ কাকিমা, কাল বাড়িতে বিপদনাশিনী ব্রত। বাবা সবাইকে যেতে বলেছে। কথাগুলি বলার সময় সে এদিক-ওদিক কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

উষা সব বুঝতে পারে। পার্বতী আর আসে না কেন, ছুটে বেড়ায় না কেন, তাও বুঝতে পারে। সে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, নেই গো নেই। যাকে তুমি খুঁজছ, তিনি উড়ে গেছেন।

এই যা মারব। বলেই এক দৌড়।

উষা ছুটে এসে লোটানো আঁচল চেপে ধরে বলল, মন কেমন করে, না?

এ-কথায় সে উষাকে ঠেলা মেরে সরিয়ে দিল। বলল, এমন করলে আর আসব না সই!

আসবে না! দেখি না এসে কেমন পারিস! তুই কি আমার টানে আসিস!

তবে কার টানে!

কেন জানিস না কার টানে! বলে দিতে হবে।

পার্বতী গম্ভীর হয়ে যায়।

রাগ করলি সই!

পার্বতী বলল, সবাইকে বলে গেলাম, যেও কিন্তু। বলেই আবার ছুটতে চাইল।

যাস না সই।

পার্বতী যাবে কী করে! সে তো যেতেই চায় না। এখনও দেখা হল না, তাকে দেখতে পেল না তবু মনের মধ্যে কী যে থাকে—যেন সত্যি ধরা পড়ে যাবে। সই তাকে নিয়ে মাঝে মাঝে ঠাট্টা তামাশা করে, ওর মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। কিছুতেই উদাসীন থাকতে পারে না। সে-জন্য সে এ-বাড়িতে আসাও কমিয়ে দিয়েছে। তার আচরণে মানুষটার প্রতি টানের কথা কিছুতেই গোপন থাকে না। সে ভাবে মরে গেলেও আর এ-বাড়িতে আসছে না। কতবার এমন ভেবেছে, পরে নিজেই একটা কাজের উপলক্ষ করে চলে আসে। অথচ মানুষটা আসার আগে তাকে কখনও এ-সব ভাবতে হত না।

উষা তাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে তক্তপোশে জোরজার করে বসিয়ে দিল। নিজে বসল পাশে। পাকা গিন্নির মতো উষা কথা শুরু করে দিল। ঢুলির কথা উঠল। ঢুলি ভেগেছে। ঢুলিকে খুঁজতে গেছে দিবুদা। উষা জানে সব। বাড়িতে বাবাকে বলে গেছে ললিতদা, দিবুদাকে নিয়ে কাঁদি গেছে। ও-সব মিছে কথা। আসলে ওরা গেছে ঢুলির খোঁজে।

পার্বতী বলল, ঢুলিকে চেনে?

কে চেনে?

পার্বতী ঢোক গিলল। বলতে পারল না, দিবুদা চেনে? সে চুপ করে থাকল।

কী বুঝে উষা বলল, ওরা আবার চিনে না। সব দেখে। দাদাটা কী পাজি! বলে কি না, ফণীর দিদি সার্কাসে রিঙের খেলা দেখাত। ললিতদা এমন বলেছে। উর্বশী। তারপর উষা কি ভেবে কেম বলল, রোগাপটকা মেয়েটার তেজ দেখ! ভেগে গেলে কলঙ্ক হয় না।

কার সঙ্গে ভাগল!

কত লোক থাকে। ক্যাম্পে তুই তো ছিলি! আমরা ছিলাম। মল্লিক জ্যাঠা বিয়ে করবে বলেছিল, সব মিছে কথা। বানানো কথা। জ্যাঠা তো এয়েছিল কাল: বলল, হরেনটাকে এবার

তাড়াব। আমার নামে কুৎসা, আমার দু কাল গেছে রায়মশাই, এক-কাল আছে আমি কী না দুগ্ধপোষ্য বালিকাকে বড় করছি, আমার মনে আলাদা ভাব আছে। সমাজ সংসারে থাকি না। ভগবানকে ভয় নেই!

জ্যাঠা কী বলল!

কী বলবে! বলল, ও-সব হয়। এ-নিয়ে ভাববেন না। আমাদের কানেও উঠেছিল কথাটা। কে বিশ্বাস করে বলেন! সংসার বড় অসার মল্লিকমশাই। বৃথা আস্ফালনে হাতি ঘোড়া জলে—আপনি এমন কাজ কখনও করতে পারেন না সে আমরা জানি!

মিছে কথা সব!

হ্যাঁরে মিছে কথা। বলে উষা পার্বতীর শাড়ির আঁচলে জরির কাজ দেখতে দেখতে সহসা ভয় পাওয়ার মতো বলল, তুলি পেকে গেছিল। স্বভাব ভাল না। বাড়িতে উঠতি যুবারা থাকতে পারত না। মল্লিক জ্যাঠার ছেলেরা নালিশ দিয়েছিল।

ছিঃ ছিঃ! পার্বতীর মুখ কেমন কুঁচকে গেল।

উষা বলল, দাদাটা যে কি! ললিতদাকে নিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কি হয় দ্যাখ!

পার্বতীর মনে হল তুলি তবে সত্যি সব পারে। ওর বুক কাঁপছিল। দিবুদা ফিরে আসেনি। পটল মিছে কথা বলেছে। বাবা পটলকেই বেশি ভালবাসে। সংসারে বিশার যে মর্যাদা আছে তার তাও নেই। একটা আলতার শিশি পর্যন্ত কিনে দেয় না। সে বড় হয়েছে একটা শাড়ি পর্যন্ত কিনে দেয় না। দিবুদা না থাকায় তার কাছে সব কিছু অর্থহীন—তার উপর সেই খারাপ মেয়েটাকে পাগলের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে।

উষা বলল, মল্লিক জ্যাঠা তো বলল ছেলে-ছোকরাদেরই কাজ। কোথাও নিয়ে লুকিয়ে রেখেছে। ফুর্তিফার্তা করবে। দেশ ছাড়লে মানুষের নাকি সব যায়।

সব শুনে পার্বতীর বড় বিপর্যস্ত অবস্থা। সে কিছু বলতে পারছে না। কেমন অসহায় বোধে পীড়িত হতে থাকল। দিবুদাকে তবে কেউ টানে। সামনে পেলে যেন খামচে ধরত, তুমি কেন গেলে! তোমার কি এত আকর্ষণ! কারো মাথা ব্যথা নেই-তুমি হন্যে হয়ে ঘুরছ! মনে তোমার কি আছে। গোপনে এভাবে কাউকে ভালবাসা যায় সে আগে জানত না। কেন যে সে মরতে গেল। সই আরও সব কত কথা বলেছে কোনোটা কানে গেছে কোনোটা যায়নি। পাথরের মতো পার্বতী বসে ছিল।

তবু মনের কোণে ক্ষীণ আশা দিবুদা ফিরে আসবে সে দেখতে পাবে তাকে।

বাড়িতে সে আর সই। সবাই এখন বাঁধের পাড়ে। সুমার মাঠের দিকে চেয়ে আছে। কোন সকালে গেছে ফেরার নাম নেই।

পার্বতী উঠে পড়ল। বাড়ি ফিরে দেখল পটল রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। দিদিকে সে প্রথমে চিনতেই পারেনি। কাছে এসে বলল, ও মা তুই দিদি! কোথায় গেছিলরে!

পার্বতী শুধু বলল, মরতে গেছিলাম।

তোর পায়ে আলতা দিদি।

মারব এক থাপ্পড়! একদম কোন কথা বলবে না!

মায়ের শাড়ি তুই পরেছিস!

পরবই তো। মিথ্যুক পাজি। সহসা পার্বতী কেমন পাগলের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। পটলকে সাপটে ধরে ঝাঁকাতে থাকল। চুল টেনে বলল, আর মিছে কথা বলবি, বল, বলবি। ছাড়ছি না।

পটল হতবাক। দিদিটার কী হয়েছে বুঝতে পারছে না। দিদির আচরণে সে রুষ্ট হয়ে বলল, আমাকে মারছিস দিদি! বাবা আসুক সব বলে দেব। মায়ের শাড়ি পরেছিস কেন? সব বলে দেব। ছাড় ছাড় বলছি।

পার্বতী ভয়ে সত্যি ছেড়ে দিল পটলকে। বাবার ভারি চণ্ড রাগ সে জানে। তার গোপন অভিসার দিনের আলোর মতো ধরা পড়ে গেছে। সে এত অসহায় আর কখনও বোধ করেনি। রাগে দুঃখে অভিমানে ঘরে ছুটে এসে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। বুক থেকে হাহাকার কান্না ঠেলে বের হয়ে এল। পার্বতী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

প্রকৃতির কূট কামড় বড় প্রখর। যে যার কামড়ে ছোটে। চিন্তাহরণ থানায় না গিয়েই বলেছে, দিয়ে এলাম এজাহার। শালাদের সব কটাকে এবার ধরবে। আসলে সে চায় সবাইকে সন্ত্রাসের মধ্যে রাখতে। কার নামে এজাহার, কে বাদী কে বিবাদী কিছুই বলে না। দুলি ফিরে এলে আর রক্ষা থাকবে না। সব ফাঁস হয়ে যাবে। যে নারী আত্মঘাতিনী হতে চায় তার পক্ষে সব সম্ভব। শরীরে কত রকমের পোকামাকড় থাকে। একটা মেরে ফেললে আর একটা উঠে আসে। গাছের ডালপালার মতো কেবল গজায়। হরেন আর তার বৌ—তা ভালই. কাল হল দুলি। চোখ ভাসা ভাসা, ছুটে বেড়ায়. খেলে বেড়ায় স্নানের জল রাখে, গামছা কাপড় এগিয়ে দেয়, তামুক সাজায়, সবই যখন করে বাকিটুকু করলেই নতুন জীবন। ডিমে তা দেবার মতো বড় করে তুলেছিল, সব যখন জেনে গেছে, একটা বাক্য খসালে কেমন হয়। বাক্য খসাতেই হরেন পুণ্য ভেবে নিল নিজের। সঙ্গে আজীবন তার খোরপোষ। বৌ-এর খোরপোষ। পুরুষ-মানুষের আবার বয়েস কি! দুলির ভাগ্য প্রসন্ন না হলে এমন লায়েক মানুষ, মিলে যায় কি করে! শিবঠাকুরের শামিল। পুরাণে কত লেখা আছে এমন। তা ঠাকুর গাঁজা ভাঙ খান, নেশা করেন, দিগম্বর তিনি শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়ান—দুলিকে হরেন এমন সব কত পুরাণ কথা শুনিয়ে চাঙ্গা করতে চেয়েছে। পারে নি। কাল হল ত্রিনাথের মেলা। সবাই নেশা ভাঙ করে বেশ নামের মাহাত্ম্যে

যখন ডুবো ডুবো, মল্লিক উঠে গেছিল, পাতে মাছ পড়ে কিনা দেখতে। প্রথমে আদর-সোহাগ, পরে সুড়সুড়ি-সবই ভেস্তে গেল। বালিকা নারী হয়ে গেলে, পুরুষমানুষের মগজে কেবল হুল ফোটায়। মল্লিকেরও তাই হয়েছে—দোষের না। কিন্তু কী যে হল, একখানা নতুন গামছা টেনে ছুলি চিৎকার করে বলেছিল তুমি আমারে খারাপ করতে চাও ঠাকুর-এই দেখ, বলে সে গামছাখানা মুখের উপর ছুলিয়ে কড়ি বরগার দিকে তাকাতেই আর বাহ্যজ্ঞান ছিল না।

ভোর সময় দেখেছে, ছুলি নিঃসাড়। ঘরে একা ছুলি—ওর বাপ আসরে, মা পাগলা ক্ষেপা, কথা বলতে পারে না, আলাদা ঘরে থাকে – সব নিপুণভাবেই সে সেরেছিল—কিন্তু সকাল না হতেই উধাও। পুলিশে না গিয়ে উধাও হয়ে গেছে বিষয়টা ভালই, বাগে আনা গেল না – এই আফসোস যতই থাকুক, মানইজ্জত বেশি তাড়া করে। সকাল-বেলার হম্বিতম্বি, যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর। কিসের অভাব তোর। খেতে পেতিস, শুতে গেলে দোষ। যা জাহান্নামে যা। মরগে। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব থাকে কবে।

লোকজন এলে সে সাধুসজ্জন সেজে গেছে। থানার নাম করে ইস্টিশন পর্যন্ত ঘুরে এসেছে। ফেরার পথে বাড়ি বাড়ি বলে এসেছে, ছুলির স্বভাব ভাল না। ইজ্জত নিয়ে টানাটানি। ঘরের বার হতে পর্যন্ত দিত না। তবে বুঝলেন না, গাই বাছুরে বোঝাপড়া থাকলে থানার দারোগাবাবুর ক্ষেতে সরষের চাষ। শুধু হলুদ ফুল দেখবে।

শোষণ থাকে রক্তে। যতই তুমি নীতিকথা বল না, পয়সা হাতে এলে কার মাথা ঠিক থাকে! দূষণ এরেই কয়। ললিত নাকি পার্টি করে। দিবুটাকেও দলে টানছে। উপেন রায়কে সতর্ক করে দিতে হবে। সে তা করেও এসেছে। মেলামেশা ভাল। তবে দেখতে হয় এতে করে না মাথা বিগড়ে যায়। ললিতের খ্যামটা নাচ ঝাণ্ডা হাতে একদিন সে বের করে দেবে। শুধু সুযোগ এবং সময়ের অপেক্ষা।

আর তখন দিবু সেই পাথরের উপর দেখল এক অতিকায় রহস্যের ফণীমনসার গাছ। কেউ সকালের দিকে উপড়ে ফেলে রেখে গেছে। দূর থেকে প্রখর রোদে মনে হয়েছিল, তুলির মতো এক ছন্নছাড়া নারী শুয়ে আছে একা। কাছে যেতেই মনে হল, সে তুলি না একটা ফণী-মনসার গাছ। চারপাশে নুড়ি পাথর বালি, ফণীমনসার জঙ্গল, দূরে রেল লাইন। পাথরের উপর দাঁড়িয়ে দেখল, একটা চটানের মতো জায়গায় চালা ঘরে মানুষজন! এমন সময় মাঠে লোকজন দেখে সংশয় জাগে। দু'জনের কাছে সাইকেল! রাস্তা নেই বলে টেনে নিয়ে যাওয়া। যেখানে যেটুকু চড়ার মতো সাইকেল চড়ছে। না থাকলে কাঁধে তুলে নিয়ে জঙ্গল পার হচ্ছে। ললিতদার এক কথা, দিনকে দিন আগাছার প্রকোপ বাড়ছে। সাফসোফ করা দরকার। তুলিকে খুঁজে পেলে তাকে দিয়েই শুরু।

এসব দিবু ঠিক বোঝে না। সার্কাসের এক বালিকাকে দেখার পর যে নিত্যদিন গাছের নিচে বসে থাকত আর একবার দেখবে বলে, সেই এখন আগাছা সাফ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। ললিতদাকে তার ভাল লাগে। তার কথা শুনতে ভাল লাগে। সে শুধু শুনে যায়।

চালাঘরটা একটি ঘেরির মাথায়। ধোঁয়া উঠছে। মানুষজন উবু হয়ে বসে আছে। ওদের দিকটা নিচু এলাকা বলে, এবং ঝোপ জঙ্গল আছে বলে, আড়ালে আড়ালে যেতে পারছে। ঘেরির পাড়ে উঠে যেতেই ললিত বুঝল, এরা সব ঘেরির রাখাল। বৃষ্টি হলে ঘাস গজায়। দূর দূর গাঁ থেকে গরু মোষের পাল নিয়ে চলে আসে। দিন-মানে গরু চরায়—বিকেলে নাস্তা, তারপর শুয়ে থাকে এই চালা-ঘরে। নীলকমল লালকমলের প্রস্তাব শুনতে শুনতে এরা ঘুমিয়ে পড়ে। ললিত বলল, এখানটায় খোঁজ নেওয়া যাক। সে ডাকল, এই শোন।

একজন বাদে সব কটা ছুটে এল। পরনে খোট, কাঁধে গামছা সম্বল। একটা রোদে দেয় আর একটা পরে। মহাজন মানুষের চাল ডাল বেঁধে দেয় পুঁটলিতে। খাই খরচ সঙ্গে পাঁচ টাকা মাসো-হারা। হিজলের বিলে এমন পঙ্গপালে আর ক'দিন পর ভরে যাবে। সুমার মাঠে ছাড়া গরু-বাছুর আর এদের লুটোপুটি। সঙ্গে আছে এক-খানা করে পাচন। পাচনের ডগায় ভর দিয়ে মিশমিশে কালো ছোকরা বলল, আজ্ঞে কন।

কেউ এদিকে গেছেরে ?

না গো বাবু।

ওরা চলে যাচ্ছিল। কি ভেবে দিবু বলল, তোরা কবে এয়েছিস ?

আজই।

থাকবি এখানে ?

বন্যা এলে চলে যাব।

এই জীবন দিবুর কেন জানি আকর্ষণ করে।

কোন গাঁয়ের ছেলে তোরা ? তোরা যে সব কালোসোনা !

চুমরিগাছার।

ভয় করে না।

ভয় কিগো বাবু। মাঠের দেবী আমাদের সঙ্গে কথা কয়। ঘর বাড়ি সব এখানে। জল আসবে। মাঠ ভিজবে। ঘাস হবে। গরু মোষ চরাব। বিকেলে ভাতে-ভাত। পদ্মপাতায় খাব। বড় মজা গো বাবু।

তখনই মনে হল চালাঘর থেকে কেউ পালিয়ে যাচ্ছে। যে বসেছিল তার কাণ্ড। কালোসোনার দল হাই হাই করে উঠল —এই কুথি যাচ্ছিস। রাস্তা হারাবি। মরে থাকবি ভুঁইয়ে। যাস না।

কেরে ?

পাগলা আছে বাবু। এসে দেখি চালাঘরটায় পুঁটলি মাথায় শুয়ে আছে। আমাদের সঙ্গে খাবে বলছে।

কেমন সংশয় হতেই ললিত ছুটে গেল। ললিতকে দেখে চিনতে পেরেছে। বেশিদূর পালাতে পারবে না বলেই বসে পড়েছিল। বুকের মধ্যে একখানা পুঁটলি। মাথা গোঁজ করা। মাথার চুল সব কাগে বগে ঠোকরে নিয়েছে। লম্বা প্যান্ট, খালি পা, লম্বা শার্ট।

এই মুখ তোল।

মুখ তুলছে না।

দিবু পাশে দাঁড়িয়ে। কালোসোনার দল বলছে, পাগলকে চেনেন বাবু। দুদিন নাকি খায়নি। ভাত হচ্ছে, পদ্মপাতায় বেড়ে দিব।

এই তোল বলছি মুখ। ললিতদা একেবারে কঠিন গলায় বলল। কিন্তু সেই যে উবু হয়ে বসে আছে, কিছুতেই মুখ তুলছে না। সে এবার জোরজার করে মাথা টেনে ধরতেই সেই চোখ মুখ। তুলি।

তুই!

চোখ টলটল করে তাকিয়ে আছে। মাথা ছেড়ে দিতেই আবার মাথাটা গোঁজ হয়ে গেল। পুরুষমানুষকে তার ভারি ভয়। সে শাড়ি সায়া পরে নাই। প্যান্ট জামা পরে আছে। পুঁটলিতে কী নিয়ে ভেগেছে কে জানে। মল্লিক থানায় এজাহার দিয়ে এসেছে। কী জানি কিসে কী হয়ে যায়। ললিত বলল খোল দেখি পুঁটুলি। কী আছে দেখি! পুঁটুলি খুলতেই ললিত অবাক। একখানা ছেড়া সায়া, শাড়ি আর ব্লাউজ। আর একটা ফটো—বাবা লোকনাথের। এই সম্বল করে সে পুরুষের বেশে বের হয়ে পড়েছে। এই সুমার মাঠ এবং জঙ্গল তার কাছে বেশি নিরাপদ। ললিতের কেন জানি চোখে জল এসে গেল। বলল, চল।

কালোসোনার দল বলল, কে গা বাবু। আপনার ভাই হয়।

ললিত বলল, হ্যাঁ।

খাবে যে বলছিল।

কি রে ওদের সঙ্গে খাবি বলেছিস ?

মাথা নেড়ে হুঁ করল তুলি।

বড় হাঁড়িতে ভাত ফুটছে। সন্ধ্যা হয়ে যাবে। পাঁচ সাত ক্রোশ পথ এরপর যাওয়া কঠিন। কিন্তু তুলি যে উঠে দাঁড়াতে পারছে না, বেশিদূর ছুটেও যেতে পারেনি, একটাই কারণ। তুদিন সে নির্জলা উপবাসে আছে। ললিত দিবুর দিকে তাকিয়ে বলল, কী করবি, তুই চলে যাবি! গিয়ে খবর দে, পাওয়া গেছে।

তুলি কেমন চমকে উঠল। তারপর তারস্বরে বলল না আমি যাব না। তোমরা যাও। চোখ ভীষণ লাল হয়ে গেছে তুলির। ঘৃণায় মুখ কেমন কুঁকে যাচ্ছে। সে উঠে আর একবার ছুটে পালাতে চাইল। পারল না। দিবু হাত ধরে বলছে, কোথায় যাবে তুমি। কিন্তু সময় এক মুহূর্তও নয়, তুলি সত্যি খপ করে কামড়ে ধরল দিবুর হাত। দিবু পাগলের মতো চিৎকার করছে, গেলাম! ছাড় ছাড়।

ললিত মাথায় একটা গাট্টা না মারলে বোধ হয় ছাড়ত না। দিবু হাতটা তুলতে পারছে না অবশ হয়ে গেছে যেন। দাঁত বসে গেছে। রক্তপাত হচ্ছে। শরীর কেমন অসাড় লাগছে। ললিত ক্ষেপে গিয়ে বলল, কি করলি তুই ? এটা কি করলি! ললিতকে কেমন উচাটনে পেয়ে বসল। কি করবে বুঝতে পারছ না। এই তোরা ধর। ধর দিবুকে। দিবুর মুখ বিকৃত হয়ে উঠছে ব্যথায়। তুলির সহসা কেমন সম্বিত ফিরে আসতেই ছেড়া সায়াটা ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ফেলল। তারপর যেমন একজন নারী তার পুরুষকে সেবা শুশ্রূষা করে থাকে, তুলি বড় যত্নের সঙ্গে হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেবার সময় হাহাকার কান্নায় ভেঙে পড়ল। আমার সব গেছে। আমার কিছু নাই। আমাকে মেরে ফেল তোমরা। তুলি কাঁদছে গড়াগড়ি দিয়ে। তার জীবনের সর্বস্ব কেউ কেড়ে নিয়েছে ললিত বুঝতে পারল। কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করছে কাঁদতে কাঁদতে। ললিত বলল, তুলি শোন, শোন তুই—তবু মানে না—দিবু এগিয়ে গিয়ে বলল, কোন ভয়

নেই। আমরা আছি। পাগলামি কর না। দরকার হয় তুমি আমাদের বাড়ি থাকবে।

ললিত কেমন সম্বিত ফিরে পাবার মতো বলল, দিবু পারবি।

পারব না কেন ?

তুলি মুহূর্তে কেমন স্তম্ভিত চোখে দেখল দিবুকে। বিশ্বাস অবিশ্বাস চোখের ওপর একটা পেণ্ডুলাম হয়ে দুলছে কিন্তু দিবুর সরল চোখে মানুষের জন্য যে আবেগ তার কোন ব্যতিক্রম নেই। তুলি কেমন নির্ভয় হতে পেরে বসে পড়ল। তার ভেতর থেকে আর এক কান্না উঠে আসছে। সে কান্না চাপবার জন্য মুখে সায়া ব্লাউজ যা ছিল গুঁজে দিচ্ছে।

কালোসোনার একজন কোত্থেকে নিয়ে এসেছে কিছু ঘাসপাতা, মুখে চিবিয়ে তা দিবুর ব্যাণ্ডেজটা খুলে বেঁধে দিল। মা-জননীর কোলে মানুষ, কোন শেকড় বাকড়ে গাছের মূলে পাতায় বিষক্রিয়া নষ্ট হয় ওদের বড় জানা। ব্যাণ্ডেজটা খুলে সেই চিবোন ঘাসপাতা বেঁধে দিতেই বড় আরাম বোধ। জ্বালা যন্ত্রণা কম, এবং হাতটা বড় হালকা। দিবু বলল, ললিতদা কী করবে।

দিবু ছেলেমানুষ। সে একটা আদর্শের ঘোরে মানুষ হচ্ছে। আগে দিবুর জ্যাঠামশাইর সঙ্গে কথা বলা দরকার। অসহায় নারীকে আশ্রয় দেওয়া যত সহজ তার হুজ্জোতি পোহানো তত কঠিন। প্রতিপক্ষ মল্লিক হরেন তার নিজের লোক, আইন তার হয়ে কথা বলবে। সে দিবুর চেয়ে বেশিদিন এই পৃথিবীর মানুষজনের আচরণ লক্ষ্য করে আসছে। তুলি নিঃসাড় হয়ে বসে আছে। আপাতত তুলির কিছু খাওয়া দরকার। পদ্মপাতায় ডাল-ভাত বাড়া। কালো-সোনার দল বলল, এবারে ঠাকুর পাঠে বসবে, আলোয় আলোয় ভাত মুখে ছ্যান।

তুলি খেতে বসে আনমনা হয়ে গেছে। কালোসোনারা বুঝতে পেরেছে, এ মেয়ে, কোন এক অঘটনের সাক্ষী। ওদেরও কেমন মায়া

পড়ে গেছে। বয়স কম থাকলে যা হয়, কোন কিছুই পৃথিবীর বাড়তি মনে হয় না. বাবু মানুষ দুজনও পদ্মপাতায় খাচ্ছে দেখে ভারি খুশি তারা। গন্ধরাজ লেবু ঘর থেকে আনা, অসম্বারি ডালের সঙ্গে এমন সুমার মাঠে একসঙ্গে ডালভাত বসে খাওয়াতে বড় আনন্দ তাদের।

ললিত একসময় বলল, এমন সুন্দর চুল কেটে ফেললি তুলি।

তুলি বোধহয় ভুলে গেছিল। মাথায় হাত দিয়ে দেখল একবার। কষ্টে মুখ ভার হয়ে গেল।

নারীর সৌন্দর্য চুলে। তুলিকে কে বলবে এখন উঠতি যুবতী নারী। কেমন সত্যি ছেলে-ছোকরা। যেন সেও এসে গেছে এই সুমার মাঠে গরু চরাতে। হাতে পাচন থাকলে তাকে কে ধরে!

তুলি খাচ্ছিল না ভাত নাড়াচাড়া করছে। সেই একইভাবে মাথা গোঁজ করে রেখেছে। মানুষের সর্বস্ব হারালে যা হয়, একা, অসহায়, ভয়ার্ত, অবিশ্বাস, সব মিলে মাঝে মাঝে তুলির চোখ মুখ প্রতিহিংসাপরায়ণ।

ললিত বলল, খা বসে আছিস কেন। কতটা আবার হেঁটে যেতে হবে।

দিবু বলল, তুলিদি, তোমাকে আমরা কাল থেকে খুঁজছি। খাও।

তুলি দিবুর সমবয়সী কি কিছু বড় এ সময় দিবু তুলিকে এমন বলে সাহসী করে তুলতে চাইল।

দিবুর কথায় কি আছে কে জানে কী যেন যাদু এক—তুলি মুহূর্তে গোগ্রাসে খেতে শুরু করে দিল।

সামনে সুমার মাঠ, কেউ হেঁকে গেল। সামনে বিশাল গভীরবন-কেউ হেঁকে গেল। তবু থাকে আকাশ, নক্ষত্র, পাখির বাসা, সবুজ ঘাস। সন্ধ্যায় সেই সুমার মাঠে একজন নারীকে নিয়ে দুই যুবকের এক গভীর অন্বেষণ শুরু হয়ে গেল। ললিত দেখল তুলি সেই পুঁটুলি থেকে তার সায়া শাড়ি বের করছে। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে

সায়া শাড়ি পরে ফিরে এল। এসেই বলল, হাঁটতে পারছি না। তার-পর কেমন আর্ত গলায় বলল, আর পারছি না। বলে ঘাসের উপর বসে পড়ল। যেন ছুলি এখন নিশ্চিন্তে এই সুমার মাঠে একটু নিরিবিলি শুয়ে থাকতে চায়। তার চোখ জুড়িয়ে আসছে। সে বলল, আমি ঘুমাব। বড্ড ঘুম পাচ্ছে। তার হাই উঠছিল।

পার্বতী বসে বসে তার পা দুখানি দেখছিল। আলতা পরা পা। শাড়ি হাঁটুর ওপর তোলা। ঘরে কেউ নেই। এমন সুন্দর আলতা পরা পা এখন ধুয়ে ফেলতে হবে। সে উঠে পড়ল। পটল ক'বার ডেকে গেছে। সাড়া দেয়নি। বিশাকে মাঠ থেকে নিয়ে এসেছে। ফ্যান জল দিতে হবে—সে ওঠেনি। পটল রাগ করে বলেছে, আমি কি করেছি! তুই কথা বলছিস না দিদি! সে এই বলে আবার চাকার গাড়িটা নিয়ে বের হয়ে গেছে। একবার বনমালীদা গলা খাঁকারি দিয়ে উঠোন পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়েছিল, সাড়া শব্দ না পেয়ে সেও চলে গেছে। কিংবা ঘরের মধ্যে শুধু দু-খানি আলতা মাখা পা দেখে ভয় পেয়েও যেতে পারে। সে বালিশে মুখ গুঁজে সেই যে পড়েছিল, আর ওঠেনি। এখন উঠতে হচ্ছে। বাবা ফিরে এসে পায়ে আলতা দেখলে চমকে যাবে। তোর পায়ে আলতা! কোথায় পেলি। তারপরই হেঁড়ে গলা—পার্বতীর বুক কাঁপে। কে দিল! বল্ কে দিল!

সই দিয়েছে।

পটল যা তো উষাকে ডেকে আন।

পার্বতীর মনে হল, তার চেয়ে বাবা আসার আগে পা ধুয়ে ফেলা ভাল। যেন এতক্ষণে তার সম্বিত ফিরে এসেছে। সে ঘরের মধ্যে ছিল কাল থেকে। ঘোর কেটে যেতেই হুঁশ ফিরে এসেছে। বাবা জানলে, রক্ষা থাকবে না। কোথায় পেলি বল হারামজাদি মেয়ে, কে দিল তোকে। পটল উস্‌কে দিতে পারে, বাবা, দিদি না মার শাড়ি পরে

কোথায় গেছিল ! তবেই হয়েছে। শাড়ি তো না, যেন দেবীর থান। তোলা থাকে। টিনের স্যুটকেসে তেল সিঁদুর, বাবার দেবীজ্ঞানে পূজা। বড়ই সংকট সামনে পার্বতীর। আর হয়েছেও তার, ভিতরে কোনো জ্বালা ক্ষোভ জন্মালেই চোখে জল চলে আসে। আসুক। পা না ধুলে তার নিস্তার নেই। কত সুন্দর করে সে সেজে ছিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখার লোভ কিছুতেই আর একবার সংবরণ করতে পারছে না। শেষবারের মতো যেন নিজেকে দেখছে। পটল বলেছিল, ও মা তুই যে দুগ্‌গাঠাকুর রে দিদি। নাকে নথ দিয়েছিস। রুপোর নথ। কানে রুপোর রিং।

ওর আঁচলে মুখ লুকিয়ে বলেছিল পটল, কী মিষ্টি গন্ধরে। আমাকে দিবি।

সে ক্ষোভে দুঃখে উঠে পড়ে পটলকে ঠেলা মেরে ফেলে দিয়েছিল—মিথ্যুক। তোর পাপ হবে পটল। কোন কথা না। কখনও আমার সঙ্গে কথা বলবি না।

এখন মনে হচ্ছে, এ-সব না বললেই ভাল হত ! কেন যে মরতে বলতে গেল ! বাবা এলে যদি বলে দেয়, দিদি না বাবা দুগ্‌গাঠাকুর সেজেছিল ! দুগ্‌গাঠাকুর সেজে কোথায় গেছিল !

প্রথমে সোডা আর বাংলা সাবানে পা ঘষল। সব তুলে ফেলছে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল দু-খানি পা। আবছা মতো লালছে আভা. কিছুতেই উঠছে না। কী যে করে ! একখা শান থাকলে হত। অথবা ঝামা এখানে কোথায় পাবে ! ঝামা দিয়ে ঘষলে হয়তো উঠত। না কি চামড়ার নিচে রঙ ঢুকে গেছে। সে বোধহয় সারাজীবন ঘষেও তা তুলতে পারবে না। সে কেমন হতাশ হয়ে পড়ল। মুখ ধুল। শাড়ি সায়া ব্লাউজ খুলে ভাঁজ করে আবার যেখানে যেমন ছিল তুলে রাখল। সারাক্ষণই সে এ সব করছে আর চোখের জল ফেলছে ! সে যে নারী, বাবা বুঝতে চায় না। গোটা সংসারটায় তার আগুন ধরিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়। কিছু ভাল লাগে না তার। কিছু নেই তার।

কেউ নেই! কেউ নেই! আমার কেউ নেই! বলেই হাহাকার কান্না।

ফুঁপিয়ে কাঁদল কিছুক্ষণ। চোখে মুখে জল দিল তারপর। কেমন অসহায় নারীর মতো চোখ তুলে চারপাশটা দেখল। শেষে চুপচাপ বসে থেকে কখন এক অন্তহীন রহস্যময়তায় ডুবে গেল। একসময় মনে হল পটল আসছে? সে উঠে দাঁড়াল।

ফ্রক পরে তার কেমন আবার লজ্জা লাগছে। দুটো ফ্রক সম্বল। ত্রাণের বাবুরা গতবার দিয়ে গেছে বেঢপ। বুকের কাছটা যেন অস্বাভাবিক ফুলে ফেঁপে থাকে। গামছা সম্বল করে সে বাড়ীর বার হয়। গায়ে সব সময় চাদরের মত ঝুলিয়ে রাখে। বনমালীদার ঠিক নজরে পড়ে গেছে। সে আর বালিকা নেই। কবেই নারী হয়ে গেছে। বনমালীদা তাকে একটু পা রাখারও জায়গা করে দিয়েছে আলতা পাউডার দিয়ে। বাপের চণ্ড রাগের জবাব সে যখন তখন দিতে পারে। বলুক না, বলে দেখুক, হ্যাঁ পায়ে দিয়েছি। কে দিল। বনমালীদা দিয়েছে।

বনমালী! নচ্ছার বদমাস ছোড়াটা!

একদম বলবে না। কে কত ভাল জানা আছে!

মুখে তোর এত বড় কথা!

হ্যাঁ, একশোবার বলব। বনমালীদা সব দেবে বলেছে। রিকশা করে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাবে। আমি যা চাই সব দেবে বলেছে।

তবে যা! বের হ! বাড়ী থেকে বের হ!

যাব বের হয়ে। কি করতে পারবে।

যা তোর গুরুঠাকুরের সঙ্গে। আর মুখ দেখাবি না। মুখ দেখালে খুন করব।

কর না খুন! কত ক্ষমতা দেখি! একটা শাড়ি দিতে পার না – তার আবার ক্ষেমতা!

পার্বতী বড় চঞ্চল হয়ে পড়েছে তবু। কোথায় যে কি লুকিয়ে রাখে! আলতার শিশিটা লুকিয়ে রাখা দরকার। কোথায় যে রাখে! ফেলতে কষ্ট হয়। বনমালীদার কিছুই বাবা সহ্য করবে না। তবু এমন সুন্দর আলতার শিশি, পাউডারের কৌটা সরিয়ে রাখতে বুক ফেটে যাচ্ছে পার্বতীর। সে ঘরের পেছনে একটা হাঁড়ির মধ্যে সব লুকিয়ে রাখল। ঘরে ঢুকে নাক টানল ক'বার। মিষ্টি গন্ধটা তবু মরছে না। বাবা বাড়ি ফিরে অস্বাভাবিক গন্ধেই সতর্ক হয়ে যাবে। ভাল না। বাড়িতে এই অলুক্ষণে গন্ধ কিসের! যদি ঘরদোর গোবর জলে লেপে দিয়ে স্বাভাবিক গন্ধটা যায়। সে ঘরদোর নিকিয়ে রাখল। আর মাঝে মাঝে রুখে উঠছে---এত করার পর যদি কিছু বলে, তবে সে ছাড়বে না। তার কী আছে! কে আছে!

ঠাকুর পাটে বসে গেছে। পটল খবর নিয়ে এল দিবুদারা ফিরে আসেনি। ঘেরির পাড়ে পাড়ে মানুষজন। ওরা কোথায় গেল! মধু রায়, উপেন রায়, সুখো বগলা সবাই ললিতের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। চোখে মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। শহর গঞ্জে দুর্ঘটনা ওৎপেতে থাকে। কখন যে কার কপালে কি লেখা জেগে ওঠে। গোটা বসতে আর এক দুঃসংবাদ ভেসে বেড়াতে থাকল---ওরা কেউ ফেরেনি। করুণা কান্নাকাটি করছে।

এ-সব খবরে পার্বতীও চঞ্চল হয়ে উঠল। সঙ্গে সংশয়। দুলি আস্ত ডাইনী। তুক-তাক করে দুজনকেই উধাও করে দিয়েছে। বাবা বাড়ী ফিরছে না। সে ভয়ে ভয়ে বনমালীদাকে ডেকে নিয়ে এল। তবু কেমন ভয় ভয় করছে। বসত থেকে কে বা কারা চক্রান্ত করে উধাও করে নিচ্ছে। কোনদিন এই বাড়িটার উপরেও হাত পড়বে। দিবুর জন্য ভেতরে যে জ্বালা ছিল, এখন তা কেমন বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। অন্য রকমের এক টান, দুঃখ বুঝি মানুষের নিরন্তর—

একটা যায়, একটা আসে। সে পটলকে বলল, আমার কাছে বোস। কুপি জ্বালাল। উনুনে খড়কুটো ঢুকিয়ে আগুন দিল। শুধু ভাত রান্না। বাপ হাট থেকে নিয়ে আসবে মাছ। মসলা বেটে রাখল। বনমালী বারান্দায় বসে কবে একবার ট্রেনে চড়ে কলকাতা গেছিল রসগোল্লা খেয়েছিল, হাওড়ার ব্রিজ, চিড়িয়াখানা দেখেছিল তার গল্প বলছে। উনুনের ধার থেকে পার্বতী হুঁ হাঁ করছে। পটলকে কিছুতেই কাছ থেকে উঠতে দিচ্ছে না। সহসা মনে হল পার্বতীর, বাবা এসে বারান্দায় বনমালীকে দেখলেই ক্ষেপে যাবে। মাথায় আগুন চড়ে যাবে। তাড়াতাড়ি সে উনুনের খড়কুটো তুলে উঠোনে এসে বলল, একটু এগিয়ে দেখ না, দিবুদারা কোথায় গেল!

বনমালী পার্বতীর বড় বাধ্যের মানুষ। পার্বতীর জন্য সে সাত সাগর সাঁতরে পার হয়ে যেতে পারে। সে বলল, কোনদিকে গেছে।

কাঁদি যাবে বলে গেছে।

পটল বলল, কাঁদি না দিদি। তুলিদিকে খুজতে গেছে!

তোকে কে বলল! মারব থাপ্পড়। আবার মিছে কথা!

উষাদিকে বলে গেছে দিবুদা।

পার্বতী বলে উঠল, না না ও এমন মানুষ নয়। ও কেন যাবে। যেন তুলিকে খুঁজতে গেলে দিবুদার মতো মানুষের মান-সম্মান থাকে না। তারপর এখন পর্যন্ত না ফেরাটা আরও ভয়ের। মনের মধ্যে যতই তোলপাড় থাকুক দিবুদাকে ছোট করতে তার লাগে। একটা খারাপ মেয়েকে খুঁজতে কে যায়! বাড়ি ছেড়ে যে মেয়ে উধাও হতে পারে, তাকে আর না খোঁজাই ভাল।

বনমালী অন্ধকারে বের হয়ে গেল। রোগা জীর্ণ চেহারা। গাল ভারী সাফসোফ। পায়ে কেডস জুতো। গায়ে হাওয়াই শার্ট। পরনে পাজামা। পার্বতীকে খবরটা এনে দেবার মধ্যে একটা বড় রকমের যুদ্ধ জয় করার মতো বিষয় আছে তার। মনের মধ্যে কোড়া পাখী ডুব্ ডুব্ করে ডাকে।

পার্বতী কেমন হাল্কা বোধ করল। একবার ঘরে গিয়ে শুঁকল সেই গন্ধটা ভেসে বেড়াচ্ছে কিনা। নাক টানল ঘরের আনাচে কানাচে। হুঁ আছে। আছে। সে অস্থির হয়ে পড়ে বাপের ভয়ে। অন্ধকারে ঘরের পিছন চলে গেল। হাঁড়ি থেকে আলতার শিশি আর পাউডারের কৌটা তুলে দূরে জঙ্গলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর আবার নাক টানতেই, গন্ধটা এসে নাকে ঝাপটা মারল। সে বুঝল, বাপ হাট থেকে ফিরলে তার রক্ষা নেই। গন্ধটা তাকে আজীবন তাড়িয়ে মারবে।

কপিল বাড়ী ঢোকার পথেই ডাকল, পটল, পার্বতী। সে বাড়ি ঢোকার আগে একটা সংশয়ে ভোগে—সব ঠিকঠাক আছে ত। সারাটা রাস্তায় সে চিন্তায় ভোগে। নতুন জায়গা, ছাড়া বাড়ির মতো সব বাড়িঘর। পার্বতীর বুদ্ধিসুদ্ধি এখনও ঠিক হয়নি। পটলটা আরও বোকা। সব ঠিকঠাক আছে রাস্তা থেকে ডেকেই জেনে নিতে চায়। পার্বতী পটল ছুটে গিয়ে দেখল, বাবা মাথায় করে একটা পাতি নিয়ে এসেছে। হাতে ব্যাগ। ব্যাগটা পার্বতী তুলে নিল হাতে। বারান্দায় নামিয়ে বাবার পাতিটা মাথা থেকে নামাল। বিশার জন্য খোল ভূষি, ডাল তেল মসলা, শুকনো লঙ্কা ব্যাগে আনাজ তরকারী, আলু, নিচে কটা চাপিলা মাছ। মাছ কটা তুলে নিয়ে গেলে কপিলের নাকে এসে সেই অস্বাভাবিক গন্ধটা ঝাপটা মারল। কীসের গন্ধ! সে ডাকল পার্বতী। কিসের গন্ধ পাচ্ছি!

পার্বতীর বুকটা কেঁপে উঠল। বলল গন্ধ হবে কেন?

ভারি মিষ্টি গন্ধ। দিবু এসেছিল?

পার্বতীর কপাল ঘামছে। না ত! দিবুদা কাঁদি গেছে। এখনও ফেরেনি।

কপিল ঘরে ঢুকে গন্ধটা আরও জোর পেল। পার্বতীর মার শরীরে এমন একটা গন্ধ মাঝে মাঝে সে পেত। সেই কি হাজির। শঙ্কা ভয় এবং প্রাণের এক আবেগে সে নাক টানতে থাকল। এমন

হবার কথা নয়। টিনের স্যুটকেসটাতে কেউ হাত দেয়নি ত! তার বড় সখের শাড়ি সায়া ব্লাউজ। এখন যা দেবীর থান হয়ে আছে এই ঘরে। তেল সিঁদুর ঠিক মতো পড়ে কিনা, না বাসি কাপড়ে কেউ ছুঁয়ে দিল! কত রকমের আশঙ্কা। সে বলল, আয়, পটল আয়। ওরা এলে বলল, গন্ধটা পাচ্ছিস?

পার্বতী স্রেফ মিছে কথা বলল, না বাবা ওটা, ঐ তোমার ধূপ-ধুনো দিয়েছি কিনা, তার গন্ধ বোধ হয়। পার্বতী কুপি হাতে ফিরে আসার সময় দেখল বিছানার বালিশের পাশে অনেকটা পাউডার পড়ে আছে। সত্যি সে ঘোরে ছিল তবে সাজতে গিয়ে! কখন কতটা পাউডার ফেলে রেখেছে বালিশের কিনারে টেরই পায়নি। হাত দিলেই ধরা পড়বে।

পটল বলল, দিদি বাবাকে মিছে কথা বলতে নেই। পাপ হয়। তোর গায়েই তো মিষ্টি গন্ধটা ছিল রে।

সব ফাঁস হয়ে গেল, সে চিৎকার করে বলল, পটল ভাল হবে না। বাবা জানো, ও আজ একদম পড়াশোনা করেনি : সারাদিন টো টো করে বেড়িয়েছে।

আমি বেড়িয়েছি, না তুই বেড়িয়েছিস বাবা জান, দিদিটা আজ মার সায়া শাড়ি পরে কোথায় গেছিল! পায়ে আলতা পরেছিল।

কপিলের ব্রহ্মতালু ফোঁত করে কে ফাটিয়ে দিল যেন! কী তুই পার্বতী, তুই, কপিল তোতলাতে থাকল। ঠিক কি বলবে বা কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। দস্যুর মতো দেখতে মানুষটা, চোখ ডেবা ডেবা। পার্বতীর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ল। পার্বতী ভয়ে দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পেছনে তার দু-হাত। বাতা থেকে সাঁ করে হাসুয়াটা তুলে নিল, তুই খুন হবি। তোর এত সাহস, এত সাহস!

পটল ডাকল, বাবা!

পার্বতী ক্রমে জোর পাচ্ছিল।

কপিল ঠাস করে টিনের বাক্সটা পেড়ে ফেলল। দেখল সব ওলট-পালট। সে আবার নাক টানল। তারপর মেয়ের পায়ের দিকে তাকাল। লাল আভা। অশুভ কিছু বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে হাঁকাড় দিল, হারামজাদী! বলেই বুঝি মনে হল ঠিক তার কোপের প্রকাশ হচ্ছে না—সে আবার হাঁকাড় দিল—দুঃস্বভাবা নারী। মানকুলহীন—তোরে দিয়ে আমার কী হবে রে! কে দিল আলতা। বল্ বল্। নাহলে তোর একদিন কি আমার একদিন। সব পুড়িয়ে দেব সব। নিজে পুড়ব। তোদের পুড়িয়ে মারব।

পটল বলে ফেলে বোকা হয়ে গেছে। দিদিটা কিছু বলছে না। পটল বলল, না বাবা, আমি মিছে কথা বলছি। তুমিই তো বল, আমি একটাও সত্যি কথা বলি না।

কপিল বলল, মিছে কথা বলছিস?

হ্যাঁ বাবা।

পার্বতীর মর্যাদায় লাগে। বাবা তাকে যে হেনস্থা করেছে তারপর তার আর বেঁচে থাকার অর্থ হয় না। বাবা তার মাথার চুল খাবলা করে ধরে টানাটানি করেছে। বেঁচে থাকা না থাকা সমান। দিবুদাকে দেখতে না পেয়ে বাড়ি ফিরে তার একবার মনে হয়েছিল খুটিতে ঝুলে পড়বে। দেখুক সবাই সে কত সুন্দর দেখতে। তারপর মনে হয়েছে—বদলা নিলে কেমন হয়! তার তো মাটিতে পা রাখার জায়গা আছে। সে এবারে বাপের হাত মাথা থেকে দু-হাতে টেনে হিঁচড়ে নামাবার সময় বলল, মিছে কথা না। আলতা পরেছি। বনমালীদা আলতা দিয়েছে। শাড়ি পরেছি মার শাড়ী। আমি বড় হয়নি! আমার দিকে তাকিয়ে দেখে বোঝ না, আমি বড় হয়েছি। আমার একখান শাড়ি পর্যন্ত নেই। কোথাও বের হতে পারি না। আমার শাড়ি পরতে ইচ্ছা করে না।

পার্বতী বলছে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

কপিল একেবারে থ। এত সাহস মেয়েটার হয় কোত্থেকে! তার এক হাঁকড়ে যে মেয়ে কুঁকড়ে যেত সেই মেয়ে মুখের উপর কথা বলছে, হ্যাঁ পরেছি। আলতা বনমালীদা দিয়েছে। সেই কুষ্মাণ্ডটা বাড়ির আনাচে কানাচে শেয়ালের মতো যার ঘুরে বেড়াবার স্বভাব!

এবার কপিলের সব রাগ গিয়ে পড়ল পটলের উপর।—তুই কোথা থাকিস হারামজাদা শূয়োর।

আমি তো বাড়িতেই থাকি।

বনমালী কখন আসে।

কৈ আসে না তো!

আবার মিছে কথা।

পার্বতী বলল, আসে। আজও এসেছিল। আমি ডেকে আনিয়েছি। ভয় করে না! তুমি বাড়ি নেই, দিবুদারা নিখোঁজ। ভয় করে না! ছুলিদিকে তুলে নিয়ে গেছে, ভয় করে না!

কপিল মেয়েকে আর একটা কথাও বলতে পারল না। ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। ভেতরটা কেন যে জ্বলছে। সে সত্যি অক্ষম মানুষ। চাষ-আবাদই শুধু করে। জমি কথা কয় সবুজ শস্য জন্মায়—কিন্তু ঘরে খরা চলছে সে টের পায় না। সে কেমন কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকল। মা-মরা মেয়েটাকে সে আজ মেরেছে। মেয়েটাও ক্ষণিকের জন্য কেমন উগ্রচণ্ডা হয়ে উঠেছিল। মার শাড়ি পরে দেখতে চেয়েছে পার্বতী কত বড় হয়েছে। বড় হওয়া কী মধুর! কপিলের চোখেও জল এসে গেল। একটা শাড়ি সত্যি বড় দরকার। যেন এটা আজ পার্বতীর কাছে তার ইজ্জতের প্রশ্ন। সে চোরের মতো ঘরে ঢুকে গেল। দেখল পটল পার্বতীর সামনে বসে আছে। পার্বতী ছন্নছাড়া বালিকার মতো তাকিয়ে আছে কোন সুদূরে যেন। সে যে ঘরে ঢুকল এবং চোরের মতো বের হয়ে গেল লক্ষ্যই করেনি। জামার নিচে একখান শেষ সম্বল কাঁসের থালা।

নিবারণ করের কাছে বন্ধক রেখে একখান শাড়ি কিনবার আজ বড় শখ হয়েছে তার।

রাত বাড়ছে। আকাশে আশ্চর্য সব নক্ষত্র মালা তেমনি উঁকি দিয়ে আছে। তালগাছের মাথায় কিছু শকুনের পাখা ঝাপটানোর শব্দ। রাতচরা পাখিরাও ডাকছে। রাস্তায় লোকজন—এক কথা, কোথায় গেল ললিত দিবু! হাতে লণ্ঠন। সাপখোপের উপদ্রব এই সময় বড় বাড়ে। দিবুর মা জেঠিরাও বারান্দায় বসে আছে। কোথাও খুট করে শব্দ হলে কান খাড়া করে রাখছে। কেউ এল বুঝি, রাস্তাতক হেঁটে দেখে আসে। করুণা লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। কেমন এক নির্জনতা গ্রাস করে আছে বাড়িটাকে।

আর তখন ললিত বলল, তোরা ঠিক বলছিস ত?

চলেন না। ঘেরি ধরে গেলে ঘুরতে হয়। আমরা যাব সাহুর ডাঙ্গা ধরে। দু ক্রোশ পথও নয়।

বলিস কি! এখান থেকে কিছুই বোঝা যায় না।

মাঠ-চরা দুই মানুষ, গরুমোষ চরায়, হিজলে, এই করে বড় হওয়া হিজলের পাঁচ-দশ ক্রোশের মধ্যে কোথায় কি আছে সব জানা। দুলি দিবু আর না পেরে ঘাসের উপর শুয়ে পড়েছিল। সে জেগে। আর এই মাঠ চরার দল। ওদের কাছে হিজলের কত কিংবদন্তি, ওরা গরু মোষ চরাবার সময় ভাবে পেয়ে যাবে কোথাও গুপ্তধন। কাঠের সিন্দুক ভাসিয়ে আনে বন্যা। আবর্জনায় নিচে ঘাঁটাঘাঁটি, কিংবা বালি চাপা পড়ে যায়। পাচনের খোঁচাখুঁচিতে যদি বের হয়ে আসে। এনারা এই তিনজন পথ ভুল করে এই ভুবনডাঙায়। বড় কাতর মুখ-চোখ—কী হবে, কোথায় থাকবে বাড়িঘরে ভাবনা, এ-সব বলাবলির সময় মাঠচরাদের মধ্যে সাবালক তারা দুজন এগিয়ে এল। লণ্ঠন নিল পাচনের ডগায়। আগে তারা পেছনে তিন বড় মানুষ।

ললিত দেখছিল, দুলি একপাশে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ছেঁড়া সায়া

শাড়িতেও সে যে নারী বুঝতে এতটুকু কষ্ট হয় না। লাবণ্য ধরছে। ঢুলির সেই ধারালো চোখ ক্ষণিকের জন্য সে দেখছিল। তার চোখেও কোন আভাস থাকতে পারে। সেই থেকে রাস্তায় বার বার এক, কথা, তুমি আমাকে ঘর বানিয়ে দেবে। তোমাকে বেঁধে বেড়ে দেব। দুটো খেতে দেবে কিন্তু। ঢুলি এত সোজাসুজি কথা বলবে সে কখনও ভাবেনি। আর মাঝে মাঝে ঢুলি সাপের মতো ফুঁসে উঠছে। কিছু বলতে গিয়ে কেমন হাঁপিয়ে উঠছে। তারপর কোন সময় দেখছে, রাস্তায় বসে পড়ছে। বলছে, যাব না। তোমরা আমাকে খারাপ করতে চাও। আমি সব বুঝি!

দিবু তখন হাত বাড়িয়ে দেখিয়েছে, কি করেছ হাতটা!

ঢুলি জিভ কেটে বলছে, আমার মাথা ঠিক নাই।

তবে হাঁটো। বসে থেকো না।

যেন দিবু এই হাত দেখিয়ে ওকে ফিরিয়ে আনছে। কামড়ে দিয়ে ঢুলি যে সত্যি অপরাধ করেছে, এটা তার করা ঠিক হয়নি, তার বিনিময়ে সে এখন যা করতে পারে, তা দিবুবাবু যা বলবে করা। দিবুর হাতের ক্ষতটি না থাকলে ঢুলিকে শেষ পর্যন্ত বোধ হয় ললিত এতটা হাঁটিয়ে নিয়ে আসতে পারত না। কেমন ছিটগ্রস্ত হয়ে গেছে কিছুটা। দিবু ললিত দুজনেই বুঝতে পেরে বলেছে, বলতো লোকে কী বলবে! তুই দিবুর হাত কামড়ে দিলি!

ঢুলি জীবনে শুধু নির্যাতন সয়েছে। সে জীবনে কাউকে কোন নির্যাতন করার সুযোগ পায়নি। সুযোগ পাবার পর মনে হয়েছে তার মতো আশ্রয়হীন মেয়ের এমন কাজ শোভা পায় না। দিবুরা কত ভাল মানুষ, বড় মানুষ। ক্ষতটা দেখলেই কেমন সে নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। নিজের জেদ অবিশ্বাস সব ভুলে যাচ্ছে। আবার হাঁটার জন্য উঠে দাঁড়াচ্ছে।

এভাবে তারা হেঁটে যাচ্ছিল। দুই মাঠ-চরা মানুষ আগে। পাচনের ডগায় লণ্ঠন দুলছে। বন জঙ্গল, বালির ঢিবি, নদীর পাড়

এবং মাঠের আল ভেঙে একটা তালগাছের নিচে দাঁড়িয়ে একজন বলল, উই যে আলগুলান ছুলছে, ওটাই হাজিদের ঘেরি।

দিবু তার সাইকেলটায় ভর করে দেখল—বুঝল এসে গেছে।

ললিত বলল, কাকা আপত্তি করবে না তো।

দিবু বলল, করলে করবে। কেন তোমার ঘর নেই। চায়ের দোকানটা তো আছে। আমরা খেটে না হয় ঘর তুলে দেব।

যা কী যে বলিস ? লোকে কী বলবে।

রাখ তো লোকের কথা।

ছুলি বলল, তোমরা আমাকে খারাপ করতে চাও। আমি যাব না।

দিবু আবার হাতটা দেখাল। ছুলি উঠে দাঁড়াচ্ছে।

দিবু একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, ললিতদা পারবে ত সামলাতে। মাথাটা গেছে।

তোরা সবাই ত আছিস। তারপরই ললিতের মনে হল, এই শুমার মাঠের মতো বৃষ্টিপাতের অপেক্ষায় আছে ছুলি। আর তখনই ছুলি কেমন ক্ষেপে গিয়ে বলল, আমি এঁটো হাঁড়ি, পূজার ভোগ করবে কী করে! তোমরা আমাকে খারাপ করতে চাও, সব বুঝি গো. সব বুঝি।

দূর থেকে দিবু ললিত বুঝতে পেয়েছে বাঁধের পাড়ে খোঁজাখুঁজি চলছে। নাহলে রাতে লণ্ঠনের এমন মেলা চোখে পড়ার কথা না। না বলে কয়ে এ-ভাবে খুঁজতে আসা ঠিক হয়নি। ঊষাকে বলেছিল, ললিতদা বলেছে ফেরার পথে ছুলির খোঁজখবর নেবে। সে যে এ-সবের মধ্যে নেই এটাই বলার ইচ্ছে ছিল দিবুর। এক কলঙ্ক থেকে আর এক কেলেঙ্কারি হতে কতক্ষণ মল্লিক আইনবাজ লোক! সহজেই সব দায় তাদের মাথায় চাপিয়ে দিতে পারে। এরাই ফুঁসলে বের করে নিয়েছিল, পরে এরাই আবার ঘরে ফিরিয়ে এনেছে। মাঠ-চরা দুজনকে দিবু বলল, তোমরা যাও, আমরা ঠিক যেতে পারব।

ওরা চলে গেলে মনের ধন্দ খুলে বলল, ললিতদাকে। ছুলি সেই যে বসে আছে উঠছে না। ঘেরিতে কিছুতেই ফিরবে না জেদ ধরে বসে আছে।

ললিত বলল, চিনতে পারবে না বলছিস?

তুমি চিনতে পেরেছিলে!

ললিত কি ভাবল! ছুলির গায়ে পুরুষের জামা প্যান্ট। চুল সব কাগে বগে ঠোকরানো। মাথা নেড়া করে দিলে একেবারে অন্যরকম। সে প্রথমে বুঝতেই পারেনি ছুলি। দৌড়ে পালাবার চেষ্টা না করলে তার সংশয় হত না, একেই তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে। মেয়েমানুষেরা নেড়া হলে মুখ চোখ এত বদলে যায় পুরুষের পোশাক-আসাকে নারীর লাবণ্য থাকে না, ছুলিকে দেখে প্রথম সে তা টের পেয়েছে। তবু মনে ধন্দ থেকে যায় ললিতের। খেয়াল করলে বুঝতে পারবে।

সে বলল, লোক কি এতই বোকা?

বোকা বলছ কেন?

ছুলিকে দেখলে চিনতে পারবে না।

তুমি যে বলতে ছুলিকে ঘর থেকে বের হতে দিত না।

সেটা তো সবাই জানে।

তুমিও জান। ওর মুখ তোমার চেনা, তুমি ক্যাম্পে মেয়েটাকে অন্য চোখে দেখেছিলে।

ধাঃ কি যে বলিস!

আমি সব বুঝি ললিতদা। তুমি আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পার না। ছুলিকে আরও একজন ভাল করে চেনে। সে কে তুমি জান। আর সবার হাজার গণ্ডা মানুষের মধ্যে ছুলির মুখ মনে রাখতে বসে গেছে। কে কোথা থেকে এয়েছে তারই তো খবর এখনও রাখি না। ভেবে দেখ ঠিক বললাম কি না।

দিবু এবার ছুলিকে বলল, ছুলিদি পাগলামি কর না। এদিক ওদিক হলে তুমিও মরবে আমরাও মরব। যা পরে ছিলে তাই পরে

এস। আমরা এখানে থাকলাম। ললিতদা যা বলবে করবে আমাদের মাথা কাটা যায় এমন কাজ কর না।

তুলি সব শুনছিল। ত্বদিনে সে হা-অন্নের দুঃখ বুঝেছে। সে মরতে পারে তার এমন সাহস নেই। দিবুর বাবা কাকারা মানিজন দিবুর কথার মধ্যে বড় আন্তরিকতা রয়েছে। ললিতদাটাই বরং তা নাগাল পেয়ে কেমন বোকা বনে গেছে। সারাটা রাস্তায় ললিতদ কথা কম বলেছে। কেবল মাঝে মাঝে বলেছে কী যে করি এই মেয়েটাকে নিয়ে। একটা কথাই ছিল মুখে। দিবুদের বাড়ি থাক নিয়ে শেষ পর্যন্ত কতটা অশান্তি পোহাতে হবে তাও ললিতদার মাথা ছিল। তুলি সারাটা রাস্তায় বড় বাধ্যের থাকার চেষ্টা করেছে কি ক্ষণে ক্ষণে মাথার মধ্যে বিজবিজে ঘায়ের মতো সেই অমানুষের দা এবং চিন্তাহরণের কুৎসিত আচরণ তার ছটফটানি বাড়িয়ে দেয় প্রতিহিংসায় চোখ মুখ জ্বলে ওঠে। সব মানুষকে তখন একরকম মনে হয়। সে সরে যাবার সময় দেখল দুটো ছায়ামূর্তি বড় সংলগ্ন। তুলি বুঝতে পারে দিবুদের বাড়িতে সে আপদের সামিল। পৃথিবীতে এখনও তবু মানুষ আছে যে তাকে সারাক্ষণ খুঁজে বেড়ায়। মানুষে জন্য আবার তার মায়া বাড়ে।

দিবু বলল, হল!

আসছি। খুবই স্বাভাবিক গলা।

এই ভাল হল ললিতদা। তোমার চায়ের দোকানে ছোক সেজে থাকবে। ফুট ফরমাস খাটবে। জল আনবে। মল্লিক তোমাকে দেখলে থুথু ফেলে। এটা আরও বাড়িয়ে দিতে হবে। আমার বা কাকা কিংবা মরণ সুখো বগলা চোখেই দেখেনি তুলিদিকে। আপাত চলুক। তারপর দেখা যাবে। আমরা কাউকে খুঁজতে যাইনি কেউ আমাদের সঙ্গেও আসেনি। শো দেখে ফিরতে দেরি হয়েছে তুমি বললে বাবা সব বিশ্বাস করবেন।

দিবু বলল তুলিদি এই কথাই থাকল।

ললিত বলল, যা ভাল বোঝ কর। আমার মাথায় কিছু আসছে না।

তুলি ফিরে এল তখন। বলল, দেশলাই আছে?

ললিত বলল, কী হবে?

দাও না। কিছু করব না। ভয় নেই। অন্ধকারেও ললিত যেন টের পায় মানুষের প্রতি নারীর যে চিরন্তন আকর্ষণ তুলির কথাতে বড় আজ বেশি স্পষ্ট। দেশলাই দিলে, ললিত দেখল সেই সায়া শাড়িতে তুলি আগুন দিচ্ছে। তার কথাবার্তা যেন একজন সাবলীল পুরুষের মতো। তুলি নিজের এই ছদ্মবেশ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রক্ষা করবে এমনই যেন কথা দিল তাদের। ললিত বলল, না থাক আগুন ধরাবি না।

এটা নিতে বলছ! আমার একখানা কাঁসার বাসন সম্বল।

তোমার মেয়েকে মানাবে কপিল। লাল ডুরে শাড়ি। মেয়ে তোমার বড় হয়েছে। শাড়িখানা পরলে পরী হয়ে যাবে।

বলছ নিতে! কত আর দিতে হবে?

বৃন্দাবন কর বাসনটা হাতে নিয়ে ওজন পরখ করল। ওজনে বেশ ভারি। দাম পুষিয়ে গেছে। তবু সে একজন ধুরন্ধর ফেরিওয়ালা। মানুষ বেচা-কেনার মতো শাড়ি বেচা-কেনা করতে হয় তাকে। সহজে কাবু হওয়া ঠিক না। কপিলকে আটকে রাখতে পারলে পরে আবার কাজে আসবে। বলল, মণ্ডলকে দেখাই। কী বলে দেখি। নিয়ে যাও। পার্বতীর মতো মেয়ে হয় না। দেখছ তো দিনকাল কী পড়েছে। ঘরের মেয়ে ঘরে রাখাই দায়। শাড়িখানা পার্বতীকে মানাবে।

কপিলের তর সইছিল না। সে বাইরে এসে নতুন কাপড়ের গন্ধ শুঁকল অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। রাস্তায় দেখা মধুদার সঙ্গে। হাতে লণ্ঠন নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। দিবু ফিরে এসেছে খবরটা দিতেই তার

সুখের খবরটা না দিয়ে পারল না। দাদা নিয়ে যাচ্ছি। কেমন হল। বলে শাড়িটা লণ্ঠনের আলোয় মেলে ধরল কপিল।

এই রাতে কপিল এবং শাড়ি এবং তার উদ্ভাসিত মুখ চোখ মধু রায়কে কিঞ্চিৎ বিভ্রমে ফেলে দিল। বলল, কোথেকে আনলি ?

করের কাছ থেকে। আজ যা গেল না !

কপিল বাড়ির কথা এই মানুষটাকে বলতে না পারলে শান্তি পায় না। আচ্ছা বলেন, এটা ভাল কাজ। আলতা দিলেই নিতে হয়।

তোমাকে তো বলছি কপিল, মেয়ের মনে ধরেছে। দশকান কোরো না, পিঁড়িতে বসিয়ে দাও। দেখছ ত কী কেলেংকারিটা করল হরেনের মেয়ে।

সেই। কপিল বলতে পারল না, শাড়িটা পার্বতীকে মানাবে কি মানাবে না। রাগও করতে পারল না। বাপ হয়ে জলে ফেলে দেয় কী করে। মেয়েটা তো তার অবুঝ। বলল, পার্বতীটা আমার অতশত বোঝে না। বড় নির্বোধ। মেয়ের জন্য বড় উচাটনে আছে কপিল। কী করতে কী করে বসবে। বড় বেশি হেনস্থা করেছে। গিয়ে ভালয় ভালয় দেখতে পেলে হয়। পটলটা ঘুমিয়ে না পড়ে। মেয়েটার রাগ হলে মাথা ঠিক রাখতে পারে না। সে দ্রুত পায়ে ছুটতে থাকল।

ঘরে ফিরে সে দেখল পার্বতী তেমনি দরজায় ঠেস দিয়ে বসে আছে। পটল পায়ের কাছে মেঝেতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘরে ঢুকে কপিল বলল দিবু ফিরেছে। ললিতের সঙ্গে সিনেমা দেখেছে।

পার্বতী তেমনি বসে আছে।

কপিলের একটা পা দুবলা বলে, পাটা টেনে বসতে হয়। সে পা টেনে বসে বগলের নিচে থেকে শাড়িটা বের করে বলল, দেখ তো পছন্দ কি না।

পার্বতী বাপের চোখে এমন আগ্রহ জীবনেও দেখেনি রাগ বানের জলের মতো ভেসে গেল। কোথেকে আনলে।

সে এনেছি। একবার পর না দেখি !

পার্বতী কেমন ফিক করে হেসে বলল, কাল পরব।

পর না পার্বতী দেখি।

পার্বতী শাড়িটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কপিল বলল, আমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াই। দেখি না কেমন লাগে দেখতে। পর মা।

না লজ্জা করে!

লজ্জা কিরে!

পার্বতী সহসা দৌড়ে বের হয়ে গেল।

কোথায় যাচ্ছিস।

এখানে।

পার্বতী ফ্রকের উপরই শাড়িখানা পেঁচিয়ে পরল। সারাদিনের সমস্ত গ্লানি মুহূর্তে তার জল হয়ে গেল রাতে পটল কপিল ঘুমিয়ে পড়লে কেমন তার মনটা খচ করে উঠল। মানুষটাকে পাঠিয়েছে দিবুদার খোঁজ আনতে। দিবুদা ফিরে এয়েছে খবরটা সবাই জেনে গেছে। কিন্তু মানুষটা তো সেরকমের নয়। তাকে কেন খবরটা দিয়ে গেল না! সে আবার কোথায় উধাও হল! পার্বতী উঠে বসল। মানুষটা তো তাকে বলত তোমাকে একখানা শাড়ি এনে দেব। পরবে ত! আমি দেখব তোমাকে। শাড়িটা পরেই সে শুয়ে আছে। যে কোন সময় এসে দরজায় দাঁড়াতে পারে যেন। বাবা তো জানে, সে আসে। কত অজুহাত উপলক্ষ্য করে চলে আসে। আজও আসবে। বলবে, ফিরেছে। দিবুবাবু ফিরেছে। চিন্তার কোন কারণ নাই।

শাড়ির নতুন গন্ধ এখন ঘরময়। অন্ধকারেও শাড়ি পরার এক উজ্জ্বল ছবি সে দেখতে পায়। থরথর করে লজ্জায় কাঁপছে মুখ। কপাল ঘামছে। আর্শিতে পাশাপাশি দুজন মানুষ। দু রকমের ছবি। একটা হারিয়ে যায় তো আর একটা ভেসে ওঠে। সে রাঙাচেলি পরে টিনের স্যুটকেস হাতে নিয়ে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

কপালে সিঁদুরের বড় ফোঁটা। পায়ে আলতা মুখে পাউডার। শরীরে চন্দনের সুগন্ধ। পাশে তার ঢ্যাঙা মানুষটি। মাথায় সাদা রঙের টোপর। পাম্পসু পায়। কোরাধুতি পরনে। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি দিবুদা ললিতদা ট্রেনে তুলে দিতে এসে দেবদারু গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে।. বড় সুখে চোখ বুজল পার্বতী।

তবু ঘুম এল না পার্বতীর। কতরকমের আশঙ্কায় যে ভুগছে। গেল তো কোন খবর নেই! তারপর ভাবল বাবা বাড়ি আছে বলে হয়ত ঢুকতেই সাহস পায়নি। বাড়ির আনাচে কানাচে কোথাও দাঁড়িয়ে আছে। সে সন্তর্পণে ঝাঁপ তুলে দেখল, দেখা যায় কি না। তার কেমন কষ্ট হল, চোরের মতো একটা লোক তাকে দেখার জন্য ভালবাসার জন্য কেবল অপেক্ষা করে। মানুষটার এই আচরণের জন্য চোখে জল এসে গেল পার্বতীর। কত হেনস্থা সয়েছে। এক কথায় উঠে গেল, অথচ ফিরে এসে বাবা বাড়ি থাকায় ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না। সন্তর্পণে দরজা খুলে দেখল—না উঠোনে কেউ দাঁড়িয়ে নেই। গোয়ালঘরের পেছনে যদি থাকে—যেন যত দুর্যোগই আসুক সে আসবে—পার্বতী খুঁজে বেড়াতে থাকল। মনে মনে বলল, এই বাবা নেই! ভয় নেই। এস না। কোথায় তুমি! আমি শাড়ি পরেছি ছ্যাখ। না কোথাও তাকে দেখা গেল না। কোথাও চোরের মতো দাঁড়িয়ে নেই দেখে হতাশ হয়ে ফিরে এসে বড় সন্তর্পণে ফের দরজা ভেজিয়ে দিল। মাত্র শুয়েছে তখনই ফটিক ঠাকুমার গলা—ও কপিল, কপিল!

পার্বতী বাবাকে ঠেসে দিয়ে বলল, এই বাবা, বাবা, ও পটল, পটল দেখ ঠাকুমা মনে হয় ডাকছে।

কপিল সহসা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় লাফিয়ে উঠে বসল।—কে কে?

আমি। ওঠ। ঠাকুমা ডাকছে।

তাড়াতাড়ি পার্বতী কুপিটা জ্বেলে বাইরে বের হয়ে এল।

ওমা তুই! ঘুমাসনি। বনমালী ত ফিরল না!

পার্বতীর বুকটা কেমন ধড়াস করে ওঠে। কিছু জানে না মতো বলল, কোথায় গেছে!

দিবুকে খুঁজতে যাচ্ছে বলে বের হয়ে গেল।

কপিল কেমন তেরিয়া হয়ে জবাব দিল, আমাদের কী বলে গেছে। আমরা জানব কী করে। তোমার ভাইপো তো দশঘাটের জল খাওয়া লোক কোথায় গিয়ে মজে গেছে ছাখ।

ফটকি বোনদি কপিলের ট্যারা কথার জবাব দিতে পারত, কিন্তু এত রাতে কেন জানি বচসা করতে ভাল লাগল না। লাঠি ঠুকে ঠুকে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কপিল বলল, যত রাজ্যের শকুন জায়গাটায় উড়ে আসছে। কে কোনখানে থাকে তার খবর আমি রাখতে যাব কেন! আমার খবর কে রাখে! সে পার্বতীর দিকে তাকিয়ে বলল, তুই আবার দাঁড়িয়ে কেন। ভিতরে যা! ভিতরে যা। এমন তাড়া লাগল যে পার্বতী ছুটে গিয়ে একবার জোরে ডাকতে পর্যন্ত পারল না, ও বনমালীদা কোথায় গেলে! সে ডাকলে যেখানেই থাকুক ঠিক সাড়া দিত মানুষটা। টেলিগ্রাফের তারের মতো কেউ তার কাছে পার্বতীর সব খবর বয়ে নিয়ে যায়। কেউ যখন জানে না বোঝে না, মানুষটা খবর পেয়ে যায় পার্বতীর এখন আলতা পরার সময় শাড়ি পরার সময়।

তার আর ঘুম এল না। সারা রাত এ-পাশ ও পাশ করল। কেবলই মনে হতে থাকে মানুষটা জানালায় দাঁড়িয়ে ডাকবে পার্বতী, আমি বনমালী। তোমার দিবুদা ফিরে এয়েছেন! ভাল আছেন। কোন চিন্তার কারণ নাই।

ভোর রাতে তার ঘুম লেগে এয়েছিল। শাড়ি পরে নতুন শুয়ে থাকলে যা হয় হাঁটুর উপর শাড়ি উঠে যায়। প্রায় উলঙ্গ। ঘুমের ঘোরে খেয়াল থাকে না—সকালে এক ভয়ংকর সোরগোলে তার ঘুম ভাঙল। তাড়াতাড়ি শাড়ি টেনে রাস্তায় নেমে শুনল সব লোক বাঁধের ওপার থেকে ছুটে আসছে। ওখানে একটা মানুষ উবু হয়ে পড়ে আছে। কালে তারে খেয়েছে।

॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥

এই নতুন আবাসভূমিতে কটা ধিরিঙ্গি তালগাছ সম্বল। একা এবং নির্জনতার প্রতীক যেন তারা। ধুধু মাঠ, এবং রোদের উত্তাপ, সারা দিনমানের সঙ্গী। বাঁধের ধারে ধারে বাড়িঘর উঠছে। কাঠ এবং বাঁশ কাটার শব্দ শোনা যায়। দূরে স্টেশন বিন্দুর মতো আকাশের নিচে ঝুলে থাকে। আর খড়ের মাঠ মাইলের পর মাইল ব্যাপ্ত। দূর থেকে দেখলে বোঝা যায় না, এমন নির্জন এবং পরিত্যক্ত জায়গায় কখনও মানুষের আবাস তৈরি হতে পারে।

পুবের আকাশ ফর্সা না হতেই একটা হাহাকার ধ্বনি এই আবাস-ভূমিকে সচকিত করে দিয়েছিল ; কারো তরাসের গলা—কালে খেয়েছে। সাপ-খোপের উপদ্রব এই বিলেন অঞ্চলে নিত্যদিনের ঘটনা। প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যে মানুষের মতো এইসব সরীসৃপদেরও পাগল করে রাখে প্রকৃতি। কোপানলে পড়তেই পারে কেউ। সে কে ? কাকে কালে খেল !

দিব্যেন্দুর রাতে ভাল ঘুম হয়নি। ফিরতে রাত হয়েছে। নতুন জায়গা, সবার ভাবনা চিন্তা হতেই পারে। সকালে বের হয়েছিল ললিতদার সঙ্গে সাইকেলে। দুপুর নাগাদ ফিরে আসার কথা ছিল। ফিরতে পারেনি। বাড়িতে সবার কাছেই মিছে কথা বলেছে। ললিতদা জোরজার করে বাইস্কোপে নিয়ে গেল—তার করার কিছু ছিল না। শুধু জ্যাঠামশাই বলেছিলেন, ললিতের এটা উচিত হয়নি। এখনই যদি তোমরা এত রাত করে ফের, বড় হলে করবে কি !

দিব্যেন্দু জানে, জ্যাঠামশাই ছিন্নমূল হবার পর পরিবারের সবার সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন হয়ে গেছেন। ফুলিদির ফেরার হওয়ার বিষয়টা নিয়ে একটা কথাও বলেননি। সব ভাঙছে। ভাঙতে ভাঙতে কোথায় গিয়ে ঠেকবে কে জানে! নিজের পরিবারটুকুর ভাঙন

ঠেকানোই তার সবচেয়ে এখন বেশি জরুরী। দিব্যেন্দু ইচ্ছে করলেই ছুলিদিকে খুঁজতে বের হতে পারে না। ললিতদার পরামর্শ মতো সে গেছে, এবং ছুলিদি যে ফিরে এসেছে, এবং এই আবাসভূমির কোথাও গোপনে এসে উঠেছে কেউ জানে না। সে আর ললিতদা বাদে এই ঘেরির সর্বত্র সবাই জানে এবং ওর বাবা মা এমনকি চিন্তা-হরণও জানে মেয়েটা ফেরার। কেন যে ফেরার এটা ছুলিদির চোখ-মুখ দেখে সে টের পেয়েছে। ছুলিদি তার হাত কামড়ে দিয়েছিল। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। জ্যাঠামশাই চোখ কুঁচকে বলেছিলেন, হাতে কি হয়েছে তোমার ?

সে কাচুমাচু মুখে বলেছিল, সাইকেল থেকে পড়ে।

গুরুজনদের সামনে কত আর মিছে কথা বলা যায়! সে কোন রকমে দুটো মুখে দিয়ে নিজের বিছানায় এসে আশ্রয় নিয়ে কিছুটা যেন স্বস্তিবোধ করেছিল। এবং শুয়ে মনে হল, এত বানিয়ে বানিয়ে সে অজস্র মিছে কথা বলে গেল কী করে! এবং সেই থেকে যেন কোথাও কূট-কামড়, পারিবারিক পরিমণ্ডল মানুষকে যে সৎ হতে শেখায়—সেখান থেকে সে যেন অনেকটা ছিটকে পড়েছে। জ্যাঠা-মশাইয়ের সামনে সে কোনদিন কিছু গোপন করতে পারেনি—মিছে কথা বলা তো দূরের কথা, কাল সে তাই করেছে। ঘুম আসছিল না। পার্বতী, ছুলিদি এবং সেই ফণীর দিদি, ললিতদার ভাষায় সার্কাসের মেয়ে—সবাই চোখের উপর নেচে গেলে তার ঘুমটা আসে কী করে!

কেউ তাকে ডাকছে!

কে ?

ওঠ দাদা। শিগগির ওঠ। কালে খেয়েছে।

ঘরগুলি নতুন। মুলি বাঁশের বেড়া, খড়ের চাল। বেলা যে হয়েছে, বেড়ার ফাঁক-ফোঁকরে আলোর চাকচিকাতে ধরা যায়। সে শোয় বারান্দায়—যেখানটায় জ্যাঠামশাই সকালে ঝাঁপ তুলে কাঠের বাক্সটা নিয়ে বসেন। পাশে একটি চেয়ার আর লম্বা টুল। রুগীপত্তর

এলে এখানটায় তারা বসে। সে উঠে প্রথমে টুলটায় বসে বলল, কি হয়েছে বললি ?

কালে খেয়েছে।

কাকে ?

ফটকি ঠাকমার ভাইপোকে !

ও, সেই লোকটাকে ! পার্বতীকে বড় জ্বালাতন করত লোকটা ! কোন বিষাদ কিংবা আতঙ্ক এ-সময় তার মধ্যে ক্রিয়া করল না। লোকটা সম্পর্কে কেবল অভিযোগই শুনেছে, কপিলকাকা বাবাকে বার বার শাসিয়েছে, ঠ্যাং ভেঙে দেব বোঝলেন। আমার পার্বতীরে কয় আলতা কিনা দিব।

পার্বতীদের বাড়ির সামনে সেও দেখেছে মাঝে মাঝে—গলায় রুমাল বাঁধা একহারা চেহারার এক মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে। চক্রাবক্রা গেঞ্জি গায়। ডান হাতে ঘড়ি পরে। একদিন ললিতদার দোকানে গিয়ে চাও খেয়েছে।

সাপের দংশন না অন্য কিছু, কে জানে ! দিব্যেন্দু এখানে আসার পর থেকেই জায়গাটা সম্পর্কে খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে বুঝেছে, এই খাঁ খাঁ মাঠে প্রকৃতির ক্ষ্যাপামি বড় বেশি।

উষা খবরটা দিয়েই এক দৌড়ে রাস্তায়। লোকজন এখন ঘরে নেই। ছোটকাকি, মা এবং জেঠিমার কোন সাড়া নেই। জ্যাঠামশাই কার সঙ্গে বাইরের উঠোনে কথা বলছেন। সে আর বসে থাকতে পারল না রাস্তায় গিয়ে দেখল, ঘেরির তালগাছের নিচে নতুন আবাসের সব মানুষজন ভেঙে পড়েছে। যাবার সময় জ্যাঠামশাই বললেন, ওদিকে আর তোমার যেয়ে কাজ নেই।

এই এক সতর্কতা বাড়ির প্রবীণ মানুষটির সব সময়—রাস্তায় বাড়ির সবাই দাঁড়িয়ে দূরে তালগাছের নিচে মানুষের জটলা লক্ষ্য করছে—ওদিকে যাবার নিষেধাজ্ঞা জারি—সুতরাং মা জেঠি কাকিমা এবং কঙ্কন কেউ আর বেশি দূরে যেতে পারেনি। কেবল বাবা

বোধহয় সেখানে গেছেন। সাপে কাটা মড়া সে দেখেনি। কৌতূহল দেখায়। এই সঙ্গে ভয় ভীতি—একটা জ্যান্ত মানুষ সাপের ছোবলে মরে গেছে—এবং এই নিয়তি যে কার জন্য শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকে—কেউ জানে না।

এ তল্লাটে প্রায় কোন গাছপালা নেই, গাছের ছায়াও নেই। বেলা বাড়লে সারা মাঠে গনগনে উত্তাপ। জ্যৈষ্ঠ মাস গেল, বৃষ্টি নেই। কপিলকাকা দণ্ড নিয়ে পাইক খেলে সেদিন বৃষ্টি ঝড় দুই নামিয়েছে। ঝাড়ফুঁকে মানুষের বড় বিশ্বাস। লোকটার উপর বোধহয় এখন সেইসব ঝাড়ফুঁক চলবে।

তখন উষা দেখল তার দাদাটা কেমন ভালমানুষের মতো বাইরের উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে। কাল পার্বতী কত সেজেগুজে এসেছিল, তার দাদাটা যদি একবার পার্বতীকে দেখত। পার্বতী প্রথম শাড়ি পরে চুপি চুপি এসে জানালায় ডেকেছিল, সই। উষার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল দাদাকে বলে, জানিস দাদা পার্বতী এসেছিল, পার্বতীকে শাড়ি পরলে কী সুন্দর দেখায়! কিন্তু শত হলেও পার্বতী নারী, সেও। একজন পুরুষ মানুষের কাছে নারীর সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করার মধ্যে কোথায় যেন একটু বেহায়াপনা থাকে। পার্বতী টের না পেলেও সে পায়। তাই তার বলা হয়নি, অথচ আজ সকালে বনমালীকে সাপে কেটেছে খবরটা পাবার পরই কেমন সে-সব তুচ্ছ মনে হয়েছে তার। সে ডাকল, দাদা।

দিব্যেন্দু দেখল উষা রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাকে ডাকছে। ওখানটায় গিয়ে সে দাঁড়ালে জ্যাঠামশাই কিছু বলবে না। বাড়ির আর সবার উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়নি তিনি সেটা বোঝেন। কেবল সে কথার বার হয়ে গেছে। কারণ গতকাল যতই সে ললিতদার দোহাই দিক, আসলে সে যে জ্যাঠামশাইকে ছলনা করেছে তা বোধহয় টের পেয়ে গেছেন তিনি।

এমন সময় দেখা গেল কারা যেন এদিকটায় এগিয়ে আসছে।

তালগাছ কটা ঘেরির ও-পাশটায়। মাইলখানেক দূরে প্রায়। গোলাকার ঘেরির বাঁধ, তালগাছগুলো থেকে কিছুটা বেঁকে এদিকটায় আসার সময় অনেকটা জায়গা অদৃশ্য হয়ে থাকে। লোকগুলিকে সে-জন্য দিব্যেন্দু কিংবা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা অন্য কেউ আগে দেখতে পায়নি। কাছাকাছি আসতেই দেখা গেল কেমন ক্ষ্যাপা রমণীর মতো ফটকি বোনদি এদিকটায় লাঠি ভর করে ছুটে আসছে। দিব্যেন্দু দেখল, জ্যাঠামশাই এবার কেমন একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন। ফটকি বোনদি কাছে এসে প্রায় আছাড় খেয়ে পড়ল জ্যাঠামশাইয়ের পায়ের কাছে। হাউমাউ করে কাঁদতে থাকল আর কী সব বলতে থাকল যা দিব্যেন্দু একবর্ণ বুঝতে পারল না।

জ্যাঠামশাই, ফণীর বাবা এবং আরও দু-একজন এদিকটায় এতক্ষণে জড় হয়েছে। তারা বলাবলি করছিল, ওদিকটায় বনমালী কী করতে গেল!

এটা একটা প্রশ্ন। অত দূরে রাত-বিরেতে একা কেউ যায় না। গেলেও লণ্ঠন নিয়ে যায়। রাত-বিরেতে সাপখোপের ভয় বড় বেশি বলে কেউ লণ্ঠন ছাড়া চলে না। দু-সালও হয়নি ছিন্নমূল মানুষজন এখানটায় বাড়ি করতে শুরু করে। জমি জলের দরে। এবং বিশাল বিলেন অঞ্চল বলে, ঘেরি ছাড়া আবাদ করার সাহসই পায় না কেউ। তাছাড়া তালগাছগুলির নিচেই গো-মড়কের সময় সব গরু বাছুর নিয়ে সেখানে ফেলে রাখা হত। দিনমানে শকুনের ওড়াউড়ি—রাতে কর্কশ শব্দে কা কা কান্না ভয়ের উদ্রেক করে থাকে। বনমালী এমনিতেই ভীত মানুষ, যতটা জানে পার্বতীর দিকে নজর থাকলেও কাপুরুষের যা হয়ে থাকে, দূর থেকে দেখা, এটা-ওটার লোভে ফেলে দেওয়া—এ-ছাড়া তার আর কিছু করার সামর্থ্য ছিল না।

জ্যাঠামশাই বললেন, কাঁদলে হবে? যতীন ওঝা গেছে। ও কী বলছে!

কী বলবে রে ভাই। কিছু বলে না। শুইয়ে রেখেছে—মরেনি

বলছে' চুল টানলে খসে যাচ্ছে রে ভাই। আমার মরণ হয় না কেন! কেন তুই হাভাতের বেটা মরতে এলি। কপিল নির্ঘাত তলে-তলে কাজ সেরেছে রে ভাই। আমার কী হবে গ!

কপিলকাকার কথা আসছে কেন দিব্যেন্দু বুঝতে পারল না।

জ্যাঠামশাই এক ধমক লাগালেন, কপিলকে টানছো কেন! কপিল কি টেনে নিয়ে গেছে ওকে!

ওরে নাহে না। বুঝবি না। বলল, পিসি ঘুরে আসি। পার্বতীর দিবুদা বাড়ি ফেরেনি। দেখে আসি কী হল! পার্বতী বলল দেখে আসতে।

দিব্যেন্দু দেখল, জ্যাঠামশাই খুব গম্ভীর হয়ে গেছেন। চোখ ছোট হয়ে গেছে। শুধু কপিলকে জড়ানো নয়, তাঁকেও জড়াচ্ছে। কারণ দিব্যেন্দুর জন্য কিছু করা মানে উপেন রায়ের হয়ে করা। দিব্যেন্দু উপেন রায়ের ভাইপো। কথাটা যেন কটকি বোনদি মনে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। দিব্যেন্দু নিজেকে কেমন অপরাধী ভাবল। অপরাধের সঙ্গে শঙ্কা। তার বাড়ি ফিরতে দেরি হচ্ছে এমন চিন্তা-ভাবনা যা কিছু তার পরিবারের লোকজনের। পার্বতী তার কেউ হয় না। উবার সই। সে এখানে আসার আগে খুব আসত। সে আসার পরও আসে। তবে খুব কম। তাকে দেখলে সব সময় আড়ালে চলে যায়। শুধু একদিন, মেয়েটা তাকে তরমুজের রস খাইয়েছিল। সেদিন সে ফ্রক পরা মেয়ের মুখে দেখেছিল এক আশ্চর্য সারল্য—ঠিক প্রাণখোলা নয়, কেমন একটা উরাট ভাব। পার্বতী সেদিন তার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারেনি। এমন একটা উরাট বিলেন জায়গায় মানুষ কখনও ঘরবাড়ি বানায় সে ভাবতে পারত না। পার্বতীকে দেখে তার মনে হয়েছিল, যতটা নীরস এবং উরাট ভেবেছে, জায়গাটা ঠিক ততটা নয়। তারপর ললিতদাকে আবিষ্কার, কাল রাতে সাইকেলে হিজলের গভীর প্রান্তে চলে গিয়েছিল—কেমন সব রোমাঞ্চকর মনে হচ্ছিল—আজ সকালেই

আবার সব শুনে কেমন বিস্বাদ লাগছে। কি দরকার ছিল তোমার পার্বতী, বনমালীকে খুঁজতে পাঠানো। আমি কি ছোট আছি। আমার সঙ্গে তো ললিতদা ছিল। এগুলো বাড়াবাড়ি।

উপেন রায়ের মাথায় কেমন দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে। চোথ-মুখ দেখলেই টের পাওয়া যায়। পরনে খাটো ধুতি, খড়ম পায়, খালি গা। সারা শরীরে উপবীতখানা জ্বলজ্বল করছে। একবার কি ভেবে ফণীর বাবাকে কিছু বলতে গেল। ফের কি ভেবে বলল না। কটকি বোনদিকে বলল, তুমি যাও। কী করা যায় দেখছি।

আসলে এখন উপেন রায় কটকি বোনদির কাছ থেকে মুক্তি পেতে চায়। বিষয়টা বড় জটিল হয়ে যাচ্ছে যেন। এখানে তার শত্রুপক্ষ ইতিমধ্যে গজিয়ে গেছে। চিন্তাহরণ মল্লিক কোন একটা কলঙ্কে যদি দিবুকে জড়িয়ে দেয় তবে পরিবারের ইজ্জত নিয়ে টানাটানি। মনে মনে কপিলের উপর কেমন ক্ষেপে গেল। পার্বতীর উপর আরও বেশি। ফের ফণীর বাবাকে চোখের চশমা ঠিক করতে করতে বলল, আপনার কী মনে হয়, সাপে কেটেছে না অন্য কিছু।

সাপে কাটা। পায়ে কামড়েছে। দুটো দাঁত বসানো। বিন্দু বিন্দু রক্ত জমে আছে। যতীনও বলছে।

যতীন বলবে। ওঝা মানুষ। ওর এখন প্রচার দরকার। বেঁচে আছে কি নেই, সেটাও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। নিজে একবার যাবেন ভাবলেন। দেশ-ছাড়া হবার পর সব সময় পরিবারের সম্ভ্রান্ত চেহারাটা রক্ষা করার জন্য যত কম পারেন কোন ঝামেলায় জড়াতে চান না। কিন্তু এখন যা অবস্থা তাতে মনে হয়, তাঁর সেখানে না গিয়ে উপায় নেই। ঝাড়ফুঁকের আগে দেখা দরকার নাড়ি। যদি নাড়ি পাওয়া যায়, শহরের হাসপাতালে পাঠানোই ভাল। দিব্যেন্দুর দিকে তাকিয়ে বললেন, শুনলে তো! যাও। গিয়ে জেঠিকে বল একটা জামা দিতে।

দিব্যেন্দু যখন জামা নিতে বাড়ি ঢুকছে, তখনই ঊষা ফিসফিস করে বলল, দাদা কাল না পার্বতী এসেছিল।

এসছিল তো কী হল!

না, এই এমনি। কি সুন্দর শাড়ি পরে এসেছিল?

আমি কী করব তার জন্য।

না, তুই ছিলি না, পার্বতী কেমন…

থাম তো।

সবদিকেই উৎপাত। জ্যাঠামশায়ের জামা নিয়ে সে ছুটে গেল।

জামা গায় দিয়ে উপেন রায় বলল, চল আমার সঙ্গে।

কেমন একটা বিপদের আশঙ্কা ভেতরে গুরগুর করতে থাকল। যত রাগ তার এখন পার্বতীর উপর। যদিও তার বয়স খুব একটা বেশি না, জ্যাঠার কাছে সে ছেলেমানুষ, তবু যেন পার্বতীর এই আবেগ তার জন্য কোথায় একটা অস্বস্তির কাঁটা ফুটিয়ে রেখেছে। পার্বতীকে এখন সামনে পেলে যা ইচ্ছে বলে দিতে পারত। আজ পর্যন্ত সে পার্বতীর সঙ্গে একটা কথা বলেনি, এ বাড়িতে পার্বতী এলে বড় সংগোপনে আসে। ভীরু স্বভাবের মেয়ে। কপিলকাকার সংসারে পার্বতীই সব। এটা-ওটার দরকারে পার্বতীকে তাদের বাড়িতে আসতেই হয়। মাস দু-মাসের দেখা পার্বতী কেমন রহস্যময় চোখে কেবল মাঝে মাঝে তাকে দেখছে এই পর্যন্ত। দেশ ছাড়া সব মানুষ। আগেকার ঠিকুজি-কুষ্টি কেউ কারো জানে না। তবে কপিলকাকা গরীব মানুষ। দাঙ্গায় সর্বস্বান্ত হয়ে সে ভিটেমাটি ছেড়েছিল—পার্বতীকে নিয়ে ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরেছে। কপিলকাকা এ-সব খোলাখুলিই বলে বেড়ায়। এমনকি পার্বতী যে বড় হয়ে গেছে, ফ্রকে আর তাকে মানায় না, পার্বতী সব সময় একটা গামছায় চাদরের মত সারা শরীর ঢেকে রাখার চেষ্টা করে—তার চোখ এড়ায় না—এতে করে পার্বতীর প্রতি তার কোন আকর্ষণ থাকার কথা নয়—কেন যে তবু পার্বতী তার দিবুদা ফেরেনি বলে একটু এগিয়ে

দেখতে বলেছে বনমালীকে! বনমালীই বা কবে পার্বতীর এত বাধ্য
হয়ে গেল। এ-সব চিন্তা-ভাবনা তার মাথায় ঘোরাফেরা করছে।
জ্যাঠামশাই আগে, সে পেছনে, ফণীর বাবা, বগলা এমনকি হরেন
পর্যন্ত খবর পেয়ে সাপে কাটা রুগী—রুগী না মড়া দেখতে একটু পা
চালিয়েই হাঁটছিল।

এখানে আসার পর সে লক্ষ্য করেছে আজকাল ফণীর বাবা
প্রায়ই বিকেলে চলে আসেন। তামাক খান। তার পুষ্ট গোঁফ এবং
চালচলনে কিংবা কথাবার্তায় তারা যে ফেলনা লোক নয়, জ্যাঠার
কাছে বিস্তারিত বলতে ভালবাসেন। ফণীর দিদিকে সে ললিতদার
দোকানের পাশে প্রথম দেখেছে। গায়ের রং ফুটে বের হচ্ছে। বড়
বড় চোখ। আর সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার, বব কাটা চুল ফণীর
দিদির। একটা উদ্বাস্তু পল্লীতে এমন মেয়ে যে কোন মুহূর্তে যেন
আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। সে দূর থেকে দেখেছে। তার কাছে
যাবারও সাহস হয়নি।

তখন মনে হল, তালগাছের নিচ থেকে বনমালীকে কারা কাঁধে
তুলে নিয়ে এদিকটায় আসছে। কারা নিয়ে আসছে বোঝা যাচ্ছে না।
ফটকি ঠাকুমা লাঠি ভর করে হাঁটছে। কুঁজো মানুষ। বিড়বিড় করে
বকছে। কখনও হাউহাউ করে কাঁদছে।

এটা ঠিক—কার সঙ্গে কি সম্পর্ক এখনও যেন এখানে ঠিক
হয়নি। পার্বতী এই বৃদ্ধাকে ঠাকমা ডাকে। ঊষাও তাই ডাকে।
দিবুও সেরকম কিছু ডাকতে পারে। বৃদ্ধা, তার জ্যাঠাকে ভাইরে
বলে হাউমাউ করছে। যা বয়েস তাতে পিসির চেয়ে ঠাকমা গোছের
কিছু হলেই যেন ভাল হয়। বৃদ্ধাকে প্রায় তাদের সঙ্গে ছুটতে হচ্ছে।
দিবুর কষ্ট হচ্ছিল দেখে। বলল, ঠাকমা তুমি আর কী করতে
যাচ্ছ। ওরা তো এদিকে আসছে।

দিবু তার জ্যাঠাকেও থামতে বলতে পারত—কিন্তু সে সাহস
তার নেই। যতক্ষণ তিনি হাঁটবেন, তাকে হাঁটাতে হবে।

এই সময় যে মানুষটিকে কাছে পাওয়ার দরকার সে হল লিতদা। লালিতদার সঙ্গে সে গোপন কথা সহজেই বলতে পারে। ার অভিভাবকরা হয়ত ভাবে, ফনীর দিদিকে দেখলে তার কোন রামাঞ্চ বোধ করার কথা নয়। সে এতসব বোঝেই না। কিন্তু ঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে বলে, আজ প্রথম টের পেল, সেও বড় হয়ে গেছে। কান নারীর ভাল লাগার মধ্যেই থেকে যায় তার মঙ্গল-অমঙ্গলের শ্ন। বনমালী মরে গিয়ে তাকে ধরিয়ে দিয়ে গেল—পার্বতী তার গাপন প্রণয়ী। প্রণয়ী কথাটা ভাবতে গিয়ে কখন দিবুর চোখ-মুখ াল হয়ে গেল। পার্বতীকে সে এ-ভাবে কখনও ভাবেনি। তা-ড়া যেন কোথায় একটা অপরাধও থেকে যায় এইসব ভাবনার ধ্যে। সত্যি কথা বলতে কী তার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। কেন যে াকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে!

ফনীর বাবাই প্রথম কথাটা বলল, রায় মশাই ওরা তো এদিকেই াসছে দেখছি।

তাই।

মনে হয় মনসার থানে নিয়ে যাওয়া হবে।

লোকগুলি ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কেমন গা শিরশির ভাব দবুর। মরা মানুষ সে জীবনে খুব কম দেখেছে। সাপে কাটা গী সে দেখেইনি। এমন একটা শুমার মাঠে এবং খর রোদে কিংবা প্রচণ্ড দাবদাহে মা মনসার সন্তান-সন্ততিরা এমনিতেই ক্ষেপে থাকে—তার উপর কোথাকার সব লোক বানের জলের মতো ভেসে এসে তাদের চরে বেড়াবার জায়গা দখল করে নিচ্ছে। যেন এরা ফাঁকে-ফাকরে লুকিয়ে এই জবরদখলী মানুষগুলিকে মাঝে মধ্যে ছোবল মরে মনে করিয়ে দিতে চায়—কেন হে এলে এই অঞ্চলে। কালাভিপাত আমাদের—সেখানে কেন ঘর বাঁধলে।

কালাতিপাত কথাটাই দিবুর ভাবতে ভাল লাগল।

ঘেরির রাস্তা গোলাকার। আর না এগুলেও চলবে। কারণ

বগলা মরণ ললিতদাকে এখন মাঠের মধ্যে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। ওরা আড়াআড়ি মাঠ ভাঙছে। বনমালীর পা ঝুলছে, হাত ঝুলছে। জ্যাঠামশাই কী ভেবে আর এগুলেন না। দিবু ললিতদাকে ভিড়ের মধ্যে দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হল। এবং কেন যে মনে হয় ললিতদা থাকলে সে সব রকমের বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে যাবে।

কপিলকাকার বাড়িতে দিবু কাউকে দেখতে পেল না। এমনকি পটলও যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। গরুটা উঠোনে খোঁটায় বাঁধা। পার্বতী কোথায়! পার্বতী কী ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে আছে? একবার রাস্তা পার হয়ে বাড়িতে ঢুকে দেখার ইচ্ছে হল দিবুর। দেখা হলে যেন বলত, কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল! বনমালীকে তুমি পাঠালে, এখন অকারণ এই মৃত্যুর জন্য তুমি দায়ী হবে। আমাকে লোকে দায়ী করবে। জ্যাঠামশাই যে বেশ ফাঁপরে পড়ে গেছেন, দেখলেই টের পাওয়া যায়।

ফেরি থেকে সোজা নেমে হাঁটছিল ওরা। মনসার থানের দিকে যাচ্ছে। রাস্তায় পড়বে ললিতদার চায়ের দোকান। ওটা পার হলে আচার্যপাড়া। ক'ঘর মণ্ডল। তারপর আরম্ভ হয়েছে নতুন-পাড়া। ওখানেই থাকে ফণীর দিদি। যাবার সময় সে ফণীর দিদিকে দেখতে পাবে। মেয়েটাকে দেখার পরই এক প্রবল আকর্ষণ বোধ করছে দিবু। চোখ বড়। যেন চোখের ভেতর আশ্চর্য এক রূপকথার জগৎ গোপন করে রেখেছে। সেই জগৎ অনাবৃত ছিল সেদিন। এমন মায়াবী চোখ সে জীবনেও দেখেনি। বড় টানে। কিন্তু জানাজানি হয়ে যাবে—পার্বতী তার জন্য বনমালীকে মাঠে পাঠিয়েছিল। কেন পাঠায়! ফণীর দিদি বুঝবে, আগেই কেউ পাত পেতে বসে গেছে। তাকে উঠিয়ে সে বসে কী করে!

দিবুর নিজের উপরই রাগ বাড়ছিল। বনমালীকে সাপে কেটেছে, আর এ-সময় সে ফণীর দিদির কথা ভাবছে। ললিতদা

এবং অন্যান্যদের মতো তারও দরকার বনমালীকে তুলে মনসার থানে ফেলে রাখা। তাতো করছেই না, আর করবেই বা কী করে, জ্যাঠামশাই না বললে তার এক পা নড়বার অধিকার নেই।

ফটকি বোনদির দিকে তাকিয়ে একবার জ্যাঠামশাই শুধু বললেন, ওর বাড়িতে খবর পাঠিয়েছ?

গেছে। চিন্তাহরণ কর্তা লোক পাঠিয়ে দিয়েছে।

জ্যাঠামশাই ফণীর বাবাকে বললেন, চিন্তাহরণ দেখছি খুব কাজের লোক। ঠিক খবর পাঠিয়ে দিয়েছে।

মনসার থানে এখন বড় ভিড়। চিন্তাহরণ জ্যাঠামশাইকে দেখে এগিয়ে এল। চুল খাড়া লোকটার। জবা ফুলের মতো রঙ চোখের। চোখ কেমন ফুটে বের হচ্ছে। দেখলেই বোঝা যায়, কোথায় যেন রন্ধ্রপথের সন্ধান পেয়ে গেছে! কাছে এসে চিন্তাহরণ দীর্ঘশ্বাস নিল। তারপর মাঠের উপর বসে পড়ে বলল, শুনেছেন তো সব।

জ্যাঠামশাই বললেন, শুনেছি।

এ-সবের বিহিত করা দরকার।

তা দরকার। তিনি বুঝলেন এর মধ্যে পার্বতী, দিবু, ললিত, ফুলি এসে যায়।

ললিত দিবুকে এখন ডাকছে।

জ্যাঠামশায়ের দিকে দিবু একবার তাকাল। তিনি বললেন, যাও।

এই প্রথম সে একজন সাপে কাটা মড়া দেখছে। বেহুঁশের মতো পড়ে আছে বনমালী। চিত হয়ে, হাত-পা ছড়ানো নয়— কেমন শক্ত চোয়াড়ে। জ্যাঠামশাই চিন্তাহরণের সঙ্গে কী বলে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছেন। পাশে বসলেন, হাত তুলে নাড়ি দেখলেন। সবাই ঝুঁকে আছে। ললিতদা ভিড় ঠেলে দিয়ে বলছে, একটু হাওয়া খেলতে দাও। জ্যাঠামশাই হাত ছেড়ে দিলেন, গম্ভীর মুখে

বাইরে এসে দাঁড়ালেন। কপিলকাকা এবং বাবাকে কাছে ডেকে খুব আস্তে কিছু বললেন। ফণীর বাবাও শুনছে। কথাটা কী, চিন্তাহরণ এগিয়ে এসে বলল, যতীন শেকড়-বাকড় আনতে গেছে। দুধ চাই। কলা চাই। সব যোগাড়। আঃ কি যে কপাল, এই যে আঃ কি যে কপাল, এই যে ফটকি বোনদি, তুমি একবার কাছে গিয়ে বস। হা-হুতাশ এখন করার সময় নয়। পরে সময় পাবে। চিন্তাহরণের এমন কথাবার্তা জ্যাঠামশাইয়ের বুকে হুল ফোটালে দিবুর বুঝতে কেন জানি এতটুকু কষ্ট হল না।

জ্যাঠামশাই এবার ললিতদাকে ডাকলেন। ললিতদার প্রতি জ্যাঠামশায়ের কেমন যেন একটা নির্ভরতা আছে। কাছে গেলে বললেন, যতীন কোথায়?

যতীনকাকা আসছে বলে গেল।

ও দেখেছে?

দেখেছে।

কি বলল?

বলল, চেষ্টা করে দেখবে। বিষহরির কি ইচ্ছা কেউ না কি বলতে পারে না।

উপেন রায় কী যেন গোপন করে যাচ্ছেন। এখনই বলা ঠিক কিনা বুঝতে পারছেন না। সাপে কাটা মড়া সম্পর্কে তাঁরও কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। কিন্তু নাড়ি পাননি। বলতেও পারেন না, বনমালী মরে গেছে। অযথা যতীনের লম্ফঝম্প। হতেও পারে—বেহুলা লক্ষীন্দর, জরৎকারু মুনিপত্নী অথবা কোন দেবীমহিমায় বনমালী বেঁচে যেতে পারে। দেব-দেবীর কৃপায় সংসারে সব হয়, শস্য ফলে, জন্ম, মৃত্যু এবং আরও অনেক গ্রন্থি এই জগতের মধ্যে রয়ে গেছে তাঁরই ইচ্ছায়। তিনি বললেই, বনমালী মরে গেছে কেউ বিশ্বাস নাও করতে পারে। সাপে কাটা মড়া তো পোড়াবারও নিয়ম নয়। ভেলায় জলে ভাসিয়ে দাও—যেখানে গিয়ে ঠেকে।

কে জানে—কোন এক কালপুরুষ এসে না উদয় হয়। ওঝার বেশে সেই হয়তো আরোগ্যলাভে সাহায্য করতে পারে।

আসলে এই সুমার মাঠে বাড়িঘর বানাবার পরই উপেন রায় থেকে যেন সবাই প্রকৃতির লীলাখেলার বড় বেশি ক্রীতদাস হয়ে পড়েছেন। তিনি জোর করে বলতে পারলেন না, বনমালীকে নিয়ে বৃথা চেষ্টা।

কে একজন এসে বলল, যতীনকে নাকি মাঠের দিকে উলঙ্গ হয়ে চলে যেতে দেখেছে।

এগুলো হয়। তন্ত্র-মন্ত্র বলে কথা। মন্ত্রবলে মরা মানুষ জিয়ে ওঠে। সে গেছে শেকড়-বাকড় তুলতে। এখন নাকি ওদিকটায় যাবার কারও নিয়ম নেই। কেবল যতীন ওঝার বউ লাবণ্য লালপেড়ে শাড়ি পরে যতীনের গেরুয়া আলখেল্লা আর লুঙ্গি নিয়ে অপেক্ষা করবে। কাউকে সে ছোঁবে না। সকালে স্নান-টান সেরে বের হওয়া। জড়ি-বুটি নিয়ে সে এল বলে। লাবণ্যর হাতে শাঁখা নোয়া পর্যন্ত নেই। কপালে সিঁদুরের ফোঁটাও নেই। সব বন্ধনমুক্ত হয়ে নারী তার পুরুষের অপেক্ষায় থাকলেই মন্ত্রবল বাড়ে। এ-সব কথাবার্তা এখন ভিড়টায় হচ্ছে: মেয়ে-পুরুষ সবাই সাপে কাটা বনমালীকে এখন দেখার জন্য ঘেরির পাড় থেকে নেমে আসছে।

কেউ কেউ যতীন ওঝার শেকড়-বাকড় সংগ্রহের তরিকা আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখার চেষ্টা করছে। ওরা গোপনে অনেক দূরে দ্বারকার পাড়ে একজন মানুষের হাঁটাচলা লক্ষ্য করছে। কথাবার্তার ফাঁকে আহারে বনমালী তোর কি দরকার ছিল পিসির বাড়ি মরতে আসার—এমন সব কথার ফাঁকে চোখ তুলে দেখছে—হ্যাঁ একজন মানুষ ঝোপ জঙ্গলে হেঁটে যাচ্ছে। তার মাথা দেখা যাচ্ছে। কখনও পুরো শরীর। ঘেরির পাড়ে দাঁড়ালে যে-দিকের যে দৃশ্য তার সবটাই চোখে পড়ে। ধু ধু মাঠ, খড়ের জমি, মাঝে মাঝে কাঁটা গাছের জঙ্গল। খড়ের জমিতে ঢুকে গেলে মানুষটার কোমর অব্দি দেখা

যাচ্ছে। মানুষটা যে উলঙ্গ হয়ে ঘুরছে তা অবশ্য এতদূর থেকে কিছুই বোঝার উপায় নেই। দিব্যেন্দু, ললিত নিচে রয়েছে কিছুটা। মনসার থান ঘেরির মাথায় বলে বাঁ-দিকে তাকালে যতীন ওঝায় বউকে দেখা যাচ্ছে অনেক দূরে একা দাঁড়িয়ে। কেউ বলছে এখনও ফিরছে না কেন? কেউ ধমকে দিচ্ছে, ওদিকে তাকাচ্ছ কেন! সত্যি দিবু ভেবে পায় না, সেও একবার সেই অতি দূরে কোনো বনজঙ্গলের মধ্যে একজন মানুষকে দেখার চেষ্টা করেছে। যতীন ওঝা আশ্চর্য এক রহস্যময় পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে ফেলেছে সাপে কাটা বনমালীকে নিয়ে। কোত্থেকে একটা মশারি আনা হয়েছে, ললিতদা এখন চারপাশে চারটা দণ্ড পুঁতে বেঁধে দিচ্ছে মশারির দড়ি। তার নিচে ঢুকিয়ে দেবার সময় ললিত ডাকল, এই দিবু, আয় ধর।

কথাটা শুনে তার শরীরটা শিরশির করতে থাকল। ললিতদা এ-সব পারে। ফুলিদি দোকানে আছে ঠিক। এখানে নিয়ে আসতে সাহস পায়নি। কারণ ফুলিদি যতই মাথা ন্যাড়া করুক, পাজামা পাঞ্জাবি পরে থাকুক, চিন্তাহরণের চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। লোকটা পিশাচ লম্পট। এমন মনে হল দিবুর। না হলে ফুলিদির মতো নিরীহ গোবেচারি মেয়েটার উপর পাশবিক অত্যাচার করতে সাহস পায়! কেন জানি ওর ইচ্ছে হল, একে কেন সাপে খায় না! সে বলল, এই বগলাদা যাও না।

ললিত চোখ তুলে দিবুর এই ভীরুতাকে সামান্য হেসে কটাক্ষ করতে চাইল। যেন বলতে চাইল দিবুবাবু, এত ভয় পাও কেন। মানুষতো শেষে এই। তুমি আমি সবাই। খুবই খারাপ দেখাবে ভেবে দিবু ললিতদার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। চোখ খোলা স্থির। বনমালী দু-হাত ছড়িয়ে এখন যেন বিশ্ব সংসারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছে। যেন তাকে বলতে চাইছে, বোঝ দিবুবাবু মজা বোঝ। তোমাকে খুঁজতে গিয়ে প্রাণটা দিলাম।

দিবু ডাকল, ললিতদা—

ললিত কাছে এসে বলল, বনমালী বাঁচবে তো ?

যতীনকাকা দ্যাখ কি করতে পারে।

ওর বাপ-মা কখন আসবে।

রাত হবে।

আসলে দিবুর মধ্যে সেই সকাল থেকে চরম অস্বস্তি, বনমালীর অপঘাতের জন্য সে দায়ী। পার্বতী দায়ী। সে সহজভাবে চলাফেরা পর্যন্ত করতে পারছে না। কারো দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। চোখে চোখ পড়ে গেলেই সে বুঝতে পারছে দিবুকে তারা ভাল চোখে দেখছে না। তোমার এত কি দাম যে একটু দেরি করে ফেরায় বাড়িতে হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছিলে। তা নতুন জায়গা। প্রকৃতির কূট কামড় লেগেই আছে, তাই বলে পরের ছেলেটার জান নিয়ে এই যে লড়ালড়ি তার দামটা কে দেবে!

একবার মনে হল ললিতদার জন্যই এটা হল। ললিতদা তাকে না ফুসলালে যেত না! ছুলিদি ফেরার—সকালে ছুলিদি নেই চিন্তাহরণ রটিয়ে দিয়েছে, ছুলি তার সব সোনাদানা নিয়ে ভেগেছে—ছুলিদির উপর অপবাদের বোঝা চাপিয়ে লোকটা নিষ্কৃত পেতে চেয়েছিল। সে বিশ্বাসই করতে পারত না, এমন একজন প্রৌঢ় মানুষ শেষ বয়সে একটা কচি মেয়ের মাথা খাবার জন্য এত প্রলোভনে পড়ে যেতে পারে! ওর বাপটাও তেমনি—চিন্তাহরণের একটা ল্যাংবোট —আসলে মানুষ জলে পড়ে গেলে যা হয়! ছুলিকে মাঝখানে রেখে পাশা খেলতে বসেছিল। অকারণ ললিতের উপর তার যে ক্ষোভ সঞ্চার হয়েছিল, ছুলিদির অসহায় চোখ মুখ ভেসে উঠতেই তা আবার কেমন নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

তখন যতীন ওঝা নেমে আসছে। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। হাতে তামার বালা। পরনে গেরুয়া পোশাক। বগলে একটা বাক্স ওতে কি আছে সে জানে না। ললিতকে বলল, বগলে ওটা কি ?

বিষহরির পাথর। শেকড়-বাকড়ের রসে ভিজিয়ে খাওয়াবে।

আসলে এই জনপদে, একটা সাপে কাটা রুগী নিয়ে নানাভাবে কথা চাউর হয়ে যাচ্ছে। এটা হয়। গত সালেও খেয়েছে এক-জনকে। তখন থেকেই যতীন ওঝার তন্ত্র মন্ত্র, বিষহরির পাথর নিয়ে উদ্ভট সব কিস্সা ছড়িয়ে গিয়েছিল। ললিত এই নতুন জনপদের প্রথম দিককার মানুষ। সে সব জানে। মনসার থান চাই একটা। চালাঘরটা ছিল বেওয়ারিশ। ঘেরিতে বান বন্যায় কিংবা শুখা মরশুমে দূর দূর থেকে চলে আসত মাঠচরার দল। গরু মোষ সব সঙ্গে। মাসের পর মাস এই তৃণভূমিতে গরু চরাবার জন্য এই অস্থায়ী চালাঘর। ললিতরা জানে, মানুষের সঙ্গে লটকে থাকে মরণ। ওঝা বদ্যি সঙ্গে না রাখলে চলে না। ললিত, বগলা, মরণ এবং আরও সবাই মিলে থানটা করে দিয়েছিল। এ-সবে ললিতের বিশ্বাস কম। কিন্তু সে জানে বেঁচে থাকার জন্য এ-সবই মানুষের বল ভরসা। আসলে থানটা না থাকলে বিষহরির রাজত্বে নির্ভাবনায় বাস করা কঠিন। ললিত এটা বোঝে বলেই থানের জন্য বাঁশ বেত থেকে সব সে সংগ্রহ করে দিয়েছে। থানটার মধ্যে আছে একটা বড় পাথর। থানের পাশে যতীন ওঝা এনে লাগিয়েছে একটা পঞ্চবটী। গরু মোষের পেটে না যায়, কিংবা বান বন্যায় ভেসে না যায়, সে-জন্য মাটি ফেলে জায়গাটাকে উচু করা হয়েছে। শুভ কাজে এখন মানত পড়ে। রোগে ভোগে মানত পড়ে। যতীন ওঝা সারাদিন এখানটাতেই পড়ে থাকে। বিষহরির দোসর সে একজন— চলাফেরায় তার গর্জন শোনা যায়, জয় বিষহরি। লোকজন মানত দিতে এলে জয় বিষহরি। ধুতুরা ফুলের গাছ লাগিয়েছে। পেছনে কলা গাছ। চারপাশের কিছু জমি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাকে। নিঃসন্তান ওঝা মানুষটি এখন বড় গম্ভীর। সারা কপাল জুড়ে তেল সিঁদুরে মাখামাখি। দিবু মানুষটাকে দেখে বইয়ে পড়া কোনো কাপালিকের কথা ভাবল। মানুষজন সব দূরে সরে গেছে। থানের

চৌহদ্দির মধ্যে এ-সময় কারো থাকার নিয়ম নেই। যতীন একবার ত্রিশূল হাতে বের হয়ে আসছে, মশারিটার চারপাশে ঘুরছে, তার অজস্র বকাবকি—যার সঙ্গে এই অপঘাতের কি সম্পর্ক আছে দিবু বুঝতে পারে না। সে শুধু ভাবছিল, হে বনমালী তুমি ভাল হয়ে ওঠ। গা-মোচড় দিয়ে একবার উঠে বস। আমার পরিবারের লোকেরা তোমার অপঘাতের জন্য বড় চিন্তিত। তুমি একজন উটকো লোক—পার্বতীর টানে পিসির বাড়ি চলে আসতে। সেই পার্বতীই তোমাকে কাল দিয়ে খাওয়াল।

এ-সবের মধ্যেও দিবুর মধ্যে কি যেন উসখুস করছিল। তামাশা দেখার মতো অথবা নিদারুণ ভয় থেকে মানুষজন ছুটে এসেছে, উঁকি দিয়ে দেখে গেছে। শুধু এই নতুন আবাসের মানুষজনেরাই আসেনি। দূর দূর গাঁ থেকে লোকজন এসেছে খবর পেয়ে। যারা জঙ্গলের বিল ভেঙে গরুর গাড়িতে রাঢ় থেকে ধান বোঝাই গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল তারাও ছুটে এসেছে। কেবল সে দুজনকে দেখতে পেল না। ফণীর দিদি আর পার্বতীকে। ওরা কেউ আসেনি। বয়েসটা তার যেমনই হোক পাশের খবর এলেই সে সে রাজকলেজে সাইকেল ঠেঙিয়ে পড়তে যাবে—খবরের বেশি দেরিও নেই, তবু জানে, কেন জানি এই বয়সটা নারী সঙ্গ কামনা করে বড়। সে দাঁড়িয়েছিল যত না বনমালীর কি হয় কি না হয় দেখার জন্য তারচেয়ে বেশি প্রয়োজন তার ফণীর দিদিকে একবার দেখা। চোখ কি বলে! এই যে না দেখার মতো চুরি করে দেখার স্বভাব ফণীর দিদির সেটা তার বড় প্রিয়। এমন ডাকসাইটে একটা মেয়ে এই উদ্বাস্তু পল্লীতে এসে হাজির হয়েছে এবং ওর জন্যই যেন তার আর কোথাও যাওয়া চলবে না। সে যে এখানে এসে ললিতদার সহযোগী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে যেন একটা অছিলা। ফণীর দিদিকে সে দেখেছে, কি নাম জানে না। এই হয়। নতুন আবাসে এলেই খবর—যেমন সে আসার পর খবর হয়ে গিয়েছিল উপেন রায়ের সেই কৃতী ভাইপোটি হাজির।

কৃতী বলতে সে পড়াশোনায় মেধাবী। সব আবাসেরই অহংকার করার মতো কিছু দরকার হয়। সে সেই দরকারটা পুষিয়ে দিচ্ছে। উদ্বাস্তু বলে হেলা ফেলার মানুষ নয় তারা, তাদের গাঁ থেকেও একটা ছেলে সাইকেলে রাজকলেজে পড়তে যাবে। পরিবারের অহংকার, তাদের বাড়ি থেকে সে যায়—আবাসের অহংকার তাদের গাঁ থেকে সে যায়। এই একটা খবর ফণীর দিদির কাছেও পৌঁছে গেছে। সমবয়সী সে. না ছোট না বড় তাও জানে না। ফ্রক গায় দেয়। তবে বেমানান। পার্বতী ফ্রক গায় দেয় অভাবের তাড়নাতে। সে বোঝে বড় হয়ে গেছে—সেজন্য পার্বতী বাড়ির বাইরে গেলে একটা শুকনো গামছা গায়ে জড়িয়ে রাখে। ফণীর দিদি তাও করে না। যেন ফুটে বের হচ্ছে সব। তার মাথাটা কেমন করে সব চিন্তা করলে।

সে বসেছিল ছোট একটা টিলার মতো জায়গায়। বগলা, মরণ, ললিতদা এবং আবাসের সব যুবারা বসে আছে গোল হয়ে। আশে পাশে কোন গাছ নেই একটাও। খা খা রোদ্দুরে জ্বলছে সব এখন। চাষবাসে আজ কেউ নামেনি। কৃষিজীবী মানুষদের কাছে বনমালীর অপঘাত একটা বড় আতঙ্কের মত কাজ করছে। কঠিন মাটি ঘাস এবং খড়ের জঙ্গলে তেনারা সব ওৎ পেতে আছেন। বান বন্যা এলে ঘরে পর্যন্ত ঢুকে যায়। ইঁদুরের উপদ্রব বাড়ে। ঘরের মেঝেতে গর্ত দেখা দেয়। কখনও তার ফাঁকে বের হয়ে আসে পোড়া কেউটে, চাঁত অথবা কালো পানস। কখন কারে খায়। নিয়তি বড় মানুষকে টানে। কথাবার্তা এমনই হচ্ছিল সব। নিয়তিই টেনে নিয়ে গেছে বনমালীকে। পার্বতীকে শাপ-শাপান্ত করা ফটকি বোনদির ঠিক হচ্ছে না। এমনও কেউ মন্তব্য করছে। এর মধ্যে কি কটাক্ষ আছে দিবুর বুঝতে অসুবিধা হয় না। সে ক্রমেই আরও অবসন্ন হয়ে পড়ছে।

রোদে মাথার তালু ফাটার যোগাড়। দিবুর তাও খেয়াল নেই। সে সব দেখছিল শুধু। এমন সময় কঙ্কণ এসে ডাকল, দাদা বাড়ি আয়। জেঠিমা ডেকেছে।

এ-সময় একলা উঠে যাওয়াটা স্বার্থপরের মতো দেখাবে। সে ললিতদার দিকে তাকাল। ললিতদার মধ্যে কেমন একটা নেতৃত্ব দেবার অধিকার আছে। যেন ওর কথার উপর কোন কথা নেই। ললিত কী বুঝে বলল, বাড়িতে বলগে যাচ্ছে। কঙ্কণ চলে গেলে ললিত বলল, যা। বসে থেকে আর কী হবে। তোরাও যা। দুটো মুখে দেগা। যতীনকাকার কখন শেষ কথা শোনা যাবে কে জানে।

শেষ কথাটা কি হবে কেউ জানে না। শেষ কথাটা বলবে যতীন ওঝাই। পরে অবশ্য ওর আত্মীয়-স্বজন বেথুয়াডহরি থেকে এলে ঠিক করবে সেটাই শেষ কথা কি না! এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হবে কি না, কারণ দূর দূর থেকে তখন খবর আসতে শুরু করেছে—কোথাকার কোন ওঝা সাপে কাটা রুগী কতদিন পর ভাল করে তুলেছে। অদ্ভুত সব নাম। ওঝা তো নয় সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। যারা রাঢ় থেকে এসে ছিল তারা নাম করে গেল কারো কারো। এদের আবার নানা রকমের বায়নাক্কা। গেলেই যে হবে তেমন কোন কথা নেই—সে তার আর এক ওস্তাদের নাম করে বলতে পারে—সেখানে যাও তিনিই কালবিষ থেকে উদ্ধার করতে পারেন। মাচানে করে তখন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঠেলে তুলে নিয়ে যাওয়া। ললিত যেন এসবের জন্যই মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছে এবং দিবু ভাবল সেই সঙ্গে যদি তাকে যেতে হয়—পার্বতীর কী যে দরকার ছিল, সে নিমিত্তের ভাগী হয়ে থাকল।

ওঠার মুখে দেখল দিবু ললিতদার কাকীমা নেমে আসছে। হাতে পেতলের পরাত। যতীন ওঝার সিধা নিয়ে যাচ্ছে থানে। পেছনে আরও সব বাড়ির নারী পুরুষ। বাড়ি বাড়ি থেকে থানে এটা দিতে হয়। এতে বিষহরির ক্ষোভ কমে। যে দেয় সে বাঁচে—তাঁর পরিবারের সবাই বিষহরির ক্ষোভ থেকে রক্ষা পায়। পরাতে চাল ডাল তেল নুন আলু। কেউ দিয়েছে দুখানা পটল হলুদ। একজন মানুষের পেট ভরে খেতে যা লাগে তাই। যতীন ওঝার বউ সেই

মতো থানের পাথরের পাশে বসে আছে। বড় গামলা সাজানো। ওতেই যে-যারটা ঢেলে দিয়ে সাপে কাটা বনমালীর চারপাশে প্রদক্ষিণ করে থানে গড়াগড়ি দেবে। এবং তখনই চিৎকার উঠবে. জয় বিষহরি, জয় জরৎকারু মুনিপত্নী, জয় আস্তিকস্য মুনির্মাতা—এমন সব হল্লার মধ্যে প্রাণের তাগিদে এই কৃষিজীবী মানুষরা প্রকৃতির তাবৎ ক্ষোভ থেকে রক্ষা পেতে চাইবে।

দিবু বাড়ি এসে দেখল, জ্যাঠামশাই ঠাকুরঘরে। একটা পশমের আসনে শিরদাঁড়া সোজা করে বসে আছেন। ধূপ দীপ জ্বলছে. তামার টাটে ফুল তিল তুলসী আতপ চাল হরিতকী। কাঠের সিংহাসনে তামার পাত্রে শালগ্রামশিলা। পাশে কষ্টিপাথরের কালো বালগোপাল। চোখ দুটো রূপোয় বাঁধানো। আজ হয়তো জ্যাঠামশাই ঠাকুরঘরে একটু বেশি সময় থাকবেন। তাঁর ধারণা, বেঁচে থাকার জন্য এই দেবতার অনুগ্রহ বড় দরকার। তাঁর পূজা-আর্চায় কোন খুঁত থাকলে রোষে পড়ে যেতে পারেন। হয়তো আজ পরিবারের সবার কল্যাণে তিনি একশো আটটা তুলসীপাতা শালগ্রামশিলার মাথায় চাপাবেন।

এ-সবের মধ্যে বড় হয়ে ওঠার একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে। কপিলকাকা এই সেদিন বিপদনাশিনীর ব্রত করল বাড়িতে। মা পূজার বাতাসা কপালে মাথায় ঠেকিয়ে হাতে দিয়েছে। কেন জানি তার এ-সবে বিশ্বাস কম। সে হয়তো হাতে দিলে, মাথায় না ঠেকিয়েই মুখে ফেলে দেবে, সেই আশঙ্কায় মা তার হয়ে করণীয় কাণ্ডটুকু আগেই করে দিয়েছে। সে শুধু বলেছিল, তুমি যে কি কর না মা।

মা এমনিতেই কম কথা বলে। কেমন ভীরু স্বভাবের রমণী। বাড়িতে তার গলা পাওয়া যায় না। কারণ জ্যাঠামশাই আছেন। কোন কারণে ভাশুর ঠাকুরের কানে গেলে তিনি ক্ষুব্ধ হবেন! সংসারের

এই সব নিয়মনীতির মধ্যে সে যেন বড় রকমের একটা শৃঙ্খলা বিরাজ করছে টের পায়। কাকীমা অবশ্য এতটা মানে না। তাকে মাঝে মাঝে দেখা যায় ঘোমটা ছাড়া—এ-বাড়ির পক্ষে এটা যে কত বেমানান কাকীমা যদি বুঝত! এমন একটা বাড়ির ছেলে হয়ে সে কি করে যে পার্বতীর হয়ে কথা বলবে বুঝতে পারে না। পটল এসে সকালেই নাকি খবর দিয়ে গেছে, ওর দিদিকে রাতে তার বাবা মেরেছে।

কেন মারল!

পটল অত সব বোঝে না। সে গড়গড় করে বলে গেছে মাকে, জেঠিকে। ওদের এ সব শোনারও উৎসাহ যে কেন এত। পার্বতী নাকি কাল চুরি করে তার মা'র শাড়ি পরেছিল; কপিলকাকা সেই শুনে ক্ষেপে গেছে? পার্বতী আলতা পরেছিল, পাউডার মেখেছে মুখে। আলতা পাউডার কে দিয়েছে এমন প্রশ্ন করতেই পার্বতী বাপের মুখের উপর জবাব দিয়েছে। এতেই ক্ষেপে গিয়েছিল কপিল-কাকা। বনমালী দিয়েছে। সেই বাউণ্ডুলে ছোঁড়াটা! বাড়ির আনাচে-কানাচে লুকিয়ে থেকে যে নাকি পার্বতীর বড় হওয়া দেখত কিংবা পার্বতী যে বড় হয়ে গেছে, এটা নাকি সেই প্রথম টের পায়। একজন বালিকার পক্ষে সত্যি এটা বড় খবর। বনমালীর উপর জোর খাটাবার সাহসও পার্বতী সেই থেকে বুঝি পেয়েছে।

সে খুব অন্যমনস্ক ছিল। বাড়িতে এসেও কারো সঙ্গে কোন কথা বলেনি। কেবল জেঠি বলেছে, তুমি স্নান করে ঘরে ঢুকবে। উষা বাইরে এসে তাকে তেল দিয়েছে। এটা কেন সে বুঝতে পারে না। কেবল উষা তেল দেবার সময় বলেছে, জানিস দাদা, বনমালী মরে গেছে। বাবা এসে স্নান করেছে। ছোঁয়াছুঁয়ি থেকে সেও বাদ যায়নি, উষার আলগাভাবে তেল হাতে ঢেলে দেওয়া দেখেই এটা বুঝতে পারে। সে কিছু বলল না। সাপে কাটা রুগীর মৃত্যু নিয়ে নাকি কোনো কথা বলা যায় না। বিষে রক্ত ঠাণ্ডা মেরে যায়। নাড়ি

থমকে থাকতে পার! তেমন ওঝার পাল্লায় পড়লে নাড়ি যে কথা বলবে না কে জানে।

একটা গামছাও ঊষা ছুঁড়ে দিয়ে গেল। গামছাটা কাঁধে ফেলে সে ঘেরির তালানিতে চান করতে নেমে গেল। একবার ইচ্ছে হল, উঁকি দিয়ে দেখে পার্বতী কী করছে! সে রাস্তা থেকেই ফটকি ঠাকমার শাপশাপান্ত শুনতে পাচ্ছে। মাঝে মাঝে বিলাপ। বড় কর্কশ গলার স্বর। এমন কোমরভাঙা জরাগ্রস্ত রমণীর গলায় এত জোর না শুনলে বিশ্বাস করা যায় না। একবার যেন শুনতে পেল, ওলোরগতরখাকি তর কোন দেবতা আছে রে। কেন আমার বনমালীরে পাঠালি রে। সে তর কোন চুলোয় জল ঢেলেছে রে!

দিব্যেন্দু কথাগুলি শুনে আরও কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। অশ্রাব্য গালিগালাজ বুড়ির—পার্বতীর সঙ্গে তাকেও জড়াচ্ছে। এমন গগন-বিদারি কটুবাক্য রাস্তার মানুষজনও শুনছে। হরেনটা ঘোরাঘুরি করছে। হরেন জানেই না, তার নিখোঁজ মেয়েটিকে ললিতদা এনে তার চায়ের দোকানে তুলেছে। ফুলিদি তার এত সখের লম্বা গোছা গোছা চুল কত অনায়াসে বাড়ি থেকে পালাবার সময় তালগাছের নিচে কেটে ফেলে দিয়ে গেছিল। যেন মনে মনে সে আর নারী থাকতে রাজি নয়। পুরুষের বেশে সে পালিয়েছিল, এখনও ললিতদা তাকে সেই বেশে রেখেছে। বুদ্ধিটা দিব্যেন্দুই দিয়েছিল। দিয়েছিল এই জন্য যে, ফুলিদির প্রতি ললিতদার দুর্বলতা টের পেতে তার সময় লাগেনি। ললিতদার টান না থাকলে, তাকে নিয়ে রাজকলেজে যাবে বলে বের হত না! সে বুঝল, এই যে বুড়ি বিলাপের মাঝে মাঝে আশ্রাব্য গালিগালাজ দিচ্ছে পার্বতীকে তা যেন ঠাণ্ডা করতে পারে একমাত্র ললিতদা। কেমন একটা প্যাঁচের মধ্যে পড়ে গেছে ললিতদাও। ললিতদার মুখ দেখেই কাল টের পেয়েছিল, এত ঝড় ঝুঁকি সে নিতে সাহস পাচ্ছে না। চিন্তাহরণের মত ধড়িবাজ লোকের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠা দায়। চিন্তাহরণ হরেনকে পাঠিয়েছে

ফটকি ঠাকমার কাছে। দেখাশোনা বুড়ির বুঝি এখন হরেনই করবে। আসলে সব জেনে নেওয়া। উপেন রায়ের বাড়িতে যে লীলাখেলা গোপনে চলছে সেটা তার সবটা জানা দরকার। সরকারী ডোল জ্যাঠামশায় নেননি। নানা কারচুপি আছে জেনেই নিতে অস্বীকার করেছেন। চিন্তাহরণ তার জ্যাঠামশাইকে জব্দ করার কৌশল খুঁজছে। আর জ্যাঠামশাইও যেন সবটা আঁচ করতে পেরেছেন। ললিতদার জিম্মায় তাকে একা রেখে আসার সময় থেকেই সে টের পেয়েছে বনমালীকে নিয়ে একটা ঘোরালো চটকদার কেচ্ছা বানাবার তালে আছে লোকটা. জ্যাঠামশাইয়ের এতে মাথা কাটা যাবে ভেবে তার মনটা আরও দমে গেল। পার্বতীর জন্য যে আবেগ বোধ করছিল—কেন এটা যে হয়—সেই দুটো নিরীহ চোখ কেবল ভাসে। মা নেই বলে বড় যেন অসহায় মেয়েটা।

স্নান খাওয়া শেষে দিবু কী করবে বুঝতে পারল না। আবার মনসার থানে যাবে, না বাড়িতেই থাকবে এ-সব প্রশ্ন যখন মনে দানা বাঁধছে, তখন সে দেখল জ্যাঠামশাই তাঁর ঘরে খাবার পর আসন করছেন। রোজকার অভ্যাস। দিবু তার মাচানে এসে বসল। এখনও ঘরে ঘরে তক্তপোশ হয়নি। বাঁশের মাচান করে কাজ চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে। মাটিতে কেউ ভয়ে শোয় না। মাথার উপর দিয়ে সাপ-খোপ কখন তেড়ে যাবে কে জানে! এমনকি সন্ধ্যা হলে উঠোনেও একটা হারিকেন জ্বালিয়ে রাখা হয়। কোন খড়কুটো ধরতে গেলে বেশ সতর্ক হয়ে ধরতে হয়। বছর দুইও যায়নি, দু-দুজনকে সাপে কাটল। —এটাই ত্রাসের সঞ্চার করেছে সবার মধ্যে; আর এ-সময়ই মনে হল, ফণা তুলে আছে আরও কেউ। ফাঁক পেলেই ছোবল বসাবে। চিন্তাহরণকে সে দেখল একটা বিষধর সাপ হয়ে গেছে। যেন এ-বাড়ির আনাচে-কানাচে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাপটাকে গলায় ফাঁস পরিয়ে আটকে রাখা দরকার। সে কেমন ছুটে বের হয়ে গেল ঘর থেকে।

সে সোজা গেল ললিতদার কাছে। খর রোদ্দুর গনগনে আঁচের মত সুমার মাঠটা যেন জ্বলছে। জমি আবার রুখা হয়ে উঠছে। ঝড়-বৃষ্টিতে যে মাটি ঠাণ্ডা হয়েছিল, ক'দিনের তাপে তা আর নেই। সে মনসার থানে গিয়ে অবাক। কেউ ঘেরির টিলায় বসে নেই। এমনকি সে যতীন ওঝাকেও দেখতে পেল না। থানের গামলায় যে সিধা পড়েছিল, তাও তুলে নিয়ে গেছে কেউ। এতটা হেঁটে এসে শুধু সে দেখল, মশারিটা সেইভাবে টানানো। চারপাশে চারটা দণ্ড। চিন্তাহরণ মল্লিকের বাড়ির উঠোনে শুধু জটলা। এখানে আসার পর একবারও সে চিন্তাহরণের বাড়ির দিকে যায়নি। লোকটাকে সে কেন জানি সহ্য করতে পারে না। ললিতদাও যায় না। এক কথা তার। বড় আইনবাজ লোক। কোর্ট-কাছারি মামলা-মোকদ্দমা ছাড়া লোকটা থাকতে পারে না। তারপর ছুলিদিকে বাজারসাহুর জঙ্গলের কাছে আবিষ্কারের পর সে বুঝতে পেরেছে রটনা মিথ্যা নয়। সেই থেকে বলতে গেলে লোকটাকে সে ঘৃণা করতে শুধু করেছে।

মশারির নিচে একজন মানুষ; তবে মরে পড়ে আছে। তার কেমন দিন-দুপুরেও ভয় ধরে গেল। মশারির বাইরে একটা হাত বের হয়ে আছে। দিবুর মনে হল, বনমালী আসলে তার দিকে হাত বাড়িয়ে আছে। পারলে ছুটত—কিন্তু এক অসহায় চিন্তা ভাবনার শিকার এটা, অন্য কেউ টের পাক সে চায় না। যেমন খানিকটা নেমে এসেছিল, তেমনি খানিকটা উঠে ললিতদার চায়ের দোকানের দিকে হাঁটা দিল। সেখানে গেলে ছুলিদি বলল, ললিতদা ফেরেনি।

সে দোকারের ভেতর ঢুকে গেল। বাঁশের মাচান, তার উপর হোগলা বিছানো। ছুলিদি ভেতরের দিকে আড়াল করা একটা ঝাঁপের পাশে থাকে। ছুলিদি একবার মুখ বাড়িয়ে বলল, বনমালীকে নাকি ছেড়ে দিয়েছে!

কে ছাড়ল!

যতীন ওঝা।

তার মানে?

বনমালীর কালবিষ নামবে না বলেছে।

জ্যাঠামশাইয়ের কথাই তবে ঠিক। বনমালী মরে গেছে! জ্যাঠামশাই তো সবাইকে বলতে পারতেন ডেকে—কিছু লাভ হবে না। এখন গঙ্গায় নিয়ে যাও। কিন্তু কেন এমন চুপ মেরে গেলেন সে বুঝতে পারছে না।

দিবু মাচানে হেলান দিয়ে প্রায় শুয়ে পড়েছিল, এবারে উঠে বসল। বলল, তাহলে কি হবে ছুলিদি!

ছুলিদি তাকে তরল গলায় বলল, তোমার দাদার কি ইচ্ছে দেখ।

আচ্ছা ছুলিদি, বনমালী মরে গেলে আর তাকে নিয়ে এদিক-ওদিক যাবার কি অর্থ।

সাপে কাটা রুগী মরে গেছে বলতে হয় না। বেহুলা লক্ষ্মীন্দরের গল্প শোননি! পদ্মপুরাণ শোননি।

আসলে দিবু যেন চায়, যা ঘটে খুব তাড়াতাড়ি ঘটে যাক। বনমালী মরে গেছে, তাকে নিয়ে আর যতীন ওঝা কিংবা অন্য কারো বিষহরির নামে তঞ্চকতা সে চায় না। আসলে যেন সবটাই চিন্তা-হরণের কাজ। সে-ই ধরে রাখতে চায়। দ্বিতীয়বার বিয়ের ইচ্ছের কথা জানাজানি হয়ে গেছে সেটা চিন্তাহরণ বোঝে। এই নিয়ে মাথা কাটা গেছে এমন ভাববার কারণ নেই—কারণ লোকটার দাপট দেখলে তা বোঝাই যাবে না। ছুলিদি মাথা পাতেনি, ছুলিদি শেষ পর্যন্ত চিন্তাহরণের আশ্রয় ছেড়ে ভেগেছে, এটা যেমন সে ও ললিতদা বোঝে, তেমনি চিন্তাহরণও বোঝে। তবু মামলার নাম করে থানায় যাবে বলে সবাইকে তড়পেছে। এখন এই আবাসে ছুলির কথা হয়তো আর কারো মনেই নেই। বনমালীর কালে খাওয়া নিয়ে সব বাড়িঘরে জল্পনা চলছে। এটা যতক্ষণ চলবে ততক্ষণ পার্বতী জড়িয়ে থাকবে, সে জড়িয়ে থাকবে। পার্বতীকে নিয়ে এক ধরনের নির্যাতন চলবে

আড়ালে। বনমালী সরে গেলেই এই নতুন আবাস আবার তার স্বাভাবিক মর্জিতে ফিরে আসবে।

তখনই সে গলা খাঁকারি পেল। ঠিক, ললিতদা ফিরেছে। ফেরির রাস্তা থেকে নেমে আসছে। এবং সঙ্গে নিশ্চয় কেউ আছে। যেন ছুলিদিকে সতর্ক করে দেওয়া। তুমি মেয়ে যতই পুরুষের বেশে থাক, তোমার চোখ-মুখ দেখলে কেউ টের পেতেই পারে তুমি নারী। ললিতদা কোন কারণেই ঝুঁকি নেবে না। বনমালীর কেলেঙ্কারিটা কেটে গেলেই ইচ্ছে আছে সবার সামনে ছুলিদিকে হাজির করা। ললিতদা ক'দিন সময় চেয়েছে। যতই ছিন্নমূল হোক মানুষের তো শেষ পর্যন্ত একটা মান-সম্মান নিয়ে বাঁচতেই হয়। চিন্তাহরণ যে বাড়িতে ত্রিনাথের মেলা বসিয়ে ছুলিদিকে খাবলাতে গেছিল সেটা কোন কারণেই প্রকাশ করা চলবে না। অথচ চিন্তাহরণের নির্যাতনে মেয়েটা ভেবেছিল—এটা প্রমাণ করা দরকার।

দোকানে ঢুকে ললিত দেখল, দিবু বাঁশে হেলান দিয়ে বসে আছে। দিবুকে দেখে সে অবাক হয় না। কারণ দোকানে কেউ না থাকলেও দিবু মাচানে এসে বসতে পারে। পাশে তার কাঠের একখানা ক্যাশ বাক্স। প্রায় সময় আলগাই থাকে। আজও আছে। দিবুর কিছু ভাল না লাগলে এখানটায় চলে আসে। এই আবাসভূমির পাঁচ-সাত মাইলের মধ্যে কোন লোকালয় নেই। দিনভর গরুর গাড়ি আসে রাঢ় থেকে। যায় সাঁটুই, তারপর গঙ্গা পার হয়ে বেলডাঙ্গা এবং আরও সব দূর দূর জায়গায়। তারাই খদ্দের। চারপাশটা সবসময় নিঝুম। মনে হয় কোন বনবাসে সবাই চলে এসেছে। এই দোকানটা আছে বলে দিবু যেন কেমন এক বড় মুক্তির স্বাদ পায়।

সে বলল, শুনেছিস দিবু?

আমি আর কিছু শুনতে চাই না। বল তোমরা কখন বনমালীকে নিয়ে যাবে?

কোথায় নিয়ে যাব?

সে জানি না। লোকটা মরে গিয়ে কত লোককে যে ভয় পাইয়ে দিয়েছে।

দিবু আসল কথাটাই জানে না। জানলে আরও ঘাবড়ে যাবে। সে বলল, বেথুয়াডহরি থেকে ওর আত্মীয়স্বজন না আসা পর্যন্ত আমরা চাই বনমালী থানে পড়ে থাকুক।

থাকুক না। আমার কি! সে এবারে যেন ললিতদার ভয় দেখানোকে তোয়াক্কা করল না।

ছুলি শুনছ?

তোমার সঙ্গে আর কেউ আসেনি?

কেন আসবে?

তবে গলা খাঁকারি দিলে কেন?

কেমন অভ্যাস হয়ে গেছে।

ছুলি পর্দার আড়াল থেকে বের হয়ে এল। মাথার চুল তেমনি কাগে ঠোকরানো। এক-রাত এই ঝাঁপের ওপাশে ছুলিদি ললিতদার সঙ্গে রাত কাটিয়েছে। সব মানুষ যে সমান নয়, এত সুযোগ থাকতেও ললিতদা রাতে তাকে খাবলাতে যায়নি, তাতে সে বোধহয় মানুষ সম্পর্কে আবার বিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে।

ছুলি বলল, কিছু বলবে?

না বলছিলাম. দিবুবাবুর ভাগ্য। কত লোকের যে প্রাণ কাঁদে দিবুবাবুর জন্য। ফণীর দিদিটাও আড়চোখে কাল বাবুকে দেখে গেছে। তোমাকে দেখে সুন্দরীরা মাথা ঠিক রাখতে পারছে না।

কী যা তা বলছ সবার সামনে!

আরে ছুলি আমাদের ফ্রেণ্ড। কী বলিস ছুলি। আমরা যাই হই চিন্তাহরণের চেয়ে খারাপ লোক নই।

ছুলির মুখটা কালো হয়ে গেল।

ললিত বুঝল সে এটা বলে ভাল কাজ করেনি। চিন্তাহরণের নামে মেয়েটার মধ্যে কেমন ত্রাসের সঞ্চার হয়। সে ফের বলল, আরে

না, ও কিছু না, এমনি বললাম। চিন্তাহরণ যতীনকে ডাকিয়ে বলেছে, তুমি একটা মড়াকে নিয়ে শালা ছলচাতুরী খেলছ। বেলা পড়ে আসছে—তোমার ভেলকি বুঝি না? এখন বলছ, নেই, ভেতরে পাখি নেই। উড়ে গেছে। তারে থান থেকে তুলে নেনগে।

দিবু বলল, ঠিকই বলেছে, থানে ফেলে রাখতে দেবে কেন!

দেবে কেন মানে! কোথায় তবে রাখা হবে। কার বাড়িতে!

কেন, ফটকি ঠাকমার ভাইপো—বলতে গিয়ে মনে হল, পার্বতীর একেবারে চোখের সামনে হয়ে যাবে। পার্বতী আর ফটকি ঠাকমার বাড়ি লাগালাগি। জলের টানাটানির সময় পার্বতীই ফটকি বুড়িকে জল যুগিয়েছে। বনমালী তো উটকো লোক। হঠাৎ হঠাৎ উদয় হত পার্বতীর টানে।

ফটকি বুড়ি রাখবে না!

কেন! এত বিলাপ করছে ভাইপোর নামে। বাড়িতে রাখবে না কেন!

থানে আছে থানে থাকবে। বনমালীর বাবা কাকারা এসে যা হয় করবে। ঠাকুরের থান, বিষহরি যদি পড়ে থাকতে থাকতে এক সময় কৃপা করেন।

বুড়ি তো খুব সেয়ানা!

আরে কথা বুঝিস না। সাপে কাটা মড়াকে কার বাড়িতে ঢুকতে দেয়! রাস্তায় রাখা যায় না। রাস্তার পাশের বাড়ি মানবে কেন। হৈ চৈ করবে না? একটা সাপে কাটা লোক পড়ে থাকলে সে বাড়ির মানুষজনের মাথা ঠিক থাকে? ভাগাড়েও দেওয়া যায় না, বনমালী তো মরেনি!

দিবুর মনে হল, বনমালী ব্যাটা আচ্ছা বিপদে ফেলেছে সবাইকে। গঙ্গাতেও নিয়ে যাওয়া যায় না। কার হুকুমে নেবে। সে যে বেঁচে নেই তার প্রমাণ কি! এতো আর রোগে ভুগে মরেনি। কালদেবতা খেয়েছে। খুশি হয়ে প্রাণটা আবার ফিরিয়েও দিতে পারে।

লক্ষ্মীন্দরের যখন জীবন ফিরে পাওয়া গেছে তখন বনমালীর কেন পাওয়া যাবে না।

এই অকাট্য যুক্তির বলে বনমালীকে পুড়িয়ে না দেওয়া পর্যন্ত সে বেঁচে আছে—আর নদীর জলে ভেলাতে ভাসিয়ে দিলে তো কথাই নেই। চিরকালের জন্য বনমালী ব্যাটা অমর হয়ে থাকবে। কে জানে কোথায় কোন সাধুবাবার সাক্ষাৎ মিলে যাবে, বলবে ব্যাটা ওঠ, ভেলায় করে আর কত ভেসে বেড়াবি। সঙ্গে বেহুলা থাকলে একটা প্রমাণ পাওয়া যেত, সে আবার ফিরে আসত ভিটায়। কিন্তু আপাতত বেহুলা পাওয়া যাচ্ছে না। কপিলকাকা সকাল থেকে শাসাচ্ছে পার্বতীকে। পার্বতী নাকি একটা কথাও বলছে না। গুম হয়ে বসে আছে। এ-সব জানাজানি হয়ে যায়—কারণ পটলের কাজই হচ্ছে তার দিদিকে বাবা বকাঝকা করলে তা উষাকে এসে বলা। কারণ পটল জানে, তার দিদির দুঃখ যদি কেউ বোঝে, সে উষা। সমবয়সী। একবার উষা নিজে গিয়েও সেধেছে—কিন্তু নড়াতে পারেনি। কপিলকাকা নিজেও মুখে দেয়নি কিছু। কখন বনমালী এসেছিল, আর কখনই বা পার্বতী বনমালীকে একটু এগিয়ে দেখার জন্য বলেছিল, কপিলকাকা শত জেরা করেও জবাব পায়নি।

ললিতদা বলল, বোস তুই। স্নান করে দুটো মুখে দি আগে। পরে বলছি।

দিবুর ভেতরটা ছটফট করছে। শুনেছিস দিবু! কী শুনতে হবে! ললিতদা আসল কথাটা বলছে না। অথচ এমনভাবে এসে বলেছে যে পিলে চমকে যাবার মত। বাড়িতে বাবা জ্যাঠা সবাইকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। পার্বতী না বলে যদি ফটকি বুড়ি বলত, কিংবা অন্য কেউ, কোন দোষের ছিল না। পার্বতী বলেই যত গণ্ডগোলের মধ্যে ফেলে দিয়েছে তাকে। সে কেমন অধীর হয়ে বলল, বলবে তো!

কী বলব!

এই যে এসে বললে, শুনেছিস দিবু! আর কিছু বললে না। না। আমার আর তোমার মজা করা ভাল লাগছে না। মন ভাল নেই।

তোর আবার মন খারাপ কেন? তোকে কেউ ছোবল মারেনি তো!

ইয়ার্কি রাখ ললিতদা! আমার সত্যি কিছু ভাল লাগছে না।

ললিত দিবুর প্রতি কেমন সস্নেহ দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল। জলপানি পাওয়া ছেলে। ম্যাট্রিকেও জলপানি পাবে। এই একটা গর্ব তার। সে একটা যাত্রাগানের পালা লিখবে ভেবেছে। দিবুকে দিয়ে পরে ঠিকঠাক করিয়ে নেবে। দিবু জানে কত। সে বলল, আগে খাই। দুটো মুখে দিতে দে। কি দুলি কী রাঁধলি বাড়লি। ডিম ভাজা করেছিস?

দুলি আবার ওপাশ থেকে বলল, করেছি।

আর একটা কর। দিবুবাবু খাবে আমার সঙ্গে।

না, আমি খেয়ে এসেছি।

পেট ভরে খাওনি। পেট ভরে না খেলে খুঁজবে কি করে।

তার মানে?

মানে গভীর দিবুবাবু। বদলা নিতে চায়।

কিসের বদলা?

এই তোমার জ্যাঠা উপেন রায় যে বংশ-গৌরব করে না, সততা, শৃঙ্খলার কথা বলে না, তার খেতায় আগুন দিতে চায়।

কে? কে সে?

জান বোঝ; আমার মুখ থেকে আবার জেনে নিতে চাও— এই তো।

দিবু বলল, এত সহজ না।

খুব সহজ। চিন্তাহরণকে তুমি চেন না। তুমি তো এই সেদিন এখানে এসে উঠলে। তোমার জ্যাঠা চেনে, আমরা আরও বেশি

চিনি। বুঝতে পারছ না, কারো বাড়িতে টিনের ছাউনি নেই। কিন্তু চিন্তাহরণের বাড়িতে আছে। এগুলো এমনিতে হয় না। কী খরচপত্রের বহর—চায়ের কেটলি বসানোই থাকে। তুমি যখন যাবে চা পাবে। কোত্থেকে আসে। হিসাবে পাকা বুঝলে না। আবাসে একটাই কাঁটা, আর তা হলে তোমরা। আবাসের লোকেরা তোমাদের আলাদা চোখে দেখে। তোমার জ্যাঠা দেশে যা রেখে এসেছিলেন, এখানেও সেটার চলন রাখতে চান। সে হতে দেবে কেন?

দিবু শুনতে শুনতে কেমন গভীর অতলে ডুবে যাচ্ছিল। ওর চোখ এমনিতেই বড়, ললিতদার কথা শুনে চোখ দুটো তার যেন আরও হাঁ হয়ে গেল।

ললিত বলল, খুব ঘাবড়ে গেছ শুনে?

না, মানে!

মানে চিন্তাহরণ তার সাঙ্গোপাঙ্গদের বুঝিয়েছে, যার পরামর্শে বনমালী কালের পেটে গেল, সেখানেই লাশ রেখে দেওয়া দরকার। দায় তাদের। আমরা থানে মড়া ফেলে দায় রাখব কেন!

দিবু নড়ে-চড়ে বসল। বাঁশে হেলান দিয়ে আর স্বস্তি পাচ্ছে না। সে বলল, এই যে শুনলাম যতীন ওঝাকে শাসিয়েছে—থানে থাকবে না তো কোথায় থাকবে।

দুষ্টু লোকের মতি স্থির থাকে না জানিস! সকালে একরকম বিকেলে আর একরকম। মাথার মধ্যে পোকা থাকলে যা হয়। বলে ললিত এক দৌড়ে নেবে গেল। দুটো ডুব দিয়ে উঠে এল ঘেরির তলানি থেকে। তারপর গামছা চিপে দড়িতে মেলে দিল। লুঙ্গি পরে খালি গায়ে খেতে বসে গেল। দুজনের মধ্যে আর কোন কথা নেই। কথা দিবুও যেন আর জানতে চায় না। সে বুঝে নিয়েছে, চিন্তাহরণের সাঙ্গোপাঙ্গরা বনমালীকে এখন মাচায় করে তাদের বাড়ির সামনে ফেলে রেখে যাবে। ভয়ে তার কেমন গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। কারণ সে বুঝেছে, কালের ঘরে তারা না পাঠালেও

তাদের ছেলে দিবুর খোঁজে বনমালী কালের পেটে গেছে। দিবু ললিতদার খাওয়া দেখছিল। গোগ্রাসে খাচ্ছে। ডিমভাজা ডাল। কাঁচা লঙ্কা গ্রাসের সঙ্গে কামড়ে খাচ্ছে। হুস-হাস শব্দ হচ্ছিল। ললিতদার কাকা শাড়ি কাপড়ের ফেরি করে। ললিতদা কাকার কাছ থেকে আলাদা, রাস্তার মোড়ে চায়ের দোকান, মাচান, কেটলি উনুন ডেকচি, একজন মানুষের জন্য যা যা দরকার সব আছে। ছুলিদি বাড়তি, খরচ বেড়েছে মানুষটার। বোধহয় ললিতদা আর আগের মতো নেই—চিন্তা-ভাবনা বেড়েছে। পরের ভাল করার চেয়ে নিজের দিকটা দেখার তাগিদ বেড়েছে। দিবুর ভাল-মন্দ নিয়ে তার যেন আর কোন আকর্ষণ নেই। সে মাচান থেকে নেমে বলল, যাই। দেখি জ্যাঠামশাই জানে কি না।

বোস। গিয়ে কী করবি। বনমালীকে কপিলকাকার বাড়িতে ফেলে রাখার মতলব আঁটছে চিন্তাহরণ।

তালে আমাদের বাড়িতে না! সে কেমন উৎফুল্ল হয়ে উঠে বিষয়টা নিয়ে ফের ভাবতে গিয়ে মাথা গরম করে ফেলল, দেখি কি করে রাখে!

কোথায় তবে রাখবে বল। মাঠে? সব বাড়ি থেকে দেখা যায়। থানে? সব বাড়ি থেকে দেখা যায়। তালগাছগুলোর নিচে! ফেলে রাখলেই সাবাড়। ঝাঁকে ঝাঁকে শকুন বসে থাকে মাথায়। একটা জ্যান্ত লোককে শকুন দিয়ে খাওয়ালে ওর বাবা কাকারা ছাড়বে? গ্রামসুদ্ধ পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে না!

জ্যান্ত বলছ কেন! যতীন ওঝা তো বলেছে, আর কোন আশা নেই, পাখি উড়ে গেছে।

ও বললেই হল। মানবে কেন! সাপের লেখা বাঘের দেখা কপালে না থাকলে হয় না। বাঘে খেলে সাবাড় হয়, সাপে খেলে লক্ষ্মীন্দর হয়। শাস্ত্র জানিস না? বিষ বেহ্মতালুতে জমা হয়ে আছে। বেহ্মতালু তো বুঝিস। আমার চেয়ে তোর কত বেশি

বিছে। ওটা হল গে মানুষের একখানা পাত্র—ঝেড়ে নামাতে পারলে কাল দেখবি বনমালী গলায় রুমাল বেঁধে পার্বতীকে আবার শিস দিচ্ছে।

দিব্যেন্দু বুঝল. ললিতদার হয়ে গেছে। অথচ গতকাল ছুলিদিকে খুঁজতে না গেলে এই অপবাদের বোঝা পার্বতী কিংবা তাকে বইতে হত না। কেন যে গেল! এখন ললিতদা হাত ধুয়ে মুছে ফেলতে চায়।

সে বাইরে বের হয়ে এলে ললিতদা হাসল।—দিবুবাবু গেলে হবে! তোমার হাতটা দেখি। ব্যথা বেদনা নেই তো। আর্নিকা খেয়েছ?

ছুলি এ-কথায় একটু সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। ললিত যে-ভাবে কথা বলছে, যেন দিবুর হাতের ক্ষতস্থানের কথা মনে ক'রিয়ে দিয়ে বলতে চায়, মানুষ হচ্ছে হারামের জাত। নাহলে কাল যে তুমি ছুলিকে ধরে আনতে গেলে সেই কামড়ে দিল, আজ ছুলি একবার তোমাকে বলেছে, দিবুবাবু হাতটা ভাল আছে তো? কিছু বলেনি। বলে না। নিজে ভাল থাকলে আর কে ভাল থাকল না থাকল আসে যায় না! মানুষের এটা হচ্ছে মূল স্বভাব।

দিবু জানে. ললিতদা পার্টি করে। এই নিয়ে চিন্তাহরণ জ্যাঠা-মশায়কে নালিশও দিয়েছে। এই একটা উটকো লোক—বোঝলেন না, ছোটবড় জ্ঞানগম্যি নেই। কারে কি বলতে হয় জানে না। দিবুকে ওর সঙ্গে মিশতে দেবেন না। মাথাটি খাবে। মানুষের হাতের পাঁচটা আঙুল সমান করতে চায়। বলেন, কি মস্ত বড় কারিগর। আরে প্রকৃতির মধ্যে দেখিস না, গাছ ছোটবড় হয়, নদীর জল এক খাতে বয় না। কখনও বর্ষা, কখনও খরা। শীত গ্রীষ্ম আছে—বলেন সব এক হয় কি করে। বামুন কায়েত নম সব এক হয় কি করে! বেটা নমর বাচ্চার বাড় দেখেছেন!

দিবু তবু এই মানুষটাকে এই নতুন আবাসে সব চাইতে প্রিয়সঙ্গী

মনে করে। রেজাল্ট বের হলে হয়তো ললিতদাই রাজ কলেজে নিয়ে যাবে ভর্তি করাতে--কিন্তু বনমালীটা একি ঝামেলা বাধাল! মরেও না মরে বেটা, এ কেমন বৈরী।

তাই বলে কপিলকাকার বাড়িতে!

বাড়িতে রাখবে কেন! রাস্তার ধারে ফেলে রাখবে। ওর বাড়ি থেকে কেউ না আসা পর্যন্ত সেখানে থাকবে।

কপিলকাকার বাড়ি এবং তাদের বাড়ি খুব কাছাকাছি। মাঝে ফাঁকা জমিন কিছুটা। সেখানে বাবা কলার চাষ করছেন। ওটা পার হলেই পার্বতীদের বাড়ি। তারপর ফটকি বুড়ির ঘর। একখানা চালা। কয়েক কাঠা ভুঁই এই সম্বল করে এখানে এসে কপিল-কাকার সঙ্গেই উঠেছে। সবাই যখন তাকে দেশে ফেলে আসছিল, তখন কপিলকাকাই বলেছিল- গাঁ সুদ্ধু চলে যাচ্ছে, তুমি একা থেকে কি মরবে!

দিবু অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে ললিত বুঝতে পেরে কেমন মজা উপভোগের মতো তাকে দেখছে। এক ফাঁকে মুখ মুছে ফের গামছাটা বাঁশে ঝুলিয়ে রাখল। ভেতরে গলা বাড়িয়ে বলল, ছুলি খেয়ে নে। বসে থাকিস না। আমি এক্ষুনি আবার বের হব। ছুলি বাইরে বের হতে পারে না বলেই এক বালতি স্নানের জলও নিয়ে এসেছিল ললিত। মগে ছুলির জল ঢালার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল।

কী যে ফেরে পড়ে গেল দিব্যেন্দু! যেতেও পারছে না। এমন একটা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে—সাপে কাটা বনমালী মাচানে চিৎপাত হয়ে পড়ে থাকবে—একটা মরা মানুষই বলা চলে, হাত-পা শক্ত, মুখ হাঁ করা; চোয়াড়ে চেহারার বনমালীর চোখ স্থির—ঘরের বার হলেই দৃশ্যটা চোখে পড়বে। একটা মরা কুকুর বেড়াল বাড়ির পাশে পড়ে থাকলে অস্বস্তি হয়—আর এতো একজন চেনা মানুষ। সেই সঙ্গে মনে করিয়ে দেওয়া, তোমরা এর নিয়তিকে

ডেকে এনেছ। এখন তোমরাই সামলাও। চিন্তাহরণের কূট বুদ্ধির কাছে তার জ্যাঠামশায় কত অসহায়—লোকটাকে খুন করতে পারলে যেন তার সব অসহিষ্ণুতা কেটে যেত।

সহসা ললিত বলল, দিবুবাবু এর নাম ভালবাসা। কত রকমের যে কামড় মানুষের, বেচারা বনমালী সত্যি পার্বতীকে ভালবাসত। পার্বতী তোমাকে।

কী বলছ যা তা?

কিছু গোপন থাকে না জান। উঠতি বয়সে হয়। রক্ত টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছে তোমার পার্বতীর। তোমরা টের পাও না!

না আমি টের পাই না। কিছু টের পাই না। তোমরা আমাকে মিথ্যা জড়াচ্ছ। আমাকে, পার্বতীকে। আমার জ্যাঠামশায় কি ভাববেন। কেমন অসহায় বালকের মতো দিব্যেন্দু ভয়ে কেলেঙ্কারির আশঙ্কায় কেঁদে ফেলল।

দিবুবাবু শক্ত হও। তোমার কোন দোষ দিচ্ছি না। পার্বতীরও না। পাশাপাশি থাকলে হয়। এটাই সরল সত্য। তুমি ভাবছ এতটুকুন ছেলে প্রেম করলে দোষের। না না, দোষের না। তোমার তো ষোল পার হয়ে গেছে। তোমার গোঁফ উঠে গেছে। তুমি নিজেকে যত ছোট ভাব, তোমার জ্যাঠামশায় তোমাকে যত ছেলেমানুষ ভাবেন, তুমি তা নও। পার্বতীর কাছে তুমি রোমিও। রোমিও জুলিয়েট নাম শোননি? কে যেন লিখেছেন। আমি একটা এর বাংলা বই পড়েছি। তবে সেখানে দুইজনই জানত দুজনকে। তোমরা দুজন অন্ধকারে হাতড়াচ্ছ। বংশ গৌরব সম্পর্কে সব সময় একটা লাঠি খাড়া করে রেখেছেন তোমার সামনে। তোমার জ্যাঠামশায়, দেশ ভাগ হবার পর সব ছেড়ে আসতে পেরেছেন, এটা পারেননি। পারবেন। সময় লাগবে। তুমি পার্বতীকে ভালবাসলে, তোমার বংশের মর্যাদা নষ্ট। এই ভয়টাই বেশি কাজ করছে।

কত স্বপ্ন তোমার সামনে পার্বতীর একটাই স্বপ্ন। সে তোমাকে ছাড়া কিছু বোঝে না।

ললিতদাকে এত গুছিয়ে কথা বলতে সে কোনদিন দেখেনি। ললিতদা ওর হাত চেপে ধরে আছে। ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করছে। বলছে, বোস। ঠিক সময়ে সব হবে। তবে একটা কথা বলে রাখি, সত্যকে সত্য বলে জেনো। তুলিকে যে এনে তুলেছি—সত্যকে সত্য বলে জানব এই ভেবে। তুলিকে নাবালিকা ভেবো না। ওটা চিন্তাহরণের কারসাজি। কারণ অসহায় হরেনটাকে আশ্রয় খাদ্য সব যোগাচ্ছে। শুধু তুলিকে হাত করার লোভে। বাঘের মুখ থেকে শিকার পালিয়েছে, বুঝতে পারছ দিবুবাবু। কই আমি তো ভেঙে পড়ছি না। আমি তো সবই আগের মতো করে যাচ্ছি। তুমি লেখাপড়া জানা ছেলে, জলপানি পাওয়া ছেলে, এ-শিক্ষাটা হয়নি কেন?

দিব্যেন্দু কিছু বলতে পারছে না, যে ভীরুতা তার মধ্যে এতক্ষণ প্রবল প্রতিক্রিয়ায় তোলপাড় করছিল, ললিতদার কথা শুনে তা যেন খানিকটা প্রশমিত হয়েছে। সে বলল, ললিতদা পার্বতীর এ-সব কথা আমি জানি না। সত্যি বলছি, তুমি বিশ্বাস কর। কাল নাকি পার্বতী ওর মার শাড়ি পরে আমাদের বাড়ি এসেছিল। পায়ে আলতা, মুখে পাউডার। উষা বলল, জানিস দাদা পার্বতীকে না কী সুন্দর দেখাচ্ছিল!

তবে বোঝ। বলে হা হা করে হেসে দিল। তুই বুঝলি একটা মুখ্যু। তোর কিছু হবে না। পার্বতী এত সেজে কার জন্য এয়েছিল বল। কাকে দেখাতে এয়েছিল বল!

কিন্তু!

এই কিন্তুটা ছাড়।

না মানে পার্বতী……

হ্যাঁ জানি। পার্বতীর এটা আস্পর্ধা। কিন্তু দিবুবাবু তুমি বোঝ না, ব্যাপারটা কত নির্মল, কত পবিত্র।

আলতা নাকি বনমালী এনে দিয়েছিল। পাউডারও। বনমালীকে যদি না ভালবাসে, ওর দেওয়া আলতা পাউডার সে নিল কেন?

কত গরীব কপিলকাকা। জমি চাষ করে কোদাল মেরে। হাল দেবার পর্যন্ত টাকা থাকে না হাতে। মেয়েটা ঘর থেকে বের হতে চায় না। সে তো জানে বড় হয়ে গেছে। ফ্রকে আর মানায় না। দেখ—সামনে তাকাও।

দিব্যেন্দু সামনে তাকাল।

কী দেখছ! কী উদাস প্রকৃতি! খাঁ খাঁ করছে। দুটো একটা তালগাছ বাদে কিছু চোখে পড়ে না। আর দূরে সবুজ বনটা। রুক্ষতা আর এই সবুজ বনভূমি দুই প্রকৃতির লীলা। পার্বতী চায় সে তোমার কাছে একটা সবুজ বনভূমির মত বাঁচুক। প্রকৃতির রুক্ষতা উলঙ্গপনা সে চায় না। তুমি তাকে অবহেলা কোরো না।

দিব্যেন্দুর ভেতরে অস্বাস্থ্যর কাঁটা ফুটছে। সে যেন আর আগের দিব্যেন্দু নেই। জ্যাঠামশায় যার হয়ে গর্ব করে বলতে পারেন, দিবু আমার বংশের নাম রাখবে সে এখন বেইমানি করছে। পার্বতী তাকে গোপনে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে চায়। পার্বতী তাকে নষ্ট করে দিতে চায়।

সে নষ্ট কথাটাই ভাবল। শৈশব থেকে এ সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনা এলেই তার মনে হত, এ-সব নষ্ট চরিত্রের লক্ষণ। সে যতটা পারত তার থেকে দূরে সরে থাকতে চেয়েছে। পার্বতী কিংবা ফণীর দিদি এরা তার মাথা ঘোরাক না কেন, তার কাছে এটা সুস্থতার লক্ষণ বলে মনে হয় না।

ফণীর দিদিকে দেখার পর গোপনে সে কত খারাপ চিন্তা করেছে। তার রাতে ভাল ঘুম হয়নি পর্যন্ত। চোখ জ্বালা করছিল। শরীরে কেমন জ্বরজ্বর ভাব। নিজের সঙ্গে নিজের এই নষ্ট খেলা এবার বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়ল। বড় লজ্জার। তারপর বনমালীকে যদি সত্যি পার্বতীদের বাড়ির পাশে এনে রেখে দেয় জ্যাঠামশায় হয়তো

ঘর থেকেই বের হবেন না। তার সঙ্গে পার্বতীর গোপন সম্পর্কটা তাঁর ভেতর কাঁটা হয়ে বিঁধে আছে। কোন মুখে তিনি বের হয়ে বাধা দেবেন!

দিবু এবার তার হাত প্রায় জোর করে ছাড়িয়ে নিল। বলল, ছাড়। আমার কিচ্ছু ভাল লাগছে না। বাড়িতে গিয়ে খবরটা দিতে হবে।

তুই দিবি কেন দিবু। ওটা এমনিতেই চাউর হয়ে গেছে। তোর জ্যাঠামশায় জানে না ভাবছিস কেন। সকালের দিকে বনমালীকে নিয়ে ঘরে ঘরে কী হা-হুতাশ! আহা রে বাবা মার কি অবস্থা না জানি এখন! আসলে কি জানিস, মানুষ পরের অমঙ্গলে নিজের অমঙ্গলের কথা ভাবে। ভাববারই কথা। এই হিজল বিলে এসে সবাই উঠেছে। উরাট জমি—চাষ আবাদ বলতে এই বেরি। আর সব খড়ের মাঠ, কাটা গাছ। সাপ-খোপের এটা বড় একটা আস্তানা। সবাই বড় ত্রাসের মধ্যে থাকে। বনমালীকে নিয়ে তারা সেই ত্রাসে পড়ে গিয়েছিল। আর যত বেলা পড়ে আসছে, তত ভাবনা, এই সাপে কাটা বনমালীটাকে কোথায় ফেলে রাখা হবে। সবাই এখন ভাবছে তার বাড়ি থেকে না দেখা গেলেই হল।

তারপর নিজেই দিব্যেন্দুর হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, ঠিক আছে যা। বাড়ি যা। আমি দেখছি কী করতে পারি। তখনই ওরা দেখল একটা মাচা কাঁধে করে কারা বেরির রাস্তা ধরে এদিকে আসছে। ললিত বলল, ঐ দ্যাখ। আসছে।

দিবুর মুখ শুকিয়ে গেছে। সে বলল, খবর তো সেই সকালে গেল। ওর বাড়ির লোকরা কখন আসবে!

সন্ধ্যা সাতটায় গাড়ি। স্টেশন থেকে পাঁচ ক্রোশ। এতটা পথ হাঁটতে হবে। গাড়ি লেট হলে রাত কাবার হয়ে যেতে পারে।

হঠাৎ কি হল কে জানে। ললিত কিছু না বলে ছুটতে থাকল। সে রাস্তা ধরে গেল না। আড়াআড়ি মনসার থানের দিকে উঠে

যাচ্ছে জমি ভেঙে। হাল দেওয়া জমি। শক্ত চাঙড় হয়ে আছে মাটি। খালি পায়ে ললিতদা তা মাড়িয়ে দৌড়ে যাচ্ছে। এবং সে দেখল, যারা মাচা কাঁধে নিয়ে আসছে, তাদের সামনে ললিতদা পথ আগলে দাঁড়াল। এতদূর থেকে কিছু বোঝাও যাচ্ছে না। বগলা মরণ কিংবা আরও যারা আছে সবাই চিন্তাহরণকে তোয়াজ করে চলে। ক্যাশ ডোল কে পাবে না পাবে সে ঠিক করে। বাড়ি-ঘরের ঋণ কে পাবে না পাবে সব চিন্তাহরণের হাতে। সরকারী বাবুর সঙ্গে তার দহরম মহরম। চিন্তাহরণ ইচ্ছে করলে ভিটায় ঘুঘু চরাতে পারে—সেই ভয়েও কিছু লোক তাকে ঘাঁটায় না। ললিতদা কেন পারবে এদের সঙ্গে!

ছুলিও বাইরে বের হয়ে আসছে। দিবু বাদে, কেউ নেই। সে বের হতেই পারে। সেও অবাক হয়ে গেছে! বলল, ললিতদা ছুটে গেল কেন দিবু?

জানি না। কেন যে গেল!

তারপর দিবু দেখল মাচাটা নিয়ে আবার তারা ফিরে যাচ্ছে। এবং একসময় ধানের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল। তবে কি ললিতদা খোদ শয়তানের আব্যসেই ওটা রেখে আসতে গেছে? ললিতদাকে চিন্তাহরণ সবসময় এড়িয়ে চলে শুনেছে। ললিতদা সম্পর্কে যত অপবাদ সে-ই ছড়িয়েছে। এই চায়ের দোকানটা নাকি হেলগুলানের মাথা খাচ্ছে। ওটা তুলে দেবার জন্য একবার গ্রাম-সভাও ডেকেছিল। তার আগেই ললিতদা গোপনে শাসিয়ে এসেছিল, ঠাকুর তোমার বাড়িঘরে শেষে তুমি পুড়ে মরে থাকবে। আমি একা মানুষ। মনে রেখ সংসারে আমার পিছু টান নেই। পেছনে লাগলে তোমাকে তাজা পুড়িয়ে মারব। আমি গেলে তুমি বাদ থাকবে না। তারপর আর গ্রাম-সভা বসাতে সাহস পায়নি। ললিতদা পারে। ললিতদার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার চোখ কেমন জলে ভার হয়ে গেল। এবং ললিতদা যখন ফিরে এল, তখন তার কী

হাহাকার হাসি। দিবুকে ডাকছিল, এই এদিকে আয়। শোন। ওকে ঘেরির উপরে তুলে নিয়ে গিয়ে বলল, চুপসে গেছে। বলে এসেছি, থামচেছ, দাগ ফাগ আমার সব দেখা হয়ে গেছে। বেশি ঝামেলা বনমালীকে নিয়ে বাধালে সব ঠাকুর ফাঁস করে দেব। তুলিকে তুমি শালা কী করেছ ? বুড়া হাবড়া, ক'দিন বাদে মরবে, এখনও লোভের খেতায় আগুন দিতে পারলে না।

তুমি বলতে পারলে !

আরে সবার সামনে বলি। ভাল মানুষের মত ডাকলাম, কাকা কথা আছে। তারপর খুব ফিসফিস গলায় আমি যে তার যমঠাকুর চিনিয়ে দিলাম। গাঁয়ে বাস করবে, আর যমকে ভয় পাবে না! বেটা সাপের ফণা তুলতে গেলে ফের এক ঝটকা, কাঁদির বড়বাবু সব জানে বলে এয়েছি।

এসব তো কিছুই হয়নি।

শোন, শয়তানের সঙ্গে শয়তানি করতে হয়। লোনের টাকা চুরি-চামারি করছিস কর। টিনের চাল দিয়ে ঘর বানিয়েছিস বানা, তাই বলে মানুষের ইজ্জত নিয়ে টানাটানি করতে পারিস না।

কেমন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মত অবস্থা দিবুর। সে তবু নিঃসংশয় হতে পারছে না। বলল, কোথায় রাখা হবে ঠিক হল ?

দ্বারকার পাড়ে। কাঁদির রাস্তাটা যেখানে বাঁক খেয়েছে সেখানে

কেউ থাকবে না সেখানে !

থাকলে থাকবে, না থাকলে থাকবে না। তাতে তোর আমার কি। তুই জানিস বনমালী টেঁসে গেছে, আমিও জানি টেঁসে গেছে, বলেছি, শিয়রে একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে রাখতে হবে। যেন বনমালীর বাপ কাকারা রাতে এলে আমরা আলো দেখে অন্ধকারে চিনে যেতে পারি। শেয়ালে কুকুরে না খায় সে জন্যও আলোর দরকার।

রাজী হয়েছে ?

হবে না। মোক্ষম দাওয়াই ঝেড়ে এসেছি। তুলিকে নিয়ে ওর আর ট্যাঁ-ফু করতে হবে না।

দিবু কিছুটা হাল্কা মনেই বাড়ি ফিরে আসতে পারল। আর এসেই শুনল, কপিলকাকা পার্বতীকে খুন করবে বলে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কপিলকাকার বড় চণ্ড রাগ। সে জানে। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আবার মেয়ের জন্য বসে কাঁদতে শুরু করবে।

উষা বলল, জানিস দাদা, কাল না কপিলকাকা পার্বতীকে মারার পরই কাঁসার থালা বন্দক দিয়ে একটা শাড়ি কিনে এনেছে। সে জানে এই হচ্ছে কপিলকাকা। খুন করা ছাড়া কথা বলে না। হাতে মুগুর। পার্বতীকে তখন পালিয়ে বেড়াতে হয়। ভয়ে মেয়েটার মুখ সাদা হয়ে যায়।

তখন কপিল তার দাওয়ায় বাঁশে হেলান দিয়ে অসহায় মানুষের মত বসেছিল। পটল বাবার পাশে দাঁড়িয়ে—দিদি কোথায় চলে গেছে। বাবা তার সেই সকাল থেকে দিদিকে হেনস্থা করছিল। দিদিটা যে তার কেমন! কিছুতেই খেল না। চুপচাপ বসেছিল। যতবার বাবা বলেছে, তুই থানে যাবি না, গেলে মাথা ভেঙে দেব, তত কেমন ঘাড় গোঁজ করে কথাগুলি শুনেছে। জবাব দেয়নি।

কপিল দেখল গরুটা আজ বের করা হয়নি। বাছুরটা ছাড়া। সকালে ছাড়া থাকলে যা হয়, একফোঁটা দুধ দোয়াতে পারেনি। তখনও বিষয়টা মাথায় আসেনি। পার্বতী বনমালীর অপঘাতের খবর পাবার পরই বসে পড়েছিল। তারপর কথাটা চাউর হয়ে গেছে। কপিল রাগে ফুঁসছিল। তুই মেয়ে বড় হচ্ছিস, গরীব মানুষের মেয়ে তুই, তোর মনে মনে এই ছিল। কুলটা তুই!

কী যে করবে বুঝতে পারছে না। পটলের দিকে তাকিয়ে বলল, যা একবার দিবুদের বাড়ি, গিয়ে দেখ যদি উষার কাছে থাকে।

পটল এই নিয়ে তিনবার গেল। এসে আগের মতই বলল, না দিদি যায়নি।

কোথায় গেল তবে!

সে ডাকল ফের, পার্বতী। হাতে যে মুগুরটা ছিল, যা দিয়ে সে সংকল্প নিয়েছিল পার্বতীর মাথা ফাটাবে, সেটা এখন নিরীহ গোবেচারার মতো বারান্দায় পড়ে আছে। সকাল থেকেই সে শাসাচ্ছিল, কিছু বললে বলবি জানি না। থানে গেলে খুন করব।

কিছুটা কী পার্বতী বোঝে। সে বলেছিল, পাঠিয়েছ বলেছি। বারান্দার বসে আছে। তুমি নেই। যদি তুমি এসে দেখতে পাও বসে আছে, আস্ত রাখবে না। তাই বলেছি। আমার কি দোষ। আমি মিছে বলতে পারব না!

কপিল হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিল, কী বললি, আমার ইজ্জত নাই। তোর মাথা খারাপ। তুই কবি তুই জানিস না।

যত কপিল জোর করছে কথাটা নিয়ে তত পার্বতী ক্ষেপে গেছে। সে বোঝে না, এই যে মানুষটাকে সাপে কাটল, মানুষটাকে নিয়ে রাতে সে স্বপ্ন পর্যন্ত দেখেছে, দিবুদা তার কাছে আকাশের নক্ষত্রের মতো, সে তাকে ছুঁতে পারে না, শুধু দেখতে পারে—কিন্তু বনমালীকে ছোঁয়া যায়। বয়সের গাছ-পাথর না থাক, মানুষটার মন ছিল। চিনচিন করে বুকে সে একটা ব্যথা অনুভব করছিল—বাবাটা কেন যে বোঝে না:

কপিলের হুঙ্কার ফের—বাড়ি থেকে বের করে দেব।

দাও না। দাও। বলে উঠে দাঁড়িয়েছিল পার্বতী।

পার্বতী দ্যাখ কী সব বলছে ফটকি পিসি? তুই একবার বল, বলিসনি, দেখি পিসির কী ক্ষেমতা—

আসলে কপিল ফটকি বুড়ির মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিল। কান পাতা যায় না। মেয়েটার তবু যদি হুঁশ থাকে। পার্বতী তবু মাথা পাতছে না।

তবু সে একবার তেড়ে গেছিল, তুই বুড়ি চুপ করবি কিনা বল। পার্বতীকে জড়াচ্ছিস কেন!

তুই কানা আছিস কপিল। মেয়েটা লজ্জায়। বনমালীয়ে ভয় দেখায়, পুলিশে দেবে। আর বাপ তুই বা কেমন ছেলে—ওর কাকা পুলিশে কাজ করে, তোর বড় মামা দারোগা বলতে পারলি না। লেজ গুটিয়ে চলে এলি! এক দন্ডও গেল না, আবার ঘুরঘুর। মেনি বেড়ালের মত চলে গেলি। কপিল দেখছে, এক কথা তুললে দশটা কথা বের হয়ে পড়ে। তলে তলে এত কথা বলেছে বনমালীর সঙ্গে! রাগে দুঃখে সে এসে পটলকে পিটিয়েছিল। থাকিস কোথায়! বাড়িতে লীলা চলছে জানিস না? তুই বাঁদর, হারামজাদা, বের হ বাড়ি থেকে। তারপর চেলাকাঠ নিয়ে ছু-টেছিল। পটল জানে এ-সময় কাছে থাকতে হয় না, সে দৌড়ে পালিয়েছিল

দিদিও শেষ পর্যন্ত গোঁ না ছাড়লে, বাবা একটা মুগুর তুলে ছুটে এসেছিল, খুন করব তোকে। আমার মাথা কাটা এমনিতেও গেছে, অমনিতেও যাবে। থানা পুলিশ হবে। হোক। সন্তান হত্যার দায়ে পাতক হব।

দিদির যে কী হল—বাবাকে মুগুর হাতে দেখে একটা কথা বলেনি। মাথার উপর মুগুরটা তুলে শাসিয়েছে, বল বলবি না।

দিদি কোন কথা বলেনি।

বল বলবি, বনমালীকে তুই বলিদান দিবুকে খুঁজতে যেতে।

দিদি কথা বলেনি।

বল, বলবি আলতা পাউডার বনমালী দেয়নি, আমি কিনে দিয়েছি।

দিদি মাথা গোঁজ করে বসেছিল।

ওঠ। ওঠ বলছি।

দিদি উঠে দাঁড়াল।

খেতে বস। না খেলেও তোকে খুন করব।

পটলকে খেতে দে।

দিদি তাকে খেতে দিয়েছিল।

আমাকে খেতে দে।

দিদি বাবাকে খেতে দিয়েছিল।

এবারে তুই খা।

দিদি খেতে বসে হাউহাউ করে কাঁদছিল।

সকাল থেকে বাবার এমন চলছিল। দিদির খেতে খেতে বেলা পড়ে গেছিল। তারপর বাবা যখন কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে গরুটা নিয়ে মাঠে দিতে গেছে, সেও সবার খাওয়া হয়ে যাওয়ায় কেমন হাল্কা বোধ করেছিল—কঙ্কণের সঙ্গে ঘেরির নিচে গোল্লা ছুট খেলবে বলে বের হবে ঠিক করছে, তখনই টের পেল দিদি বাড়িতে নেই। সে এ-সব বিষয়ে বাবার বড় বাধ্যের। কারণ দিদির গতিবিধির খবর না রাখলে তার পিঠ ভাঙবে বাবা। সে গিয়ে বলল, বাবা, দিদিটা কোথায় গেছে!

পার্বতী না বলে যায় না কোথাও। প্রথমেই সে কেমন একটা হোঁচট খেল যেন। মেয়েটা তার বড় বাধ্যের। কখনও মনে হয় মেয়েটা যে আজকাল একটু আলতা পরতে ভালবাসে। কখনও বড় হ্যাংলা মনে হয়। তা শাড়ি একখান দরকার। একখান কিনে দিয়েছে, যদি আউশ ধান ভাল হয় তবে আর একখান হবে। সে মাঝে মাঝে এখন শুধু গরু মাঠে দিতে গেলে আকাশ দেখে। জমিতে চাষ দেওয়া আছে। মই দেওয়া আছে। বৃষ্টি ঝাঁপিয়ে নামলেই ধান বুনে দেবে।

তাহলে সেখানেই গেল।

সেখানে মানে বনমালীকে দেখতে। এত সাহস তোর মেয়ে! বাপের দিকটা দেখলি না। তোকে নিয়ে এত কথা হচ্ছে, তোর মায়া নেই মেয়ে। এত বাড় বাড়লি! মেয়ে যে তার বড় হয়ে গেছে সেটা কপিলের কিছুতেই মাথায় আসে না। সে বুঝল, পার্বতীর

বনমালীই সব। তাকে দেখতে না পেলে যেন পার্বতী পাগল হয়ে যাবে। তখনই মনে হল, তুই—তুই আমার কে? তোর মতো নির্লজ্জ মেয়ে না থাকলে কী হয়? সে হাতের মুগুরটা নিয়ে প্রথমেই ছুটে গেল দিবুদের বাড়ি, ডাকল, পার্বতী আছে? ওকে খুন করব। মাথা ফাটাব। আমার অমন মেয়ে দরকার নেই। মেয়ে মরে যা তুই, বের হয়ে যা। দেখি তোকে কে ভাত দেয়!

দিবুর জেঠিমা শুধু বলল, কপিল ঠাকুরপো তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? সকাল থেকে মেয়েটার পেছনে লেগেছো!

আমি কি করব বউদি। আমার যে একটাই মেয়ে। কত কষ্ট করে বড় করছি। মা তো তার ড্যাং ড্যাং করে চলে গেল। সব ভাবনা আমার।

কোথাও গেছে, যাবে।

সকাল থেকে বলছে, বনমালীকে দেখতে যাবে।

দিলে না কেন যেতে!

বউদি আপনার মাথা ঠিক নেই। সব শুনছেন না।

এ-সময় উপেন রায় ঘর থেকে বের হয়ে বলল, মাথা ঠাণ্ডা করে কপিল বাড়ি যা। আমাদের চুপচাপ থাকা উচিত। তোর মাথাটা যে কী হয়ে যায়!

দিবু ঘরেই বসেছিল। যেন জ্যাঠার আপদ গেছে! একমাত্র বনমালীর বাড়ি থেকে লোকজন এলে আবার কিছুটা হৈ-চৈ উঠবে। পার্বতী কোথায় যেতে পারে! কপিলকাকার হাতে মুগুরটা তুলছে। অন্য সময় হলে সে বের হয়ে খোঁজাখুঁজি করতে পারত। কিন্তু আজ যেন সে তাও পারে না। পার্বতী তার কে?

সাঁঝবেলায়ও শুনতে পেল, কপিলকাকা পার্বতীর নাম ধরে ডাকছে, পার্বতী বাড়ি আয়। আমি এমনি বলেছি খুন করব। কখনও করি? কতবার বলেছি, কখনও করেছি? পটল ডাকল, দিদি বাড়ি আয়।

কোন সাড়া নেই।

চারপাশে অন্ধকার নেমে আসছে। আকাশে নক্ষত্র ফুটে উঠছে একটা-দুটো করে। ঘরে ঘরে লম্ফ জ্বলে উঠছে। তখন শোনা যাচ্ছিল ঘেরির শেষ মাথায়, দিদি কৈ গেলি। দিবু বাইরে দাঁড়িয়ে দেখল, অনেক দূরে একটা মাচা কাঁধে নিয়ে কারা যাচ্ছে। বনমালীকে দেখার জন্য পার্বতী সেখানে যায়নি তো। আরও অন্ধকারে মনে হল দূরের সেই মাচা বহনকারীদের সঙ্গে যে লম্ফটা তা আর দুলছে না। স্থির হয়ে গেছে। বনমালীকে বোধহয় এতক্ষণে রাখা হয়েছে ওখানে। মাথার কাছে একটা লণ্ঠন জ্বলবে কথা আছে।

দিবুর এই প্রথম মনে হল এতটা নির্বিকার থাকা মানুষের লক্ষণ না। সে শুনতে পাচ্ছে, ঘেরির সর্বত্র, কে ডেকে যায়—দিদি বাড়ি আয়। বাবা তোকে কিছু বলবে না।

দিবু বাড়িতে এই প্রথম মাকে বলে বের হল, মা আমি ললিতদার কাছে যাচ্ছি। ফিরতে দেরি হবে। ভেব না।

সে আর কাউকে কিছু বলল না। বাবাকে না। জ্যাঠাকে না। জ্যাঠামশায় বৈকালি দেবার জন্য ঠাকুরঘরে ঢুকে গেছেন। বাবা বেলডাঙ্গার হাটে যাবেন কাল। ভাল এক জোড়া দামড়া কিনতে হবে। পাইকারের সঙ্গে কথা বলতে দুপুরে চুমরিগাছা গেছেন। ফিরতে রাত হবে। টর্চটা বাবা নিয়ে গেছেন। রাস্তায় নেমে কেন জানি মনে হল, নতুন পাতকুয়োটা দেখা দরকার। এ-বয়সে মানুষের আত্মনাশের প্রবণতা থাকে। কেউ পার্বতীর কষ্ট বোঝে না। সে এতক্ষণ নিজেকে নিয়েই বেশি বিব্রত ছিল। বনমালীর অপঘাত যে কারণে, পার্বতী তার বড় দায় নিয়ে চুপচাপ কপিলকাকার হম্বিতম্বি হজম করে গেছে, একবারও সেটা মনে হয়নি। শুধু কপিলকাকা কেন, সবাই। অলক্ষ্যে যেন হাত উঁচিয়ে রেখেছে কপিলকাকার বাড়ির দিকে। অসময়ে মানুষ মানুষের পাশে থাকে। তার ললিতদা ছিল পার্বতীর তাও ছিল না। উষা যেতে পারত। সেও একবার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়নি। পাছে জ্যাঠামশায় ক্ষুব্ধ হন।

সে পাতকুয়োর অন্ধকারে কিছু দেখতে পেল না। এ-সময় মনে হল লণ্ঠন হাতে কেউ এদিকটায় নেমে আসছে। কাছে এলে বুঝল কপিলকাকার মনেও এটা উদয় হয়েছে। এমন অন্ধকারে দিবুকে একা বসতের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কপিলকাকা অবাক। সে বলল, তুই।

না এমনি। ওরা ফিরে আসছে কি না দেখছি।

উভয়ে উভয়কে গোপন করে যাচ্ছে কেন তারা এখানে হাজির। কপিলকাকা বলল, কারো বাড়িতে নেই। গেল কোথায়!

বুকের ভেতর ভয়টা গুড়গুড় করছে। পার্বতী যদি কিছু করে বসে! পার্বতী যে তার কেউ না, দিবু আর ভাবতেই পারছে না। একটু দূরে ছায়ার মত কেউ দাঁড়িয়ে। দিবু বলল, কে ওখানে?

কপিলই জবাব দিল, পটল, দিদিটা তার যে গেল কোথায়! কপিল লণ্ঠন তুলে ডাকল, এই আয়। এসে যাবে। রাগ পড়ে গেলেই এসে যাবে।

পটল কাছে এলে দেখল, ওর চোখ লাল। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে দিদির জন্য কাঁদছে!

দিবু কেমন মরিয়া হয়ে বলল, হারিকেনটা দাও। তারপর যেন কেড়েই ওটা নিয়ে কুয়োর নিচে নামিয়ে দিল।—না নেই। স্পষ্ট খুব একটা কিছু দেখাও যাচ্ছে না। সে দৌড়ে ললিতদার দোকান থেকে একটা টর্চবাতি চেয়ে আনল। তারপর ফোকাস মেরে দেখল, জলের উপর কিছু জোনাকি পোকা শুধু। তাহলে পার্বতী ওদিকেই গেছে। ভয়ে না ক্ষেদের বশে, না বনমালীকে যারা নিয়ে গেল তাদের সঙ্গে সে কিছুই বুঝতে পারছে না। পটলের দিকে তাকিয়ে শুধু বলল, বাড়ি যা পটল। আমি তোর দিদিকে ঠিক খুঁজে আনব।

দিবু কিছুটা এসেই দেখল, অন্ধকার যেন ওকে গিলে খাচ্ছে। তারপর মনে হল, না, অন্ধকারেরও একটা আলো থাকে। সেই

আলোতে পথের খড়কুটোও দেখা যায়। একটু ভাল করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় অন্ধকার তত মহামারীর গ্রাস নয়। টর্চটা হাতে। ললিতদা নেই। মাচা নিয়ে সেও চলে গেছে। এখন একবার দেখা দরকার বনমালীকে যেখানটায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেখানটা। কিংবা রাস্তায় যদি ললিতদার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়—ওরা ফিরে আসার সময় পথে দেখা হয়েই যেতে পারে। সে আর দেরি করল না।

থানের পাশ দিয়ে যাবার সময় শরীরটা ভয়ে কেমন একবার ফুলে উঠল। মশারির বাইরে একটা হাত বাড়ানো। যেন বনমালী হাতে বাঘ-নখ পরে আছে। প্রতিশোধ নিতে চায়। সে চারপাশে কেমন একটা ভূতুড়ে ঘ্রাণ পাচ্ছে। এত ভয় থাকলে এতটা পথ যাবে কী করে! ঘেরি থেকে নেমে যাবার মুখে চিন্তাহরণের বাড়ি। সামনে দুটো আম এবং বাতাবী লেবুর চারা পোঁতা। বারান্দায় লণ্ঠন জ্বেলে চিন্তাহরণ তার শাগরেদদের নিয়ে বসে গেছে। কালীপদ আচার্যের গলা পাওয়া গেল। হরেন নিবিষ্ট মনে কাঠে ঝুঁকে কুচকুচ করে কি কাটছে। হাসি তামাশা গল্প এবং জমি সংক্রান্ত কথাবার্তার মধ্যে তার জ্যাঠামশাইয়ের নামও কেউ যেন বলল। এই মজা উপভোগে দিবুর চোখ কেমন তপ্ত হয়ে উঠল।

নিচে নেমে গাড়ির লিক ধরতে হয়। রাস্তা বলে কিছু নেই। মানুষজনের চলাচল কম। কেবল গ্রীষ্মে একটা গরুর গাড়ির লিক পাওয়া যায়। অথবা বর্ষায় বাঁধে বাঁধে কিছুটা নৌকা এবং জল ভেঙে পাকা সড়কে উঠতে হয়। পাঁচ ক্রোশের মতো পথ বনগাঁর দিকে। বুদ্ধের মতো এই বিশাল বিলে কাঁটা আর খড়ের বনের অন্ধকার। সরসর শব্দ। জোর হাওয়া দিচ্ছে। সে নিচে নেমে দেখল লণ্ঠনের আলোটা দেখা যাচ্ছে না। তাহলে কি হাওয়ায় নিভে গেছে! কারণ তাকে এখন এই আলোটাই দিক নির্ণয়ে সাহায্য করবে। সে ফের ঘেরির পাড়ে উঠে দেখল না লণ্ঠনটা জ্বলছে। মানুষের সাড়া পাওয়া যায় কিনা শোনার চেষ্টা করল। একা এ-ভাবে সে কখনও কোন

অন্ধকার মাঠ পার হয়নি। পার্বতী তাকে আজ সব তুচ্ছ করতে শিখিয়েছে। সে ডাকল পার্বতী তুমি কোথায়?

এই প্রথম সে পার্বতীকে ডেকে কথা বলছে। সে জানে পার্বতী কতকাল থেকে এমন একটা আহ্বান পাবার অপেক্ষায় ছিল। যেখানেই থাকুক সাড়া না দিয়ে পারবে না।

পার্বতী আমি দিবু। পটল খুব কান্নাকাটি করছে।

আশপাশের ঝোপ জঙ্গলে পার্বতী তার বাবাকে ভয় দেখানোর জন্য যদি লুকিয়ে থাকে। সে ডানদিকে তাকাতেই দেখল তালগাছের নিচে লণ্ঠন দুলছে একটা। কপিলকাকা বোধহয় পার্বতীকে সেখানে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ললিতদার চায়ের দোকানের দিকে লণ্ঠনটা তারপর নেমে গেল। শেষ আশা ললিতদা। যদি সঙ্গে নিয়ে ফেরে। কপিলকাকা এখন সেখানেই যাচ্ছে।

সে আরও একটু এগিয়ে দেখতে চায়। ললিতদাকে তার দরকার। আরও তাড়াতাড়ি হাঁটা দরকার। আলোটা দেখা যাচ্ছে। অনেক দূরে মাথার উপরে যেন জ্বলছে। সে লিক ধরে গেল না। কারণ লিক ধরে গেলে অনেকটা ঘুরতে হবে। সোজা উঠে যাবার সময় মনে হল তার সামনে নিচু জমি নুড়ি পাথর—কোনো নদীর খাতের মতো জায়গাটা। বালি চিকচিক করছে আর অবাক, কখন চোখের উপর থেকে সেই আলোটা সরে গেছে। সে কি তবে পথ ভুল করে ফেলেছে! বিলেন অঞ্চলটাকে বোরিং পর ঘেরি। ঢেউ খেলানো জমি। বোধহয় এমনি ঢেউ খেলানো জমির কোনো বাঁকে আলোটা অদৃশ্য হয়ে আছে। কোনো উঁচু মতো জায়গায় উঠে গেলে আবার দেখতে পাবে। কিন্তু এযে কেবল সে নেমেই যাচ্ছে। ঘাসফড়িং কীটপতঙ্গের শব্দ। একটা শেয়াল পর্যন্ত চোখে পড়ল। বনবিড়াল লাফিয়ে একটা ঝোপ পার হয়ে গেল। চোখ জ্বলছে। পেছন দিকে তাকিয়ে দেখল, আবাসের আলোও অদৃশ্য। সে কোথায় নেমে এল! এবং সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার, পার্বতী তুমি কি ভয় দেখাতে গিয়ে

নিজেই আমার মত আর পথ চিনে আবাসে যেতে পারছ না ? সে ডাকল, ললিতদা আছ ! মরণকাকা বগলাদা আছ। এইতো সামনে আলোটা জ্বলছিল, নাকি কোন আলেয়া এটা। সে ছুটতে থাকল। পেছনে উঠে আবার আগের জায়গায় যেতে চায়। যদি সেই আলো চোখের উপর আবার ভেসে ওঠে। সে বুঝল, এটা আর একটা ঘেরি। কোন চালা-টালা যদি থাকে। টর্চ জেলে ঘেরির পাড়ে কাউকে খুঁজল। মাঠচরাদের কেউ যদি থাকে। না নেই। কোন চালা নেই। ভাত ফুটিয়েও কেউ পদ্মপাতায় খাচ্ছে না। কারণ উনুনের আগুন কিংবা লণ্ঠনের আলো কিছুই দৃশ্যমান নয়।

অনেক দূরে সে শুধু দেখতে পেল তার সেই আবাসে, লণ্ঠনের আলো দুটো-একটা ভেসে বেড়াচ্ছে। আবাস থেকে সে খুব দূরে চলে যায়নি। বরং ঘেরি ধরে আর একটু এগিয়ে দেখা যাক—যদি নিকটা পাওয়া যায়। সে ফের গলা ছেড়ে ডাকল, ললিতদা, তোমরা কি ফিরে গেছ ? না বনমালীকে পাহারা দিচ্ছ ! তোমাদের সঙ্গে কি পার্বতী আছে ? কপিলকাকা পাগলের মতো খুঁজছে।

ধ্বনি প্রতিধ্বনি এবং অন্ধকার—বিশাল আকাশ—কোন নক্ষত্র চোখে পড়ছে না। হাত পা কাঁপছে। ঘামে ভিজে গেছে শরীর। জল তেষ্টা পাচ্ছে। অন্ধকার শুধু একা তাঁকে তাড়া করছে না, বনমালীও সঙ্গে। দিবুবাবু ওকে তুমি পাবে না। সঙ্গে নিয়ে গেছি। অপঘাতে সেও গেছে। বৃথা এই বন-বাদাড়ে ওকে ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছ ! আতঙ্কে বুকের ভেতর তার কেমন একটা কষ্ট হতে থাকল।

নিচে নেমে এলেই আবাসের ইতস্তত ছড়ানো জোনাকির মতো দুটো-একটা আলো ঘেরির বাঁধের আড়ালে পড়ে যাচ্ছে। সে যাই করুক, এই ফিরে যাবার শেষ সংকেত হারাতে চায় না। কী করবে বুঝতেও পারছে না। এখান থেকে নিচে যেদিকেই নেমে যাচ্ছে—সেদিকেই দেখছে শুধু উদাস প্রকৃতি ফিসফাস কথা বলছে। পাতার শব্দ, খড় বিচালির শব্দ, কীট-পতঙ্গের শব্দ। টর্চ জেলে দেখল, ঘাস

এবং ফড়িং, ঘেরির পাড়ে পাড়ে অজস্র কাঁকড়ার গর্ত। এইসব গর্তেই লুকিয়ে থাকেন তেনারা। কেমন গা শিরশির করছে। গর্তের মুখে আলো ফেলল। যদি এরা দল বেঁধে বের হয়ে পড়ে। সে তবু সন্তর্পণে ঘেরির পাড় ধরে হাঁটছে। কোন পথ নেই। মটকিলা গাছের জঙ্গল, বেনা ঘাসের ঝোপ, হাঁটাও যায় না, কখনও ডিঙিয়ে যেতে হয় কখনও নিচে নেমে আবার উপরে উঠে যেতে হয়। এই করে সে যখন নিজের আবাসের দিকে ফিরে আসবে বলে চেষ্টা করছে, তখনই দেখল পাশের ছোট্ট এক মাঠে লণ্ঠনটা জ্বলছে! এমনকি মাচাটাও দেখা যাচ্ছে। এত কাছে এসে গেছে তবে লণ্ঠনটার! কিন্তু অবাক, কেউ নেই। শিয়রে শুধু লণ্ঠন। বনমালীর শরীর চাদরে ঢাকা!

দৃশ্যটা এত বীভৎস যে সে চোখ বুজে ফেলল। যদি ললিতদারা বনমালীকে রেখে বেশি দূরে গিয়ে না থাকে! কেউ নেই যখন, একা পার্বতীকে সে এখানে দেখতে পাবে আশা করে না। যদিও বনমালীকে শেষ দেখার জন্য এসে থাকে, তবে ললিতদার সঙ্গেই সে ফিরে গেছে। সে এ-সময় পার্বতীর নাম ধরে ডেকে বোকামি করতে চায় না। কেবল মনে হয়, ললিতদা যদি তার ডাক শুনতে পায়। বাঁধের পাড়ে দাঁড়িয়েই সে টর্চ জ্বেলে ঘোরাতে থাকল। আর হাঁকতে থাকল, ললিতদা পার্বতীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তারপর কোন সাড়া না পেয়ে ভাবল, সে বড় বেশি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে। ভয়ে সে বনমালীর দিকে তাকাতেও পারছে না। নির্জন মাঠে, উপত্যকার মতো ছড়ানো বিশাল বিলের বুকে যদি কোন মৃত মানুষ শুয়ে থাকে এবং আকাশের তারারা পর্যন্ত হারিয়ে যায় তখন দিবুর আর বল পাবার মতো কিছু থাকে না। সে পারলে সব ফেলে ছুটত। কিন্তু এখানে এলোপাথাড় ছোটারও সুযোগ নেই—ছুটতে গেলে আবাসের শেষ দূরতম সংকেতটাও অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে পারে। সে ললিতদাকে ডাকতে গিয়ে বুঝেছে, তার গলার স্বর বের

হচ্ছে না। যেন কোন মাতালের জড়ানো কথাবার্তার মতো শোনাচ্ছে তার গলার আওয়াজ। পায়ে হাঁটুতে যেন তার আর বিন্দুমাত্র বল নেই। আর এ-সময় আর একবার শেষ-দেখার মতো সে মাচার দিকে তাকাবার চেষ্টা করল। কারণ সেই যে মশারির বাইরে বনমালীর হাতটা বের হয়ে ছিল, সেটা লম্ব হয়ে গিয়ে তার পায়ের দিকে একটা তীক্ষ্ণ পিচ্ছিল রজ্জুর মতো আবার এগিয়ে আসছে কি না। ভয়ে ভয়ে তাকাতে গিয়েই সে ভূতুড়ে একটা ছবি দেখে ফেলল। লণ্ঠনের পাশে এক নারী বনমালীর শিয়রে বসে আছে। মানুষ শেষ হয়ে যায় না। প্রকৃতি তার শিয়রে এসে অপেক্ষা করে। সে শেষ-বারের মতো পার্বতী বলে চিৎকার করে উঠল। আর কিছু বলতে পারল না। সংজ্ঞা হারাল।

পার্বতী তখন বলছিল, ভয় নেই বনমালীদা, বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে। ওরা এলে তোমাকে নিয়ে যাবে। যতীনটা ওঝা না ছাই। কেবল ভড়ং। কিছু জানে না। বিষ গায়ে ঠাণ্ডা মেরে বসে গেছে গরম হলে সব নেমে যাবে। তোমাকে বলিনি, জান, কাল তোমার আলতা পায়ে দিয়ে পাউডার মেখে উষা সইয়ের কাছে গেছিলাম। আমি গোপন করব না। মিছে কথা বলব না। তোমাকে সাপে কেটেছে, এ-সময় মিছে কথা বললে আমাদের সবার খারাপ হবে। পটল তো বন-জঙ্গল মানে না। কেবল ঘুরে বেড়ানোর বাই। মিছে কথা বললে, মা মনসা ফোঁস করবে না? বাবাটা বোঝে না। তোমাকে তো আমিই পাঠিয়েছিলাম দেখতে। আমি কি জানতাম, কালে খাবে তোমাকে! আমার কী দোষ বল! জান কাল গিয়ে দেখি, দিবুদাটা ছুলিদিকে খুঁজতে কোথায় গেছে। পটল যে কী মিছে কথা বলতে পারে! এত সেজে গেলাম, দিবুদাটাই নেই। না আমি আর মিছে কথা বলব না। আমি একটা কালুটনি, দিবুদার আমাকে ভাল লাগবে কেন বল। তুমিই আমার ভাল। আবার যখন আসবে

আমার জন্য একখানা শাড়ি আনবে। সে লণ্ঠনটা তুলে মুখের কাছে নিয়ে গেল। চোখ স্থির। আহা রে, কী না কষ্ট হচ্ছে ভেতরে! আমি এলাম, দেখে গেলাম তোমাকে। কারো সঙ্গে আসিনি। একা একা মাঠ পার হয়ে—কেউ টেরই পায়নি। বাবা খুঁজুক—আমি নাকি কুলটা। দিবুদাকে জান আমি স্বপ্ন দেখি। আমার স্বপ্নের মানুষ সে। আর তুমি হলে গে সাঁকোর পারের মানুষ। ডাকলেই সাড়া পাই।

এত কথার মধ্যে হঠাৎ একবার মনে হল তার নাম ধরে কেউ ডাকছে। কে ডাকবে। বাবা। না। বাবার গলার স্বর সে চেনে। পটল এত দূরে একা এই অন্ধকারে আসতেই পারে না। কাঁপা কাঁপা গলায় তার নাম ধরে ডেকে ডেকে কেমন মাঠের মধ্যে কেউ মিলিয়ে গেল। এইসব বিলেন জায়গায় মাঠচরাদের উৎপাত থাকে। বানে-বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে আসে মানুষ। নদীর খাতে গেলবারেও দুটো মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। ভূতুড়ে ভয়—ওঁয়া ওঁয়া, আমরা এসেছি তাঁকে নিতে। নিশির ডাক যদি হয়—একা পেয়ে খুব সুযোগ পেয়ে গেছে, সে এবার মাঠের দিকে তাকিয়ে বলল, ভূত আমার পুত পেত্নী আমার ঝি, রাম লক্ষ্মণ সাথে আছে করবে আমার কি। বলে পার্বতী ভেংচি কাটল। হাঁটুতে ফ্রক টেনে বসল। এবং তখনই দেখল, জঙ্গল ফুঁড়ে একটা আলো আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। সে উঠে দাঁড়াল। কে ডাকল তবে! এত রাতে আকাশে টর্চ মেরে কার এত সাহস তারা গোনার। মনে হল তার, এ-যেন শুধু একজনই পারে। সে দিবুদা। দিবুদাই একমাত্র বসন্তের মানুষ যে ইচ্ছে করলে আকাশে কত তারা গুনে বলে দিতে পারে।

সেই লম্বা বড় মানুষটাকে পার্বতী কল্পনায় দেখতে পেল। টর্চ হাতে আকাশের তারা গুনছে। কোঁকড়ানো চুল উঁচু লম্বা, সোনালী দাড়ি গোঁফ গালে—যেন কোন নবীন সন্ন্যাসী তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। তার ভারী লোভ হল, মাঠ পার হয়ে দূরের সেই জঙ্গলটার কাছে যেতে। আঁধার বড় ঘন। আবছা মতো সব কিছু। অথবা

জলের তলায় ডুবসাঁতার দিতে গিয়ে সে এই আবছা এক জগৎকে জীবনে বার বার আবিষ্কার করেছে।

পার্বতী একা মাঠে দাঁড়িয়ে আছে। পাশ দিয়ে গরুর গাড়ির একটা লিক নদীর খাতে নেমে গেছে। বনমালীদাকে দেখাও হয়ে গেছে। এখন লণ্ঠনটা আরও শিয়রের কাছে রেখে সে ভাবল, সেই আলোটার দিকে যাওয়া যাক। সে এবার নুয়ে বনমালীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলল, যাই আমি। বাবা বুঝুক, কেমন আমাকে কেবল মারে। তুমি এখানটায় থাক। ওরা এলে তুমি চলে যেও।

পার্বতী এবার নিচে নেমে আসতে থাকল। সেই আলোটার কাছে সে হেঁটে যাচ্ছে। একবার মনে হল, পাখি ধরার লোক যদি ওখানটায় ওৎ পেতে বসে থাকে! নদীর এ-দিকটায় শীতের সময় আসে অজস্র পাখি। গরম পড়লেই ওরা কোথায় উড়ে চলে যায়। তবু শিকারীদের আনাগোনা শেষ হয়ে যায় না। লোভে লোভে তারা বর্ষা না আসা পর্যন্ত কেউ কেউ ঘাপটি মেরে বসে থাকে। সে সন্তর্পণে হাঁটছিল। কাঁপা কাঁপা গলায় কে যেন ডেকেছে, পার্বতী তুমি কোথায়! পার্বতী, পটল বাড়িতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তোমাকে আমরা সবাই খুঁজছি! এতগুলি কথা কেউ বলে গেছে ডেকে ডেকে, আসলে বনমালীদাকে দেখার জন্য তাকে কেমন একটা নেশাতে পেয়ে গেছিল। যাকে বলে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সে নেমে এসেছিল এতদূরে, নদীর খাতে। ক্রোশখানেকের উপর হয়ে যাবে। এতটুকু বিচলিত বোধ করেনি। মা মনসাকে নিয়ে অবহেলা সে সহ্য করেনি। কে তার পিছু ধাওয়া করছে কিংবা ডাকছে, কোন কিছু সম্পর্কেই তার কোন হুঁশ ছিল না। বনমালীকে দেখার পর তার হুঁশ ফিরে এসেছে। একে একে তার সব কথা মনে হচ্ছে—এবং সহসা কেমন তার লোম-কূপে ঝড় উঠে গেল—ও কণ্ঠস্বর আর কারো না, দিবুদার। দিবুদা তাকে খুঁজতে বের হয়েছে। ঐ আলো আর কারো না, দিবুদা টর্চ মেরে সংকেত চিহ্ন ঝুলিয়ে রেখেছে। এত

বড় বিশাল বিলের অঞ্চলে অন্ধকারে ডাকলেও বোঝা যায় না, কোথা থেকে কে ডাকছে। সে প্রায় ছুটতে থাকল।

হলে কি হবে, ছুটতে চাইলেই ছোটা যায় না। উঁচু নিচু ঢিবি-কুচলতার জঙ্গল, কখনও পদ্মা ঘাসে অজস্র জোনাকির ওড়াউড়ি—কিংবা রাতচরা পাখিদের ডাক তার মধ্যে বিচিত্র উত্তেজনা সৃষ্টি করছে, সবচেয়ে সেই সব বিষহরির বংশ কখন যে অন্ধকারে ঠাণ্ডায় বরফ হয়ে পড়ে যাবে পায়ের তলায়।

এতক্ষণে তার যে হুঁশ ফিরেছে চলাফেরায় তা টের পাওয়া যাচ্ছে। অন্ধকারে সে এতটা দূর এল কি করে! একবারও মনে হয়নি, অজস্র কীটপতঙ্গের মতো এই বিলের জায়গাটাতে অহরহ তেনারা সামনে পড়ে যান। গরমে হাওয়া খান ঘাসের উপর চুপচাপ পড়ে থেকে। সে ঐ আলোটার কাছে যাবে—কিন্তু তেনাদের কথা ভেবে পা আর উঠছে না। অথচ সে মাচার সঙ্গে যে আলো যায় তাকে অনুসরণ করে চলে এসেছিল। পায়ে লাগছে। হাত দিয়ে বুঝল, জায়গায় জায়গায় পা কেটে গেছে সে আর যেন এক পা এগুতে পারছে না। চিৎকার করে বলতেও পারছে না, দিবুদা আমি এখানে। আলোটা ধর। দিবুদা বলে সে এই এক মাসের মধ্যে একবারও ডাকেনি। পটলকে বলেছে, দেখ তো গিয়ে দিবুদা কী করছে। উষাকে বলেছে, দিবুদা কোথায় রে? আর দিবুকে দেখলে, সে লজ্জায় নিজেকে আড়াল করে রেখেছে।

সে নিজেকে বলল, তুমি ভয় পাও কেন।

সে ফের নিজেকে বলল তুমি বিষহরির নামে মিছে কথা বলনি। তোমার ভয় কি!

সে পা বাড়াল। বলল, দোহাই আস্তিক মুনি।

আস্তিকের দোহাই দিয়ে সে এখন হেঁটে যাচ্ছে। পায়ে বড় লাগছে। তবু বলতে পারছে না, দিবুদা এস। আমার হাত ধর। আমি আর জোর পাচ্ছি না।

আলোটা তেমনি উর্ধ্বমুখী। ফোকাসটা অনেক উঁচুতে উঠে কেমন স্থির হয়ে আছে। যেন কোন অলৌকিক রশ্মিতে এখন সামনের আকাশটা উজ্জ্বল।

একবার মনে হল, এই বিলেন অঞ্চলে কত ফকির দরবেশ ঘুরে বেড়ায়। কত মানুষ জানে, ধেয়ে আসে দামোদর. গুপ্তধনের রহস্যের খবরেও থাকে কেউ। কে জানে এটা আবার সেই অজগরের মণি কি না, রাজপুত্র, কোটালপুত্র যায় আর যায়। রাজকন্যা ঘুমিয়ে থাকে। অজগর বড় হিংসুটে। ঘোড়া দুটো খায়। কোটালপুত্র বুদ্ধিমান—সে ঘোড়ার বিষ্ঠা দিয়ে সাত রাজার এক মাণিক্য ঢেকে দিলে সব অন্ধকার। এখানে বান-বন্যায় মেঘডম্বুর পর্যন্ত উঠে আসে। গেল সালে একটা আস্ত বাছুর গিলে ধরা পড়ে গেল। তেনার জোড়ার মাথার মণি কি না কে জানে। এতক্ষণ কোন মানুষ আকাশে টর্চ জেলে দাঁড়িয়ে থাকে না।

কত ফকির দরবেশ গুপ্তধন পেয়ে রাজা হয়ে গেছে। আর এ-যদি হয় সাপের মাথার মণি, তবে ত কথাই নেই। মণি না দল বেঁধে জোনাকি পিণ্ডাকারে উড়ছে—কেমন ভৌতিক আলো-আঁধারি সৃষ্টি করে চলেছে তারা।

সে থামছে না। লোভ সংশয় কিংবা তার দিবুদার উপস্থিতি এমন সব চিন্তা-ভাবনা মাথায় কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু ধরে সে যেতে পারবে না। কারণ বনমালীদাকে ওরা নিতে এলে গরুর গাড়ির লিক ধরেই আসবে। দেখা হয়ে গেলে ধরা পড়ে যাবে. সে গোপনে বনমালীদাকে দেখতে এসেছিল। আবাসে উঠে যাবার সোজাসুজি মাঠের মুখে আলোটা—ওটা পার হয়েই তাকে যেতে হবে। নাকি দেবী মনসা তার জন্য ওখানে অপেক্ষা করছে। দেবী-মহিমা বলতে! বর দিতে পারে, তোর বনমালীদা ভাল হয়ে যাবে। তোর ভক্তিতে আমি আর স্থির থাকতে পারিনি। ধরায় নেমে এসেছি। তেনারি অঙ্গ থেকে আলো ফুটে বের হচ্ছে! অথবা সেই

আকাশ থেকে নেমে আসার সময় যে আলোর সিঁড়ি ধরে এসেছেন ধরায় সেটাই এখন আকাশে ঝুলে আছে। সে কাছে না গেলে বর দেবে কি করে! এমন ভাবতেই পার্বতীর বুকটা বড় বেশি ওঠানামা করতে থাকল। সে আবার কেঁদে ফেলবে না তো। মা জগজ্জননী, তুমি এসেছ ধরায়, কিসে যে বসতে দি। বাবা আমাকে কেবল মারে। না না তাই বলে বাবা আমার খারাপ মানুষ না। বড় চণ্ড রাগ। মা জননী তুমি তোমার বাহনদের বলে দিও পটলটা ভারী চঞ্চল। একটু দেখে-শুনে যেন ওরা চলে। রোজ তোমার বাহনদের জন্য দুধ রেখে আসব তালগাছগুলোর নিচে। ওটা বড় খারাপ জায়গা। তোমার বাহনেরা সব দল বেঁধে সেখানটায় থাকে। আমরা যাই না। বনমালীদাটা বোকা আছে। কেন যে গেল! ওর কোন দোষ নেই আমিই পাঠিয়েছি। হাত জোড় করে মন্ত্রপাঠের মতো সে সেই স্থির আলোর সিঁড়িটার দিকে এগিয়ে আসছে, আর বিড়বিড় করে বকছে। এও এক বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা—পার্বতী বুঝতে পারছে না। চোখ স্থির—এই হল গে দেবীমহিমা—কেউ বিশ্বাসই করতে পারবে না, জীবনের কত পুণ্যফলে দেবী মনসা তাকে দেখা দিতে গেলেন। আর কিছুটা উপরে উঠতে পারলেই দেবীর শ্রীচরণ নাগাল পাবে। মাথা থেকে আলোর ফুলকি বের হয়ে আকাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে বলেই ওই আলোটা। আকাশের দিকে সোজা সরল রেখায় উঠে গেছে। পার্বতীর হাঁটু কাঁপতে থাকল। বিশাল বিলেন মাঠে সে একা, দেবী তার সামনে হাজির শঙ্খ পদ্ম গদা হাতে শ্রীচরণে কোটি পদ্মের পাপড়ি, নাকে নোলক, বিস্ফারিত দুই আঁখি, এক হাতে কলসি, অন্য হাতে বরাভয়—এই সব মিলে দেবী তখন পার্বতীর সামনে আবির্ভূতা হচ্ছিলেন। কাছে যাবার সাহস নেই, পার্বতী হাঁটু গেড়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসে পড়ল। কেমন তার মুহ্যমান অবস্থা। পটল দিবুদাকে ভাল রেখ মা। দিবুদাকে ভাল রেখ।

দিব্যেন্দু চারপাশে কি যেন তখন হাতড়ে বেড়াচ্ছে। তার বোধ-বুদ্ধি কিছুক্ষণ ভয়ে কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়েছিল। সেটা ফিরে আসায় বুঝতে পারছিল, সে পড়ে আছে ঘাসের উপর। টর্চটা হাতে নেই। সেটা কোথাও ছিটকে পড়ে গেছে। কারণ ভয়ে সে তখন পালাবার চেষ্টা করছিল—এইটুকু শুধু মনে পড়ছে। চোখ খুলতেও সাহস পাচ্ছে না—কারণ সামনের বিলেন উপত্যকাটা পার হয়ে একটা ঢিবি মতো জায়গায় পড়ে আছে বনমালী আর তার পাশে কোন নারী সে এখনও ভয়ে চোখ খুলছে না—কেবল হাতড়ে টর্চটা খুঁজছে সেটা পেলে কোনরকমে আবাসের দিকে ফিরে যাবে সে পার্বতীকে খুঁজতে এসে এমন এক আধিভৌতিক রহস্যের মধ্যে পড়ে যাবে যদি আগে জানত!

না, টর্চটা সে পাচ্ছে না। এবারে সে তাকাল। আর তাকাতেই দেখল, একটা আলো খাড়া আকাশের দিকে উঠে গেছে। টর্চের আলো। ওটা জ্বালানোই ছিল তবে। কাঁটা গাছের ডালে আটকে ঝুলে আছে। সন্তর্পণে হাত ঢুকিয়ে টর্চটা বের করে আনল। দূরে সেই ঢিবির দিকে ভয়ে তাকাচ্ছে না। টর্চটা নিভিয়ে সে একটু হেঁটে পথ দেখার জন্য আবার জ্বালাতেই চোখে পড়ে গেল শ দুয়েক গজ দূরে ঘেরির নিচে পার্বতী! এ কি ভঙ্গি! বিস্ময়ে সে হতবাক। টর্চের ফোকাস পার্বতীর মুখে পড়তেই দিব্যেন্দু স্থির হয়ে গেছে। চোখ বোজা পার্বতীর। বুকে হাত জোড় করা। হাঁটু গেড়ে সে যেন কার জন্য প্রার্থনা করছে। মেয়েটা তো সত্যি তাহলে পাগলা আছে। সে দৌড়ে নেমে গেল। আবার না পালায়। ডাকল, পার্বতী, এই পার্বতী, তুমি এখানে কি করছ!

পার্বতীর চোখ বোজা। কোন সাড়া দিচ্ছে না।

ফ্রক গায়ে মেয়েটা যেন এখন এক অন্য জগতে আছে!

সে পাশে বসল। ডাকল, এই পার্বতী এটা কী হচ্ছে!

হুঁ। পার্বতী চোখ খুলে দিবুকে দেখল। কিছু বলল না। কেমন বেহুঁশ।

তোমাকে কপিলকাকা খুঁজছে। না বলে কয়ে এখানে এসে এই করছ!

কপিলকাকা কে? কেমন যেন চোখ তুলে প্রশ্ন।

পটলটা কাঁদছে। ওঠো ওঠো বলছি। পাগলামি বাড়ি গিয়ে করবে।

পার্বতী বেহুঁশ হয়েই আছে। তবে দিবুর কথায় সে উঠে দাঁড়াল। আমি কোথায় যাব!

দিবুর বলার ইচ্ছা হল, মারব এক থাপ্পড়। যত সব ন্যাকামি। কিন্তু বলতে পারল না। সে পার্বতীর মুখে টর্চের ফোকাস ফেলে রেখেছে। অপার এক ভাবালুতা, না অন্য কিছু—পৃথিবী কেমন রহস্যময় তার কাছে। বেঁচে থাকা এবং এই জীবনধারণ অর্থহীন। সে কোন এক অদৃশ্য জগতের মধ্যে ডুবে আছে। চোখ দেখে আর যাই বলা যাক গালাগাল করা যায় না। কিশোরী বালিকা, তার উপর শ্যামলা রঙ, চোখ মুখ ভারী জমাট এবং এক আশ্চর্য সুষমা খেলে বেড়াচ্ছে সারা অবয়বে। তার কেমন মায়া হল। বলল, ছেলেমানুষীর সীমা থাকা দরকার পার্বতী। তুমি তো আর ছোট নও।

কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। যেন দিবুকে পার্বতী চিনতেও পারছে না। সে হাঁটতে থাকল।

দিবু পার্বতীকে অনুসরণ করছে।

কিছুটা গিয়ে দিবু বলল, ওদিকে না।

এবারে যেন পার্বতী দিবুর কথা শুনতে পেল। সে এবার দিবুকে অনুসরণ করছে।

দিবুর সব মনে পড়ায় বলল, এভাবে এতদূরে একা তোমার চলে আসা উচিত হয়নি। কোথায় গেছলে!

পার্বতী কিছু বলল না।

বনমালীর শিয়রে এক নারীকে সে দেখতে পেয়েছে। সে কে?

পার্বতীর পক্ষে একা সেখানে যাওয়া অবাস্তব চিন্তা। তবু পার্বতী এতক্ষণ কোথায় ছিল, কিংবা এখানেই যদি হাঁটু গেড়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে সেই থেকে বসে থাকে তবে তা কি কারণে? কিছুই বুঝতে পারছে না। এবং ঠিক আবাসের কাছে আসতেই দেখল পার্বতী ছুটে ঘেরির তলানির দিকে নেমে যাচ্ছে। ঘেরির উত্তরের দিকে কয়েকটা লণ্ঠন দেখা যাচ্ছে, ওরা যে পার্বতী এবং তাকে খুঁজতে বের হয়েছে বুঝতে অসুবিধা হল না। পার্বতী ছুটে যাচ্ছে কেন! সেও সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে থাকল। আসলে সারাদিনের নির্যাতনে পার্বতীর মাথা খারাপ হয়ে গেছে বোধহয়। সে দেখল পার্বতী তলানির সেই জলাশয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আর একের পর এক ডুব দিচ্ছে।

সে আর না পেরে ডাকল, কে আছেন, শিগগির আসুন। পার্বতী কিরকম করছে!

লণ্ঠনগুলো এবার একসঙ্গে এদিকে দ্রুত এগিয়ে আসতে থাকল।

বিবু জলে নেমে পার্বতীকে টেনে তুলতেও সাহস পাচ্ছে না। কেউ দেখলে আর একটা কেচ্ছা হয়ে যাবে। সে শুধু আর্ত গলায় ডাকছে, পার্বতী তোমার কী হয়েছে! তুমি এমন করছ কেন! উঠে এস বলছি।

পার্বতী বোধ হয় তার কোন কথাই শুনতে পাচ্ছিল না। জলে কেবল ঝুপ ঝুপ শব্দ হচ্ছে। বিরাম নেই। এক দণ্ড দাঁড়িয়ে পার্বতী দেখছে না, কে পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। জল খুব বেশি না। চৈত্র বৈশাখে হাঁটুজল ছিল। সেদিন ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় এখন কোমর জল এই জলাটায়। পার্বতীর ডুবে যাবার ভয় নেই। কিন্তু এ-বড় অস্বাভাবিক আচরণ।

সে সামনেই দেখল ললিতদাকে। সে হাঁউমাউ করে কী বলতে গেল—তারপর কেমন তোতলামিতে পেয়ে বসল তাকে—দেখ, দেখ পার্বতী কী করছে।

অনেকে এখন তার চারপাশে।

দিবু বলল, ওকে—ঘেরির ওপাশে নতুন ঘেরি হবে—ঠিক বলতে পারছি না, জায়গাটা কোথায়, দেখি চোখ বুজে অন্ধকারে হাঁটু গেড়ে বসে আছে—এই পার্বতী শোন, দেখ কপিলকাকা, সে দেখল তার বাবা জ্যাঠামশায় এবং এমনকি চিন্তাহরণও হৈ-হল্লা শুনে ছুটে এসেছে। দিবু ঠিক কিছু যেন বোঝাতে পারছে না। কপিলকাকা কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে। আমার একটা মেয়ে—কিসে পেল তাকে। হাউমাউ করে ললিতদা দু-লাফে জলে নেমে ওকে টেনে তুলতে যেতেই হঠাৎ পার্বতী আরও লাফিয়ে সরে গেল, তারপর নিজেই উঠে এসে বলল, সর সর। আমাকে ছুঁয়ো না।

সত্যি বেহুঁশ পার্বতী। সারা শরীর ভেজা বলে সুন্দর পুষ্ট স্তন ফ্রকের উপর জামবাটির মতো বসে আছে। পার্বতীর হুঁশ থাকলে এভাবে সে জল থেকে কখনও উঠে আসতে পারত না। দিবু স্নানের সময় দেখেছে, মেয়েটা বড় সতর্ক থাকে। গামছায় সারা শরীর ঢাকার কি প্রাণান্তকর ইচ্ছা তখন তার। আসলে ওর চোখে বোধহয় কেউ আর তারা মানুষ নেই। সব অমানুষ। অমানুষের কাছে নারীর লজ্জা কি!

বড় শূন্য দৃষ্টি চোখে পার্বতীর। সোজা থানের দিকে হেঁটে যাচ্ছে।

দিবু এক এক করে তার সব অভিজ্ঞতার কথা সবাইকে বলছে। ওর জ্যাঠামশায় কেমন বিমূঢ়ের মতো ভিড়ের সঙ্গে হাঁটছেন। দিবুকে খুঁজতে বের হয়েছিলেন। দিবু তাহলে পার্বতীকে খুঁজতে গেছিল। তারপর দিবুর মুখে সব ঘটনা শুনে এই প্রকৃতির এক অদৃশ্য লীলা-খেলার কথা মনে পড়ছে। কে হবে সেই নারী বনমালীর শিয়রে বসে! তিনি কি দেবী—মা মনসা। তিনি কি বনমালীর শিয়রে বসে তাকে পাহারা দিচ্ছেন। কারণ, জনমানবহীন কোনো নির্জন মাঠে গভীর অন্ধকারে এমন কোন নারী আছে যার এমন দুর্জয় সাহস হতে পারে!

দিবু যে ভয়ে মূর্ছা গেছিল, ছোট হয়ে যাবে ভেবে তা প্রকাশ করছে না। কেবল বলছে, আমার কেমন এক ধন্দে পেয়ে গেল।

কপিল এগিয়ে গিয়ে মেয়ের সামনে দাঁড়াল।—কোথায় যাচ্ছিস পার্বতী? ওদিকে না। বাড়ি চল।

যতীন ওঝা সহসা কপিলকে টেনে ।নল পাশ থেকে।—আরে তুমি করছ কি! ও কি তোমার আর মেয়ে আছে। দেখছ না চোখ-মুখ। দেবী ভর করেছেন। কোথায় যায় দেখ।

পটল ডাকল, ও দিদি।

যতীন ওঝা লাফিয়ে পটলের কাছে গেল। বলল, আয় বেটা কোলে আয়। দিদির কাছে এখন যেতে নেই।

এবং এভাবে দেখা গেল, এক ভিড় চারপাশে লণ্ঠন হাতে। বলাবলি করছে তারা, কোথায় কবে কার উপর দেবী এসে ভর করেন, তাকে দিয়ে বসতের মঙ্গল-অমঙ্গলের কথা বলিয়ে নেন কীভাবে কে জানে! একজন গেছে, আর কে যাবে, ভরের মধ্যে দেবী তাও বলে যাবেন। রক্ষা পাবার বিধানও দিতে পারেন। তাই কেউ এখন আর এখানে কারো শত্রু নয়। সবাই অমোঘ সেই বাণী শোনার অপেক্ষায় যেন কিছু পুতুলের মতো পার্বতীর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে। কপিলও কেমন অসহায় দর্শক। তার যেন আর পার্বতীর উপর কোনো জোর নেই। বরং মনে হল, পার্বতীর এখন তার মার শাড়িখানা দরকার। কিংবা নতুন যে শাড়িখানা সে কাঁসার বাসন বন্ধক রেখে এনে দিয়েছিল, সেখানাও এনে দিতে পারে। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটল বাড়ির দিকে। শাড়িখানা এনে থানে ছুটে যেতেই দেখল, পার্বতী লম্বা হয়ে থানে পড়ে আছে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ এক দেবী। গায়ের ফ্রক প্যাণ্ট সব খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

যতীন ওঝা বসে নেই। সে ছুটে গেছে বাদ্যকর ডাকতে। জয় বিষহরি বলে চিৎকার করছে। মা মনসার এত কৃপা! আর কোন ভয় নাই। সে ঘরে ঘরে খবর দিয়ে গেল। বাড়ি বাড়ি বলে গেল। দেবী আবির্ভূতা হয়েছেন। আপনারা তেল সিঁদুর ধান্য দূর্বা যার যা কিছু আছে নিয়ে চলে যান। দিবু নিজের মধ্যে এক দংশনের

জ্বালায় তখন কড়মড় করছে। কপিল কি করবে বুঝতে পারছে না।
উপেন রায় গম্ভীর গলায় বলল, শাড়িখানা ধোওয়া তো!

কপিল মাথা ঝাঁকাল।

চিন্তাহরণ বলল, আলগা করে ছুঁড়ে দাও। দেখ যেন ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়।

দিবু আর পারছে না। নারী উলঙ্গ হয়ে গেলে এমন বীভৎস দেখায় সে যেন এর আগে আর কখনও টের পায়নি। সে তার লজ্জা, অহংকার সব তুচ্ছ করে কপিলকাকার হাত থেকে শাড়িটা নিয়ে ধীরে ধীরে তা দিয়ে পার্বতীর শরীর সুন্দর করে ঢেকে দিল। সে যে পুরুষ মানুষ, পার্বতী যে কত সুন্দর দেখতে তাকে দেখানোর জন্য মার শাড়ি পরে উবার কাছে এসেছিল—এখন যেন সেটা সে পুষিয়ে দিচ্ছে। তোমারটা আবার তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম পার্বতী। ভাল হলে আমার কাছে এস। আমি তোমার জন্য অপেক্ষায় থাকব। তারপর ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে উঠে যাবার সময় মনে হল, হ্যাজাক জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাদ্য বাজছে। আর ধ্বনি দিচ্ছে বসতের লোকজন মিলে, দেবী মনসা কৃপা করেন অন্ত্যজনদের।

॥ তৃতীয় পর্ব ॥

সাপে কাটা বনমালীকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আর কোন ছজ্জোতি হয়নি। দিবুও খুব বেঁচে গেছে। প্রায় সবাই যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। কারণ, বনমালীর বাবা-কাকারা এসে বলেছে, সাপের লেখা বাঘের দেখা কপালে থাকলে হয়। কেউ দায়ী এজন্য তারা ভাবে না।

চিন্তাহরণ বিষয়টি গুলিয়ে দেবার চেষ্টা যে না করেছে তা নয়, কিন্তু দিবুদের পরিবার সম্পর্কে, তার বাপ-কাকা সম্পর্কে একটা সম্ভ্রমবোধ আগেই ফটকি-বোনদি ওদের মধ্যে চাউর করে দিয়েছে। ফলে বনমালীর কাকা শুধু এসে বলেছিল, কিছু লোকের দরকার। ভাবছি, আউশগ্রামে নিয়ে যাব। সেখানে গেলে যদি কিছু হয়।

ললিত-তারা দল বেঁধেই গেছিল। কারণ সাপে-কাটা বনমালীকে যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে পাচার করে দেওয়া যাবে তত হাল্কা হতে পারবে তারা।

এই সব কারণে এই খেরির নয়া আবাসে ক'দিন বিষয়টা নিয়ে খুব উত্তেজনা গেছে। বিশেষ করে পার্বতীকে নিয়ে। মনসার থানে পার্বতীর সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে থাকার পর সারারাত ঢাক বেজেছে ধূপ জ্বালানো হয়েছে। মনসার থান থেকে যতীন ওঝা নড়েনি। এমন একটা সুযোগ আসবে সে বুঝতেই পারেনি। তার নানান রকম ফন্দি মাথায় গজাচ্ছিল। আজকাল সে থানেই পড়ে থাকে। আরও দুটো সাপে-কাটা রুগী এসেছিল। রুগী দু'জনকে সে ভাল করে তুলেছে। এতে সে যে ওঝা, বিষহরির বরপুত্র, এমন একটা গুজব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। রুগী এলেই আর যা হয়, সে প্রথমে ছুটে যায় পার্বতীর কাছে। বিষহরির পুজা দেয়। পূজার সব কাজ পার্বতীকে দিয়ে করায়।

আজকাল থানে সিঁদুর-শাঁখা পড়ে। লালপেড়ে দু'খান শাড়িও পড়েছে। যতীন ওঝা একখান দিয়ে এসেছে পার্বতীকে। বিষহরির সেবায় পার্বতীকে বড় দরকার যতীনের। পার্বতীর উপর দেবী ভর করেন, একখানি লাল পেড়ে শাড়ি না হলে মানাবে কেন পার্বতীকে।

সকালে দিবু ঘুম থেকে উঠে দেখল, বাইরের ঘরের বারান্দায় জ্যাঠামশাই কার সঙ্গে কথা বলছেন। বাড়ির ভেতর থেকে চা গেছে। বেলায় ঘুম ভাঙলে শরীরের জড়তা কাটতে সময় লাগে। সে গোয়ালবাড়ির ওদিকে হেঁটে যাচ্ছিল। বারান্দা থেকে কথাবার্তা কানে আসছে। জমির দর এবং চাষবাসে কিরকম সুবিধা—লোক ক'জন জ্যাঠামশায়ের কাছ থেকে জেনে নিচ্ছে। সে বুঝতে পারল, এরা সবাই চিন্তাহরণের লোক। মানুষটি যে ধূর্ত তা বোধহয় এদের জানা। জমির বিলি-বন্দোবস্ত করতে এসে এক-ফাঁকে জ্যাঠামশায়ের পরামর্শ নিয়ে যাচ্ছে।

জ্যাঠামশায়ের কথা তার কানে আসছিল।

দেখুন আমি যা জানি বললাম। দরকার হলে আরও খোঁজ-খবর নিন। তবে জমির দর বেড়ে যাচ্ছে দেখছেন ত' দু-বছরে খোরকে কত পরিবার চলে এসেছে। যে-ভাবে লোক আসছে, তাতে করে খোরের জমি বছরখানেকের মধ্যে বিলি বাট্টা শেষ হয়ে যাবে। সুযোগ হাতছাড়া করা ভাল না।

ওদের একজন বলল, বিঘাপিছু ধানের ফলন কেমন পাচ্ছেন?

চিন্তাহরণবাবু বলল, ফেলে-ছড়ে বিশ মণ।

সে ত সব প্রকৃতির লীলাখেলা। সদয় হলে মা লক্ষ্মীর অনন্ত কৃপা। বিশ না হলেও দশ-বার মণ হয়ে যায়। জমি খুবই উর্বরা। তবে বান-বন্যার বড় ভয়। ঐ একটা ভয়ই নাকি এ-অঞ্চলে মানুষজনের বসতি হতে দেয়নি। কেউ সাহসই করেনি এমন গহীন বনের খোরের পাড়ে আবাস বানায়। তবে দেখুন যাদের উপায় আছে, তাদের এখানে না আসাই ভাল।

দিবু জানে জ্যাঠামশাই এ ধরনের কথাই বলে থাকেন। কিছু গোপন করেন না। সেও এসে স্টেশনে নামার সময় শুনেছে, বানভাসি জল তো দেখেনি, দেখবে যখন তখন পার পাবে না। দু-বছরের মধ্যে অবশ্য তেমন বান-বন্যা হয়নি। গত বছর খরা গেছে। তার আগের বছর খরা না হলেও খুব একটা সুবিধার বছর ছিল না। বর্ষায় হিজলের বিল জলে ভেসে গেছিল ঠিক, তবে ঘেরির পাড় ডুবিয়ে দিতে পারেনি। দিবু জানে, তারা জলের দেশের মানুষ, তাদের দেশেও জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় থেকে আশ্বিন-কার্তিক মাস পর্যন্ত মাঠ-ঘাট সব জলের তলায় থাকে। কার্তিক মাস থেকেই নদীতে টান ধরে তখন জল নেমে যায়। অঘ্রান-পৌষে শীতের মাঠ, আর্দ্রতা যাও থাকে জমিতে, মাঘ-ফাল্গুনে মাটিতে ধুলো ওড়ে। কে বলবে তখন এই সেদিন সব মাঠ-ঘাট জলের তলায় ছিল। বাবা-জ্যাঠারা জলের দেশের মানুষ বলেই জীবনে এই ঝুঁকি নিতে সাহস পেয়েছেন।

সরকার থেকে রাস্তার ধারে যে টিউকলটা করে দেওয়া হয়েছিল, তা ছিল এতদিন বাতিল। বর্ষার মেঘ জমতে শুরু করেছে। তারপর ক'দিন খুব বৃষ্টি হয়েছে। বাতিল টিউকলটায় আবার জল উঠছে খরার সময় যে কুয়ো খোঁড়া হয়েছিল, এখন আর সেখানে এ পাড়ার কেউ যায় না। সকালে কলতলায় ভিড় থাকে। পার্বতী, পটল, ফটকিবোনদি সবাই কল-পাড়ে। পার্বতী জল নিয়েই চলে যাচ্ছে। সে একবার শুধু চোখ তুলে দিবুকে দেখেছিল। দিবুকে কোথাও দেখলেই সে সেখান থেকে কতক্ষণে সরে পড়বে তার চেষ্টায় থাকে।

পটল কিংবা কপিলকাকা হয়ত সব বলেছে পার্বতীকে। তার ঘেরির তলানিতে ডুব দেওয়া, ঘোরের মধ্যে পড়ে গিয়ে ফ্রক-প্যান্ট সব খুলে হেঁটে যাওয়া—অর্থাৎ কিনা পার্বতী সেদিন বেহুঁশ অবস্থায়

দিবুদার সামনে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে হেঁটে গেছিল। একজন উঠতি বয়সের মেয়ের পক্ষে এমন দুর্ঘটনা চরম লজ্জার। এ-জন্য দিবুকে দেখলে পার্বতী আর সেখানে একদণ্ড দাঁড়ায় না।

তার কেন জানি মনে হল, পার্বতীকে কিছু তার বলা দরকার। বনমালীকে সাপে কাটার পর পার্বতীর সেই বেহুঁশ হয়ে পড়ার বিষয়টা নিয়ে কিভাবে কথা বলবে বুঝতে পারে না। সেই ঘটনার পর কপিলকাকারও কি হয়েছে—তাকে দেখলে কেমন এড়িয়ে যায়। কথা বলে না। পার্বতীকে কপিলকাকা একটা শাড়ি কিনে দিয়েছে। থান থেকে এসেছে একখান শাড়ি। এ-ছাড়া কাঁসার থালা বন্ধক দিয়ে যে শাড়িটা এনে দিয়েছিল কপিলকাকা, তা পরেও পার্বতীকে বের হতে দেখেছে। আগের মতো ফ্রক গায়ে এবং একটা গামছায় গা ঢেকে পার্বতীকে গরু-বাছুর মাঠ থেকে নিয়ে আসতে হয় না। জল আনতে হয় না। পার্বতী শাড়ি পরলে বড় দীর্ঘাঙ্গী মনে হয়। এতদিন মেয়েটাকে ফ্রক পরিয়ে কপিলকাকা যেন পার্বতীর বয়স কমিয়ে রাখার চেষ্টায় ছিল।

এখন কলে ক্রমশ ভিড় বাড়ছে। কল-পাড়টা ফাঁকা হতেই সে হাতমুখ ধুয়ে ফিরে এল। বারবাড়ির ঘরের বারান্দায় যারা বসেছিল, তারা উঠে যাচ্ছে। দিবুকে দেখে বলল, এই আপনার সেই ভাইপো।

জ্যাঠামশাই বাইরে বের হয়ে ওদের রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিচ্ছিলেন। দিবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, হুঁ···এবারে মেট্রিক পাস করল। এখানে এই একটা অসুবিধা। স্কুল-কলেজ নেই। দু' ক্রোশ হেঁটে গেলে সাঁটুইতে একটা জুনিয়র হাইস্কুল। কলেজ বলতে বহরমপুর, না হয় কাঁদি। রাজ কলেজে ইচ্ছে আছে ভর্তি করার, কিন্তু সমস্যা এই বর্ষাকালটা। বিল জলে ভেসে যায়। বড় অগম্য হয়ে ওঠে।

যারা কথা বলছিল, সবাই প্রবীণ। একজনের মাথায় লম্বা

টিকি। খাটো ধুতি পরনে। বগলে তালিমারা ছাতা। অন্য তু'জন বেশ ধোপ-দুরস্ত। প্যান্ট-শার্ট পরনে। পায়ে বাটার কাবলি সু। ফণীর বাবার সম্পর্কে আত্মীয়। ওরা এখানেই উঠেছে। গাঙ্গুলী চলে যাবার কথা।

ওরা দিবুকে খুঁটিয়ে দেখছিল। 'দবুর তখন কেমন অস্বস্তি হয়। জ্যাঠামশাই কিংবা ফণীর বাবা তার সম্পর্কে বিস্তারিত খবর দিয়ে দিয়েছে ঠিক। এই নতুন আবাসে এমন হীরের টুকরো ছেলে আছে, এমন বলে বসবাসের জায়গাটা নেহাত ফেলনা নয়, এমন একটা প্রমাণের চেষ্টা থাকে। সে আর দাঁড়াতে পারল না। ভিতর-বাড়িতে ঢোকার জন্য হাঁটা দিল।

শোনো।

সে তাকাল পেছনে।

এদিকে এস। জ্যাঠামশাই ডাকলেন।

সে গেলে বললেন, এঁরা হামচাদির কবিরাজ বাড়ির লোক। তোমার মামাকে এঁরা চেনেন। এঁদের প্রণাম কর।

এই এক ল্যাটা। সে প্রণাম না করে পারে না। এই যে পার্বতীকে কেন্দ্র করে, সে কিছুটা পরিবারের মর্যাদা নষ্ট করেছিল এঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে সেটা আবার ঝালিয়ে নেবার চেষ্টা করছেন জ্যাঠামশাই। পার্বতীকে সে একা মাঠে খুঁজতে গেছিল বলে, জ্যাঠামশাই পরদিন তাকে শাসন করছিলেন।

এটা তোমার উচিত হয় নি। সাপ-খোপের দেশ। অন্ধকারে তুমি বের হয়ে গেলে, কাউকে কিছু না বলে, ঠিক কাজ করনি। দেশ ছেড়ে এসে আমরা এমনিতেই অথৈ জলে ভাসছি, তার ওপর তোমাদের যদি এমন মতিগতি হয় তবে কোন আশায় বেঁচে থাকব।

জ্যাঠামশায়ের কোথায় কষ্ট, দিবু সহজেই বুঝতে পারে। পার্বতীর কেচ্ছার সঙ্গে তাঁর পরিবারকে কিছুতেই জড়াতে চান না। কাপিল-কাকাও সেজন্য তাদের এড়িয়ে চলছে বোধহয়।

দিব্যেন্দু কিছুক্ষণ কি ভেবে উদাস চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল। বৃষ্টি হওয়ায়, ঘোর এবং তার চারপাশের এলাকার রুক্ষ ভাবটা কেটে গিয়ে এখন শুধু সবুজের সমারোহ। ঘেরির জমিতে পাট চাষ, ধান বোনা শেষ। আবাদের মানুষজন সব এখন এই জমির মধ্যে নেমে যাচ্ছে। কোথাও নিড়ানি দেওয়া হচ্ছে, কেউ জমিতে আগাছা তুলে ফেলার জন্য আঁচড়া দিচ্ছে। বৃষ্টি হওয়ায় গাছের গোড়ায় মাটি বসে গেছে। আঁচড়া দিয়ে সেই গোড়া সামান্য আলগা করে দেওয়া হচ্ছে গাছগুলির। প্রখর রোদ উঠেছে এই সকালবেলায়। সর্বত্র রোদের ঝিলিক—ঢেউ খেলে যাচ্ছে নিরন্তর। দিগন্তব্যাপ্ত এই বিশাল বিলের অসীম রহস্য তাকে মাঝে মাঝে কেমন আনমনা করে দেয়। মাস তিনেকের মতো হয়ে গেল—এর মধ্যে তার পাসের খবর এসেছে। রাজ কলেজে ভর্তি হওয়া নিয়ে একটা দ্বিধা রয়েছে জ্যাঠামশায়ের। বর্ষায় সব ডুবে গেলে, চার-পাঁচ ক্রোশ রাস্তা উজিয়ে কলেজ করা কঠিন। এখনও ঠিকই হয়নি কোথায় শেষ পর্যন্ত তার পড়াশোনার ব্যবস্থা করবেন বাবা-কাকারা।

সকালে উঠে তার করার কিছু থাকে না। ললিতদার চায়ের দোকানে গিয়ে কিছুটা সময় কাটিয়ে আসতে পারে। বাড়ির চাষবাস দেখার জন্য নতুন কাজের লোকটি যাবার সময় তাকে দেখে গেল—সে একা দাঁড়িয়ে আছে। ললিতদা তার পাসের খবরে খুব খুশি। তাকে ললিতদা আরও সমীহ করতে শুরু করেছে। এ তো শুধু পাস নয়, আরও কিছু। প্রথম বিভাগে তার নাম আছে শুনে ললিতদা লাফিয়ে উঠেছিল। তুলিদিকে বলেছিল, দিবুকে একটা ডিমের ওমলেট করে দাও। কেক দাও। ও আমাদের কত বড় গর্ব জান না। বুক আমার ভরে গেছে।

চায়ের দোকানে গেলে ললিতদা তাকে নিয়ে কি করবে ভেবে পায় না। অথচ সে বোঝে জ্যাঠামশায়ের পছন্দ না, সে অহরহ সেখানে যায়। চায়ের দোকানে আড্ডা মারলে পরিবারের কোথাও

যেন মর্যাদায় হানি ঘটে। বিশেষ করে পার্বতী এবং তুলিদিকে নিয়ে এই নতুন আবাসে যে কেচ্ছা শুরু হয়েছে, তারপর কতটা সমীচীন এদের সঙ্গে মেলামেশা করা, সে ভেবে উঠতে পারে না। পার্বতীকে দেখলে সে বুঝতে পারে আড়ালে মেয়েটি থাকে ঠিক, তবে তার দিবুদা ছাড়া জীবনে বড় কোনো স্বপ্ন নেই। রাত করে বাড়ি ফিরলেও তার ভাবনা। অথচ পার্বতী এখন তাকে দেখলে একদণ্ড আর সেখানে দাঁড়ায় না। কোথাও আড়াল-আবডাল খোঁজে।

এই তিন মাসের মধ্যে দিবুর সঙ্গে বড় কম কথা হয়েছে পার্বতীর। আগে একরকমভাবে আড়াল-আবডাল খুঁজত, সেটা দু'জন কিশোর-কিশোরী মুখোমুখি পড়ে গেলে যেমনটা হয়ে থাকে। এখন যেন তা-না। বরং মনে হয় দুই পরিবারের মধ্যে একটা তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে। পটলও আগের মতো তাকে দেখলে যেন উৎসাহ পায় না। আগে উষাকে এসে পটল তার দিদি পার্বতীর সব খবর দিয়ে যেত। এখন যেন দুই সংসারেই বনমালীর মৃত্যু নিয়ে একটা ঠাণ্ডা-লড়াই জমে উঠেছে।

দিবু এতে মানসিক দিক থেকে কষ্ট পায়। না কি জ্যাঠামশাই অথবা মা-জেঠিমারা বুঝে ফেলেছেন পার্বতীর প্রতি দিবুর দুর্বলতা আছে। কপিলকাকা একা মানুষ। অভাবী মানুষ। বিঘা দুই ভুঁই সম্বল। গরুটার বাচ্চা হওয়ায় কিছুটা সাশ্রয় হয়েছে সংসারে। গোয়ালা দুধ নিয়ে যায়। সকাল থেকে পার্বতীর কাজ গরু মাঠে দিয়ে আসা, গোবর তুলে রাখা। রুটি করে ভাই এবং বাপকে খাওয়ানো। এক হাতে সে-সব করে যায়। বনমালীর সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য বাবাই কপিলকাকাকে বলেছিলেন। কপিলকাকা রাজী হয়নি। তার বংশমর্যাদায় লেগেছে। দিব্যেন্দু ভাবল, তবে কি বাবা টের পেয়েছিলেন, পার্বতীকে পার করে দেওয়া দরকার। শ্যামলা রঙের বড় বড় চোখের এই মেয়েটির গায়ে-পায়ে এমন আশ্চর্য লাবণ্য আছে, যা যে-কোনো যুবকের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে। তাঁর পুত্রটি এখন

গৌরব করার মতো। তাঁর পক্ষে একজন খোঁড়া বামুনের মেয়ের প্রতি দুর্বলতা সৃষ্টি হোক তাঁর পুত্রের, বোধহয় পছন্দ করতেন না। সে-জন্যই কি কপিলকাকা অভিযোগ করলে বাবা বলতেন, বয়সকালে ও হয়ে থাকে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে যখন শিস দেয়, বাড়ি থেকেও কেউ সেই শিস শুনতে পায়। কেউ না শুনলে, কে আর মাঠে বসে বাঁশি বাজায়। মেয়ের বয়স হয়েছে—বিয়ে দিয়ে দে। দেশ-ছাড়া মানুষ আমরা আমাদের অত দেখলে চলে না।

কপিলকাকা এমন কথায় বড় ক্ষেপে যেত। কিংবা কপিলকাকার মনেও কি কোনো আশার বাতি জ্বলছে তাঁকে নিয়ে। তা না হলে তাকে দেখলেই বলত কেন দিবু আমাদের বাড়ি আসিস। পটলটা কেবল দিবুদা দিবুদা করে।

অবশ্য সে কোনোদিন যায় নি। রাস্তা দিয়ে যাবার সময় তবু কেন যে তার চোখ কপিলকাকার বাড়ির দিকটায় চলে যেত। পার্বতীকে দেখার আগ্রহ থেকে এটা হয় সে বুঝত। কিন্তু ঐ যে বলে না সামনে এক বিশাল প্রান্তর, খাঁ-খাঁ মাঠ, আরও এক স্বপ্নের দেশ থেকে যায়—সেখান থেকে অন্য কেউ উঠে আসে। পার্বতীকে দেখার লোভ থাকলেও ভালবাসা যায় কিনা, সে এখনও ভেবে দেখেনি।

তবে সে পার্বতীকে খুঁজতে গেল কেন?

এটা একটা ধন্দ মনের মধ্যে

পার্বতী অন্ধকার রাতে কোথায় যেতে পারে। সাপে-কাটা বনমালীর কাছে! শেষ দেখা দেখবে। থানে এনে বনমালীকে রাখলে সবাই সাপে-কাটা বনমালীর অসাড় দেহটা দেখে এসেছে। ললিতদাদের সঙ্গে সেও ছিল সেখানে। কিন্তু পার্বতীকে দেখেনি। পার্বতীর কথাতেই বনমালা ঘোর ধরে উত্তরের তালবনের দিকটায় গিয়েছিল সে আর ললিত ফিরছে কিনা দেখতে। পার্বতীর এই যে উচাটন তার দিবুদাকে নিয়ে সেটা কি। সেটা কেন। আর তার জন্যই শেষ পর্যন্ত বনমালী কালের মুখে পড়ে গেল। পার্বতীর কাছে কে

বেশি কাছের মানুষ, সে না বনমালী! পার্বতীর একবার অন্তত বনমালীকে দেখতে যাওয়া উচিত ছিল। বাড়ি ফিরে এবং ললিতদার মুখে শুনে সে স্তম্ভিত হয়ে গেছে—কপিলকাকা শাসিয়েছে গেলে খুন করে ফেলবে। সুতরাং সেই থেকে সন্দেহ—পার্বতী গেছে বনমালীর কাছেই। বনমালীকে আবাস ছাড়িয়ে, ঘেরি পার হয়ে বিশাল এক মাঠের মধ্যে রেখে আসা হয়েছিল, তার আত্মীয়স্বজন এলে তাকে নিয়ে যাবে সেখান থেকে। মাথার কাছে একটা হারিকেন জ্বালিয়ে রাখা হয়েছিল, অনেক দূর থেকেও যেন দেখা যায় বনমালীকে কোথায় ফেলে রাখা হয়েছে। বনমালীকে দেখার জন্য সেখানে পার্বতী গোপনে চলে গেছে মনে হতেই সে স্থির থাকতে পারেনি। অথবা আত্মহত্যা-টত্যা এমন কিছু। তার যে কি হয়েছিল তখন! পারিবারিক মর্যাদার প্রশ্নটিও মাথায় ছিল না। সে পার্বতীকে খুঁজতে বের হয়ে গিছিল—একটা টর্চ হাতে নিয়ে। এটা কেন!

মাসখানেক ধরে দিব্যেন্দুকে বার বার এসব ভাবিয়েছে।

অনেকদিন পর যেন আজ আবার পার্বতীকে দেখল। সে আর একরকম দেখা। সবাই জানে মেয়েটার মধ্যে বিষহরির ভর করেছে। যতীন ওঝা আজকাল প্রায় সময় কপিলকাকার বাড়িতেই পড়ে থাকে। শনি-মঙ্গলবারে পার্বতীর ভর ওঠে। যতীন ওঝার বউ চিন্তাহরণের কাছে গিয়ে নালিশ দিয়েছে—কুমতলব আছে। এমন কথাও দিবুর কানে উঠেছে। পার্বতীকে একা পেলে যেন তার সেটা বলা দরকার—তুমি বোঝ না পার্বতী, যতীন ওঝা কি চায়! আয়নায় নিজেকে দেখতে পাও না।

ফের মনে হল তার কি দায় পড়েছে! এই যে ঢুলিদি ললিতদার ডেরায় পালিয়ে আছে—সেটা এখনও কেউ টের পায়নি। চিন্তাহরণকে নিয়ে ঢুলিদির বাপ থানায় গেছে, এজাহার দিয়েছে, পলাতক ঢুলি—এই পর্যন্ত। ঢুলিদি মাথা ন্যাড়া করে এখন পুরুষের মতো থাকে। পাজামা-পাঞ্জাবি গায়ে দেয়। ঢুলিদিকে খুব খুঁটিয়ে

দেখলেও মনে হয় না সে যুবতী নারী। অবশ্য ঘরের বার হয় কম। ঘেরির তলানিতে নাইতে যায় সবাই। চোখে পড়তেই পারে! ললিতের ডেরায় লোক দেখে মনে করেছে, কোনো পথিক—কিংবা মনে করেছে ললিতের কেউ হয়। সংশয় দেখা দিলে প্রশ্ন, কে এ? ললিতদা বলেছে, যাত্রাগানে সখী সাজে। ললিতদার কাকাও জানে, ললিত গানপাগলা মানুষ, তার ইয়ার-বন্ধুর খামতি নেই। কিন্তু এভাবে সেটা কতদিন! ছুলিদির মুখ তার বাপ চেনে। মুখোমুখি পড়ে গেলে কি হবে!

দিব্যেন্দু নিজেকে কেমন ভারি অসহায় ভাবল।

ছুলিদির এই পরিণতির সঙ্গে সেও জড়িত। ছুলিদিকে খুঁজতে না বের হলে বনমালীকে কালে খেত না। ছুলিদিকে ধরে আনতে গিয়েই এই নতুন আবাসে আর একটা জটিলতা সৃষ্টি হয়ে গেল। চিন্তাহরণ ছুলিদিকে পোষ মানাবার তালে ছিল। একজন বাপের বয়সী মানুষের এই লাম্পট্য তাকে পীড়া দেয়। অথচ এই নিয়ে কারো কিছু বলারও সাহস নেই। একমাত্র ললিতদাই পারে সাপের ফোঁস কি করে শুঝার লাঠিতে দমাতে হয়। দেশছাড়া এইসব মানুষজন, প্রকৃতির কূট খেলার শিকার। লোকে ঠেকে শেখে। চিন্তাহরণের তাও নেই। তার হম্বিতম্বিতে সবাই কেমন জুজু বনে থাকে। আইনবাজ মানুষের যা হয়। কুৎসিত একটা মানুষ আবাসের মাতব্বর সেজে লাঠি ঘুরিয়ে যাচ্ছে। বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে ছুলিদিকে কব্জা করতে চেয়েছিল। পারে নি।

এইসব সাত-পাঁচ চিন্তায় সে কেমন নড়তে পারছিল না। ঊষা এসে ডাকল, দাদা খেতে আয়!

সে কতক্ষণ এখানে একা দাঁড়িয়েছিল বুঝতে পারছে না। মাঝে মাঝে আকাশ মেঘলা হয়ে উঠছে—আবার কড়া রোদ, ভিজা বাতাসে আশ্চর্য ঠাণ্ডা এক ভাব। পেছনের দিকে অনেক দূরে রেল লাইন, চন্দ্রহারের মতো বিলটাকে ঘিরে রেখেছে। সকাল আটটার ট্রেন দেখা

যায়। স্টেশন পার হয়ে বাজার-সাহুর দিকে চলে যাচ্ছে। দিব্যেন্দু এই দূরবর্তী রেল লাইন এবং লাল ইটের বাড়ি দেখতে দেখতে কেমন বিহ্বল হয়ে গেছিল। উষা ডাকলে বলল, যাচ্ছি।

যাচ্ছি না। এক্ষুণি যাবি।

তাকে নিয়ে সবার মধ্যে একটা ভাবনা দেখা দিয়েছে।

সে বারবাড়ি থেকে ভেতরে ঢুকে গেল। মুলিবাঁশের বেড়া ঘরগুলোর। শণের ছাউনি। কেমন নিরাভরণ এই আবাস। গাছপালা নেই বললেই চলে। আম-জামের চারা বাড়ির পাশে যে যার মতো লাগাচ্ছে। কলাগাছের ঝোপ ইতস্তত—গাছ বলতে চোখে পড়ে এইসব। দুটো একটা পেঁপেগাছ ঘরের চাল ছাড়িয়ে ওপরে উঠে গেছে। দূরে ইতস্তত তালগাছ এবং শকুনের ওড়াওড়ি। কাক, শালিখও আসতে শুরু করেছে। আগে ছিল শিকারীদের পক্ষে এটা প্রশস্ত জায়গা। পাখি শিকার করতে আসত শহর থেকে বাবুরা। শীতকালে নাকি এইসব ঘেরির পাড়ে শিকারীদের তাঁবু পড়ত। মানুষের আনাগোনায় শীতের পাখীরা এদিকটায় আর বড় বেশি আসছে না। এই ঘেরি পার হলেই মাধবডাঙার ঘেরি। শীতকালে এখন ওখানটায় তাঁবু ফেলে শহরের জমিদারবাবুরা।

পার্বতীর জন্য উষাও আজকাল যেন কোন টান বোধ করে না। সইয়ের সঙ্গে দেখা হয় না কেন এমন প্রশ্ন করতেই বলেছিল, যত সব ঢং।

আসলে দিব্যেন্দু জানে, এই আবাসের সব বৌ-ঝিরা পার্বতীর ভর ওঠার বিষয়টা একেক রকম ভাবে নিয়েছে। ঘোরে পড়ে তার উলঙ্গ হয়ে যাওয়ার বিষয়টাও। যারা কপিলকাকাকে শত্রু-মিত্র কিছুই ভাবে না, তারা পার্বতীর ভর হওয়াকে বিষহরির করুণা ভেবে থাকে। সে জানে কপিলকাকার শত্রু এখানে তেমন কেউ নেই। তবে জমির আল কেটে মরণ তার জমি বাড়াতে গেলে, কপিলকাকা কোদাল নিয়ে তাকে কোপাতে গেছিল। জ্যাঠামশাই ফণীর বাবা এবং চিন্তাহরণ

মিলে একটা ফয়সালা করে না দিলে আদালত পর্যন্ত গড়াত। মরণকে চিন্তাহরণ এ নিয়ে ফুসলেছে—কিন্তু জ্যাঠামশায়ের কাছে এলে সতর্ক করে দিয়েছে তাকে, খবরদার কোর্টে যাস না। দুজনেই মরে যাবি। মরণদা শেষ পর্যন্ত ফয়সালা মেনে নিয়েছে। জ্যাঠামশাই নিজেই কপিলকে পাঠিয়েছিলেন চিন্তাহরণের কাছে। কারণ সালিশীতে তিনিও থাকুন এটা সবাই চায়—এমন না বোঝালে খোঁচা তখন কের দেবে কেউ বুঝতে পারবে না। চিন্তাহরণের দুর্বুদ্ধিকে সবাই ভয় পায়।

সালিশী মরণদা মেনে নিলেও তার বৌয়ের রাগ যায়নি। তুলির বাপ সেখানে তখন না থাকলে শাঁখা-সিঁদুর তার কবে সাফ হয়ে যেত। সেই বলেছে, সব পীরিতের জ্বালা গো। পীরিতের জ্বালা। ও বয়েস আমাদেরও ছিল। নাগর একখান কি এখানে এয়েছে ত্যাখ না। নাগরের দোলা বড় দোলা গো! মাথা ঠিক রাখা দায়।

এই তির্যক কথাবার্তা কাকে লক্ষ্য করে সবাই বোঝে। এটা চাউর হতেও সময় লাগে না। পাড়াগাঁর মানুষজন মানুষের নিন্দামন্দে মশগুল হতে ভালবাসে। উষা কিংবা জ্যেঠিমা অথবা কাকীমার কানেও কথাটা উঠে থাকতে পারে। উষা বোঝে তার দাদাকে ঠেস দিয়ে এ সব কথা বলা। দাদার প্রতি পার্বতীর সেই কবে থেকেই যে দুর্বলতা—এবং দাদাকে দেখাবে বলে যেদিন শাড়ি পরে এসেছিল—সেদিনটার কথাও মনে হতে পারে—তাই বলে এমন উলঙ্গ হয়ে যাওয়াকে সে বরদাস্ত করতে পারে না! ঘোষির তলানিতে পার্বতীর ডুবের পর ডুব, দাদার আর্ত চিৎকার এবং সব মানুষের নিচে জড় হওয়াটা পর্যন্ত উষা বরদাস্ত করতে পারে। কিন্তু ছোঁয়ো না, তোমরা আমায় ছোঁয়ো না বলে ফ্রক-প্যান্ট খুলে ফেলে সোজা থানের দিকে হেঁটে যাওয়া—যেন নারী জাতির কোথায় অপমান! উষা বোধ হয় সেই অপমানেই এখনও জ্বলছে। তুই না আমার সই। তোর এমন মরণ হয় কেন! তোর মুখ দেখে আর আমার কাজ নেই।

দিব্যেন্দু এ-সব ভেবে সামান্য হাসল।

কাকীমা বলল, ও দিবু, তুই নাকি বহরমপুরে থাকবি।

এটা একটা আচমকা কথা। দিবু বলল, কে বলেছে!

তাই ত শুনছি।

বহরমপুরে সে থাকবে কেন! সেখানে ত' তাদের কোনো আত্মীয় নেই। ছোটকাকা সেই সকালে বের হয়ে গেছে। রাতে ফিরবে। ওখানে একটা কাজ করে ঠিক, তবে কাজটা করার ফাঁকে কোন ব্যবসা-ট্যাবসা করা যায় কিনা ঘুরেফিরে দেখছে।

জ্যাঠামশাইও একদিন বলেছিলেন, যা জায়গা, শহরে আমাদের কারো থাকা দরকার। অসুখ-বিসুখ আছে, লেখা-পড়া আছে। দিবুর মনে হল, কাকীমা বোধ হয় জ্যাঠামশায়ের এই দুর্বলতার জের ধরে এখান থেকে কাকাকে নিয়ে কেটে পড়ার তালে আছে।

দিব্যেন্দুর সামনে কাকীমা খাবার রেখে যাবার সময় এমন বলে গেল।

বাড়িতে কি তাকে নিয়ে কোনো ষড়যন্ত্র চলছে। কারণ এ ধরনের কথার মানে সে ঠিক বুঝতে পারে না। খুবই উটকো কথ মনে হচ্ছে। 'বহরমপুরে থাকবি' কথাটা ওঠে কি করে! কাকা কি জ্যাঠামশায়ের কাছ থেকে কোনো ইঙ্গিত পেয়েছেন। বাড়ির সবার অভিভাবক বলে, তাঁর কথাই শেষ কথা। মা-জেঠিমা কিছুট সেকেলে। বাড়ির ছেলে-পুলের কার কি ব্যবস্থা হবে, তা ঠিক করবেন তিনি। এমন কি দিবু জানে, জ্যাঠামশাই বাবার সঙ্গে এ-বিষয়ে কোনো পরামর্শ করতে নাও পারেন। যেহেতু কাকা রোজ বহরমপুরে যায়, সাইকেলে চুমড়িগাছা স্টেশন, সেখান থেকে রেলে খাগড়াঘাট, তারপর বাসে কিছুটা এবং খেয়া পার হলে শহর— কাকাকেই হয়ত বলে দিয়েছেন, কি করতে হবে না হবে। কাজেই কাকীমা, জানতেই পারে। এটা যে উটকো কথা নয় এব জ্যাঠামশাই যে এখান থেকে তাকে সরিয়ে দিতে চান, এমন সংশয়

দেখা দিতেই সে রান্নাঘরে ঢুকে গেল। বলল, এই ছোট কাকী, কে বলল, বহরমপুরে থাকব!

ওরে বাপ, তোকে দেখছি বলেই ভুল করেছি।

তার মানে!

মানেটানে বুঝি না বাবা। আমাকে জ্বালাবি না, যা।

কেন তবে বললে! আমি এক্ষুণি জ্যাঠামশায়ের কাছে যাচ্ছি।

এই শোন যাস না।

গরমে ঘামছিল কাকী। আলো হাওয়া ঢোকে না ঘরে। খুবই ছোট ঘরটা। সকালের ঝামেলাটা সেরে দিলেই ছোট কাকীর ছুটি। এইটুকু করতেই কেমন প্রাণান্ত। কাকী শহরের মেয়ে। দেশের বাড়িতেও কাকীর কষ্ট হত বলে বছরের বেশী সময়টা শহরে থাকতে পছন্দ করত। জ্যাঠামশাই প্রথম প্রথম নতুন বৌ বলে বরদাস্ত করতেন, পরে সাফ্ জ্যাঠামশাই জানিয়ে দিয়েছিলেন, গাঁয়ে থাকবে জেনেই ত' বিয়ে দিয়েছিলেন—যদি নিয়ে যান, আবার ফিরিয়ে না দিয়ে গেলেও চলবে।

কাকীর বাবা ফের নিতে আসার আগে কাকার কাছ থেকে খবর নিতেন, তাঁর মেজাজ কেমন। কখনও কাকী নিজেই লিখেছে, এখন নিতে এস না। মেজাজ ভাল না। সামনে জন্মাষ্টমী। বাড়ির বৌ বাপের বাড়ি যাবে শুনলেই খাপ্পা হয়ে যাবে।

তবে বল কেন এ-কথা বললে!

তোর কাকাকে বলেছেন, বহরমপুর কলেজেই তোকে ভর্তি করতে।

ঠিক হয়ে গেছে?

প্রায়।

অতোদূর যাব কি করে?

যাবি না থাকবি।

শহরে থাকার মধ্যে রোমাঞ্চ আছে। এটা দিবু বোঝে। কিন্তু

কোথায় যেন একটা কাঁটা—যেন এখান থেকে সরিয়ে দেবার জন্য জ্যাঠামশাই গোপনে সব ঠিকঠাক করে ফেলেছেন। এখানে থাকলেই পার্বতীর এঁটো তার গায়ে লেগে যাবে এমন একটা আশঙ্কা পরিবারের মধ্যে গজিয়ে উঠেছে। বাবাও ক'দিন তার সঙ্গে ভাল করে কথা বলে নি।—কি দরকার ছিল তোমার পার্বতীকে খুঁজতে যাওয়ার। বাবা জ্যাঠার দিকটা দেখলে না। দেশ ছেড়ে সব গেছে, বাকি আছে এটুকু। এই বয়সে নষ্ট হয়ে গেলে সংসারের গৌরবের দিকটা খাটো হয়ে যায়।

মা এ-সব ব্যাপারে নীরবই থাকে। মা-মরা মেয়ে পার্বতীর জন্য বরং একটা কষ্ট আছে তার। কপিলকাকাও মাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে। মা'ই একমাত্র পালিয়ে ওদের বাড়ি যায়। দরকারে কপিলকাকাকে সান্ত্বনা দিয়ে আসে। কপিলকাকার তখন কান্না—এমন লক্ষ্মী মেয়েটা এমন হয়ে গেল আমার কোন্ পাপে।

এখনও এই নতুন আবাসে একমাত্র পটল আর কঙ্কণের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়নি। তারাই দু-বাড়ির মধ্যে যাওয়া-আসা করছে। কঙ্কণ দিবুর ছোট ভাই। চঞ্চল বালক। এই ঘেরির সর্বত্র সে আর পটল এবং তার মতো নাবালকেরা মুক্ত মনে বেড়াতে পারছে। পটল অবশ্য আগের মতো দিবুকে দেখলে দৌড়ে আসে না। তার দিদির সঙ্গে দিবুদার কিছু একটা হয়েছে এমন বোধ হয় আঁচ করতে পারছে। ডাকলেই দিবু দেখেছে, ছুটে পালিয়ে যায়। প্রথমদিকে এটা খুবই বেশি ছিল। এখন এতোটা আর নেই।

সে একদিন ডেকে বলেছিল, তোর দিদি কিছু বলে রে?

কী বলবে বুঝতে পারে না। দিবুর দিকে বোকার মতো তাকিয়ে থাকে।

যতীন ওঝা কখন আসে?

এমন প্রশ্নের সে ঠিক জবাব দিতে পারে নি।

তারপর মনে হয়েছে, পটলকে এমন প্রশ্ন করা ঠিক না। কি

নিয়ে পার্বতীর সঙ্গে কথা আরম্ভ করবে এতোদিন ধরে তারও যেন কোনো সূত্র খুঁজে পাচ্ছিলো না। যদি সত্যি তাকে শহরে চলে যেতে হয়, তবে পার্বতীকে সে একটা খবর দিতে পারবে এবং পার্বতীর সঙ্গে সে যে কথা না বলে থাকতে চেষ্টা করছে, মনের দিক থেকে তাতে তার সায় নেই এমনও বোঝাতে পারবে পার্বতীকে।

ললিতদাকে তার শহরবাসের খবরটা দেওয়া দরকার---এই ভেবে সে ঘেরির পাড় ধরে হাঁটতে থাকল। আচার্য পাড়া পার হয়ে গেলেই ললিতদার চায়ের দোকান। এখন দোকানে লোকজনের একটু ভিড় বেশি। ললিতদা একাই দোকান সামলায়। ঘেরির পাড়ে পাড়ে বছর দুইয়ের মধ্যে অনেক ঘরবাড়ি উঠে গেছে। আরও লোকজন আসছে। পুরোদমে চাষবাস শুরু হয়েছে। ধানের জমিতে কাজ করতে করতেও কেউ ললিতদার দোকানে এককাপ চা, একটা লেড়ো বিস্কুট খেয়ে বিড়ি খায়। এখানেই ঘেরির একমাত্র একটা সবেধন নীলমণি গাছ, যার তলায় কেউ কেউ বিশ্রাম নেবার সময় বলে, মানুষের হাত লাগলে জমি কথা বলে। ঘেরির মাইলখানেক তলানি এখন আউশ ধানের চারায় সবুজ। উর্বরা শস্যক্ষেত্র। পাটের ডগাগুলি লকলক করছে।

রাস্তায় বের হয়ে এলেই দিব্যেন্দু বোঝে তার দিকে সবার নজর। সে আজকাল হাফপ্যান্ট পরতে লজ্জা পায়। পাজামা-পাঞ্জাবি পরে। কলেজে ভর্তি হবে এটা তার কাছে বড়ই অহংকারের বিষয়। সে হেঁটে যায় যখন তখন তার চলা-ফেরাতে এটা ধরা পড়ে। এখান থেকে পড়লে সে এই পরিবেশে মানুষ হতে পারবে না—জ্যাঠামশায়ের এমন ভাবনায় সে শুধু রুষ্ট। আসলে প্রকৃতির এক সুষমা তৈরি হয়ে যায়। অগম্য এই জায়গাও তার কাছে কেমন এক দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। রোজ কলেজ থেকে সাইকেলে ফিরে আসার পথে পড়ত ললিতদার দোকান, ফণীদের পাড়া, ফণীর দিদি জানালায় দাঁড়িয়ে তাকে গোপনে দেখত। শহরে থেকে পড়লে জীবনের এই

বড় আকর্ষণটা সে হারাবে। পার্বতী ঘেরির পাড়ে কিংবা মাঠে গরু দিতে এসে বারবার দেখত দূরে মনগাঁর সড়কে দিবুদার সাইকেলটা দেখা যায় কি না। শহরে কেউ তার জন্য অপেক্ষা করবে না।

আকাশে এখন খণ্ড মেঘের ওড়াউড়ি। এই ছায়া এই রোদ। সে ললিতদার দোকানের পাশে যেতেই কেমন অবাক হয়ে গেল। মনে হলো ছুলিদির বাপ ওখানটায় দাঁড়িয়ে আছে। ললিতদার গায়ে ন্যাতো গেঞ্জি। পরনে নীল রঙের লুঙ্গি। দোকানের এদিক ওদিক লোকটা ঘুরঘুর করছে। টের পেয়ে গেছে আসলে ছুলি ললিতদার ছাপড়া ঘরের এককোণায় লুকিয়ে চুরিয়ে থাকে। সে দৌড়ে নেমে গেলে দেখল, ছুলিদির বাপ হনহন করে হেঁটে উঠে যাচ্ছে।

ললিতদার মুখ বড় গম্ভীর। লোকটা যতক্ষণ না হেঁটে ঘেরির পাড়ে উঠে গেল ততক্ষণ ললিতদা চেয়ে থাকল। সহসা যেন দিবুকে দেখেছে. এমন এক ভঙ্গীতে সামান্য হাসল। বলল, ভিতরে যা।

কি দেখছ!

চিন্তাহরণ টের পেয়ে গেছে।

কি টের পেল!

ছুলি আসলে পালিয়ে এখানে আছে?

হরেনকাকা বলল কিছু?

না বলে নি, তবে প্রায়ই বিড়ি কিনতে আসে।

সে তো আসতেই পারে। বিড়ি আর পাবে কোথায়!

ললিতদা হেঁটে কিছুটা অন্যমনস্কভঙ্গীতে বলল, ভাবছি বলে দেব, ছুলিকে আমি বিয়ে করেছি।

যদি নাবালিকা বলে মামলা করে! আর তখনই হাহাকার হাসি ললিতদার—এই ছুলি শোন, দিবু কি বলছে, তুই নাকি নাবালিকা।

ছুলিদির কাকে ঠোকরানো চুল এখন কিছুটা বড় হওয়ায় মুখের কমনীয়তা বাড়ছে। চোখে ধার উঠছে। চোখ টেনে বলল, তুমি যে কী-না ললিতদা!

এই কী নার মধ্যে যেন কত গোপন কথা থেকে যায়। ফুলিদি ঝাঁপ সরিয়ে মুখ বার করে কথা বলছিল। সবটা দেখা যায় না। সামনে চায়ের দোকান। পেছনের ঝাঁপ তুলে ভিতরে ঢুকলে ফুলিদির থাকবার ছাপড়া ঘর। বাঁশের খুঁটি, ওপরে শণের চাল। চারপাশে পাটকাঠির বেড়া। গোবর দিয়ে লেপা। কোনো ফাঁক-ফোকর নেই। দোকানে খদ্দের এলে বোঝাই যায় না, ঝাঁপ তুলে ফেললে একটা ছাপড়া ঘর আছে ও-পাশে। দূর থেকে মনে হয় একটাই ঘর। সেখানে ললিত চায়ের সঙ্গে বর্ণপরিচয়, শ্লেট, পেন্সিল, খাতা রাখে। লজেন্স, বিস্কুট—আজকাল ডাল, তেল, নুনও রাখতে শুরু করেছে। গণশা আর তার বৌ বিড়ি বানিয়ে দিয়ে যায়। সে সে-সব সেঁকে তুলে রাখে। ফুলিদি আসার পর ললিতদার বাউণ্ডুলে স্বভাবটা ভাটা পড়েছে। দোকানের শ্রী বাড়ছে। বাইরে বাঁশের খুঁটিতে টুলের মতো করে একটা লম্বা মাচান বানিয়ে রেখেছে। চা-বিস্কুট খেতে এলে খদ্দেররা সেখানটায় বসে।

দিব্যেন্দু মাচানে বসেই বলল, সত্যি যদি টের পায় তবে কি হবে?

ললিত বলল, বাইরে বসে এ-সব কথা হয় না। হঠাৎ তুই এমন আলগা হয়ে যাচ্ছিস যে বড়।

এটা ঠিক, ললিতদার দোকানে এলে সে ভিতরেই ললিতদার পাশে বসে। খদ্দেরের ভিড় থাকলে, কখনও সে নিজেই তা সামলায়। বোয়েম থেকে লজেন্স বের করে। পয়সায় কটা বিড়ি, এক বাণ্ডিল বিড়ির দাম, সিগারেটের প্যাকেটের জন্য কত দাম নিতে হয় সে জানে। তখন দিব্যেন্দুকে দেখলে মনে হবে দোকানটার মালিক ললিত নয়—সে নিজে। চায়ের দিকটায় তখন ললিত ব্যস্ত থাকে। আজ বাইরে মাচানে এসে বসায় ললিতদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সে স্যাণ্ডেল খুলে দোকানের একেবারে টাটে উঠে বসে বলল, এ তো খুব ভয়ের কথা।

ভয় কি।

জানাজানি হলে।

জানাজানি হলে আমার কচু হবে।

তবে ডুলিদির বাপকে এতো ভয় পাও কেন।

ললিত চা করছিল তিন কাপ। বেশি দুধ, বেশি চিনি, লিকার দিয়ে স্পেশাল চা। জনান্তিকে বলা, এই যে শুনছিস, তোর চা। দুটো বিস্কুট নে। ডিম ভাজা খাবে নাকি দিবুবাবু।

দোকানটা আমাকে খাইয়েই ফতুর করবে দেখছি।

খাও। খেয়ে মনে রেখ। তোমার কাকা-জ্যাঠারা আমাকে অপছন্দ করে। তুমি এখানে আস তারা তা পছন্দ করে না।

যাঃ কে বলল, এ-সব।

সব বুঝি। খাইয়ে রাখছি। বিপদে-আপদে ডুলিকে দেখবে বলে। তখন নেমকহারামি করো না। তোমাদের মতো ভদ্রলোকদের আমার বিশ্বাস কম।

দিবু জানে, জ্যাঠামশাই ললিতদাকে পছন্দ করেন না। চিন্তাহরণই লাগিয়েছে কানে, দিবুটাকে নষ্ট করে দেবার তালে আছে। গণ-সংগ্রাম না কি যেন হবে একদিন এইসব বলে ললিত। ললিত পার্টির লোক। এখানে জায়গা দেওয়াই ভুল হয়েছে। জ্যাঠামশাইকে আরও সতর্ক করে দিয়েছে, ছেলে-ছোকরাদের ক্ষেপাতে ওস্তাদ। আসলে চিন্তাহরণ ললিতদাকেই যমের মতো ভয় পায় এই আবাসে। বনমালী যে মরে গেছে, সেটা টের পেয়েছিলেন সবার আগে জ্যাঠামশাই। সেদিন থানে জ্যাঠামশাইর মুখ দেখেই সে সেটা বুঝতে পেরেছিল। অথচ সবার কাছ থেকে লুকিয়ে গেছেন। হোমিওপ্যাথির বাক্সটা নিয়ে সকালে যখন রুগী দেখতে বারান্দায় বসেন, তখন চোখ-মুখ দেখলেই বোঝা যায় জ্যাঠার নাড়ীজ্ঞান প্রখর। নাড়ী ধরেই সেদিন তিনি ওটা টের পেয়েছিলেন। কিন্তু কিছু বলেন নি মরে গেলেই চিন্তাহরণ যেন লাফিয়ে পড়বে—কেন মরল। হেতুটা কে? হেতুটা দিব্যেন্দু আর পার্বতী। তার প্রতি পার্বতীর টান, পার্বতীর

প্রতি বনমালীর টান। সেই টান রক্ষার্থেই পার্বতীর দিবুদাকে অন্ধকারে খুঁজতে বের হয়েছিল বনমালী। সুতরাং এই যখন কারণ —তখন বনমালীর লাশ উপেন রায়ের বাড়ি উঠে যাবার রাস্তায় ফেলে রাখা হক। বনমালীর আত্মীয়-স্বজন না আসা পর্যন্ত সেখানেই ফেলে রাখা হক। আর মজা এই নিয়ে মজা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে— তখনই ললিতদার কি ভোজবাজি কে জানে, সবাই মিলে লাশ ক্রোশ দুই দূরে ফেলে রেখে এল। বিপদে-আপদে ললিত আছে বলেই মুখের ওপর দিবুকে কোনদিন জ্যাঠামশাই বলতে পারে নি, ললিতের দোকানে তুমি যাবে না। সেখানে যাওয়া আমার অপছন্দ।

ললিতদা হাবেভাবে সব টের পায়। আজ সোজাসুজি কথাটা বলল। ললিতদা কি সকাল থেকে মেজাজ গরম করে রেখেছে— কে জানে!

দিবু ওপরে উঠে যেন আয়াস করে বসেছে। চা খাচ্ছে। চা খাবার পর ললিত একটা বিড়ি দু' আঙুলে টিপে নরম করে ফুঁ দিচ্ছে মুখটায়, তারপর বিড়িটা ধরানোর সময় সামান্য চোখ তুলে তাকিয়ে দিবুকে দেখল—কি বাবু জ্যাঠাকে ঠেস দেওয়ায় রাগ করলে।

দিবু বলল, ওদের দোষ নেই। বুঝতেই পার, আমরা কে কোথা থেকে এসেছি, আমাদের জাত-কুল কি—কেউ কিছু খবর রাখি না। পূব বাংলার হেন জেলা নেই যেখান থেকে এসে এই ঘেরিতে ঘর-বাড়ি না বানাচ্ছে। কার কি চরিত্র তাও আমরা জানি না দিবুকে নিয়ে তাদের শঙ্কা থাকতেই পারে। তোমার লায়েক ছেলে থাকলে তুমিও সেটা মনে করতে।

ললিতের এখানেই ভাল লাগে দিবুকে। দিবুই তাকে পালাগান লিখতে উৎসাহ দেয়! অবসর সময়ে খাতায় সে দুটো একটা পয়ার-ছন্দে কবিতাও লেখে। সে এখন লিখছে একটা পালা—নাম দিয়েছে "ভয়ংকরী হিজল"। দিবু মাঝে মাঝে এসে তারপর কি লিখলে এমন জিজ্ঞেস করে। দিবু দোকানে এলে সে উৎসাহ পায়।

একটা বিড়ি দিবুর দিকেও বাড়িয়ে দিল. চলুক।

না ললিতদা। সেদিন খেয়ে কি ভয়। মৌরি খেয়ে তোমাকে গন্ধ শোঁকালাম মুখের। তুলিদিকে শোঁকালাম। তাও ভয় যায় না। উষাকে ডেকে হা হা করে মুখের সামনে বললাম, কোনো গন্ধ পাচ্ছিস ?

কি বলল !

কি রকম একটা গন্ধ রে তোর মুখে দাদা !

ব্যস আর যাই কোথায়। মা কাছে এলে ঘরের বাইরে চলে গেলাম। জ্যাঠামশাই খড়ম পায়ে পুজার ঘরে ঢুকে গেলে বারান্দায় সরে বসলাম। আমার কি মনে হয়েছিল জান, যতো দূরেই থাকি নিঃশ্বাস ফেললে গন্ধটা ঠিক পেয়ে যাবে।

ললিতদা বলল, অত ভয় থাকলে খেয়ে কাজ নেই।

সহসা তখন আকাশ কালো করে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়তে থাকল। দোকানের এই টাটে বসে থাকলে, অনেক দূরের হিজল দেখা যায়। কেমন কুয়াশার মতো হয়ে আছে চারপাশটা। এক অবিরাম বৃষ্টির শব্দ। ঠাণ্ডা বাতাস। পাটের চারায় বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি। কোন এক অজ্ঞাতকুশলী পাটের চারায় পুতুল নাচ শুরু করে দিয়েছে। ব্যাঙের গভীর ডাক, গরু, বাছুর যেরির পাড় ধরে ছুটছে। যারা জমিতে নিড়ানি দিচ্ছিল, তারা আলে উঠে এসেছে—প্রকৃতির বিচিত্র এক লীলা টের পায় দিবু তখন —অহরহ মানুষ, এই চাষআবাদ, পাল-পার্বণ, ধানে মানত—এইসব নিয়ে আছে। দূরের তালগাছগুলি বৃষ্টিতে ভিজছে—তার নিচেই থাকে তনায়। জমির আলে থাকে। যেরির পাড়ে গর্তের মুখে জিভ বের করে রাখে। যে যার মতো হেঁটে চলে বেড়ায়। পার্বতীর মধ্যেও আছে বোধ হয় কোনো বিষধর সাপের কূট খেলা এবং পার্বতীর কথা মনে হতেই মনটা কেমন তার ব্যাজার হয়ে গেল।

বলল, আচ্ছা যতীন ওঝাকে তোমরা কিছু বলবে না।

বলে মার খাই আর কি। ললিত দুধের কড়াইটা উনুনে বসিয়ে দেবার সময় বলল।

কপিলকাকার বাড়ি পড়ে থাকে। বৌটা পার্বতীর নামে কুৎসা রটাচ্ছে।

শোন দিবু, এ সবের মধ্যে থাকিস না। মাথা খারাপ হয়ে যাবে। শহরে পড়তে যাচ্ছিস যা। যেখানে যাকে মানায়।

দিবুর প্রচণ্ড বিস্ময়। সে ভাল করে না জানতেই ললিতদা জেনে বসে আছে। ব্যাপারখানা কি! সে বলল, তুমি কার কাছে শুনলে!

যা বললাম ঠিক কি না আগে বল।

কাকীমা আজ বলল। কিন্তু জ্যাঠামশাই তো কিছু বলেন নি!

তিনি বলবেন কেন। তিনি শুধু বলবেন, দিবু এবারে রওনা হও।

তারপরই ললিত যেমন বলে থাকে—বুঝলে না, আমাদের রক্তে এটা রয়ে গেছে। এই সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব সমাজ থেকে যতদিন দূর না হবে, ততদিন দেশের মঙ্গল নেই। চিন্তাহরণ, খাসনবিশ, উপেন রায়—এমন কি এই যে কপিলকাকা, তোমরা কেউ এর থেকে মুক্ত নও।

এসব খুবই বড় বড় কথা। দিবু ঠিক বোঝে না।

ললিত ফের বলল, এক অনড় সমাজব্যবস্থায় আমরা বাস করছি। তাকে ভেঙেচুরে না দিলে মুক্তি নেই।

তারপর ললিত দেখল, ছাতা মাথায় এদিকে কেউ আসছে। কালীপদ আচার্য। গলায় তুলসীর মালা। সে ছাতাটা বন্ধ করে দোকানের ভেতর ঢুকে বলল, ললিত ভাই, আজ সেরখানেক চাল আর পোয়াটেক ডাল নেব। দামটা লিখে রাখিস ভাই। বের হতে পারছি না। ঘুরে এসে সব দিয়ে দেব।

ললিতের খাতায় এর নামে বেশ বাকি পড়ে গেছে। না দিলে না খেয়ে থাকবে। তার বাকি দেবার ক্ষমতাও কম। লোকটা নাকি কাকচরিত্র জানে। বয়স ত্রিশ পঁয়ত্রিশ। তিনটে ছেলে-মেয়ে।

ক্যাম্পে ছিল, এখানে ঘর করে উঠে এসেছে। দেশের লোকের খবর পেয়েই চলে এসেছিল। এখন শুধু হাত দেখে বেড়ায়, কিংবা, ঠিকুজি-কুষ্ঠি করে দেয়। মানুষের ভূতভবিষ্যৎ নাকি এমন অমোঘ বলে দেয় যে, থ হয়ে যেতে হয়। মাস দুইয়ের মধ্যে এই লোকটা দু-দু'বার ভোজ দিয়েছে। এই সেদিন লোকনাথ ব্রহ্মচারীর নামে কীর্তন এবং মচ্ছব। এক সের চাল আর এক পো ডাল ধারে নেবার কাঙাল কালীপদ তখন বোঝাই যায় না। পাথর, তাবিজ এগুলো দেবার নাম করে বাবুদের মাথা হাতিয়ে হাজার দু হাজার টাকা নাকি এক রাতেই কামিয়ে ফেলতে পারে। শাঁসালো খদ্দের হাতে পেলে তখন আর তাকে দেখে কে!

কত বিচিত্র লোক এসে এক এক করে এই ঘেরিতে ঘর-বাড়ি বানাচ্ছে।

দিবুর দিকে তাকিয়ে কালীপদ বলল, আরে আপনি দিবুদা এখানে বসে। ভাবাই যায় না। গড় হই।

দিবুর এই লোকটাকে দেখলে রাগও হয়, আবার এমন ব্যবহার যে খুশি না হয়ে পারে না। দিবুকে দেখলেই কালীপদ বলবে—জলে-জংলায় মানুষ থাকে না। কিন্তু দিবুবাবু যেখানে আছে, সেখানে আবার জল, জংলা কিসের। একেবারে আমাদের ভূষণ তিনি। কি একখান পাস—কও ললিত, এমন পাসটা দেয় এখানকার আর কার পরিবারে তেমন ছেলে আছে! রায়মশায়ের মাথা ভারি হবে না কও ললিত তবে! তোমার আমার ঘরে থাকলে, মাটিতে আমাদের পা-ই পড়ত না।

এখানে যতক্ষণ থাকবে লোকটা কেবল কথা বলবে। আর কাউকে কথা বলতে দেবে না। এই লোকটাও চিন্তাহরণের একজন দোসর। রাতে চিন্তাহরণের বাড়িতে যে গাঁজার আড্ডা বসে সেখানে সে যায় এবং ইতিমধ্যেই নাকি চিন্তাহরণকে সে শ' আড়াই টাকা ধার দিয়ে বসে আছে। কি যে তার দুর্মতি হয়েছিল, দুর্গাপুর থেকে ভাল

একটা দাঁও মেরে এনে ফুটানি করতে গেছিল চিন্তাহরণের কাছে। দু' বিঘা জমির বায়না হিসাবে টাকাটা বাগিয়ে নিয়ে পরে চিন্তাহরণ বলেছে, ওটা ধার থাকল, পরে একসময় নিয়ে নিবি। জমি মিলবে না। ললিত গতকালও দেখেছে. ঘেমির রাস্তা ধরে কালীপদ লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে। আর চিন্তাহরণের মুণ্ডপাত করছে।

ঠাকুর তুমি আমারে চেন না। আমার নাম কালীপদ আচার্য। বড় বড় সুপাররিনটেন সাহেব কালীপদর তাবিজ-কবজে লিফটি পায়। টাকা কি মুকতে দেয়। ঘরে একটা পয়সা নাই। গলায় গামছা দিয়ে আদায় না করেছি ত—

তারপরই যখন ফিরে আসে, দেখা যায় কালীপদ বড় ভাল মানুষ।

ললিত বলেছিল, পেলে ?

না, দিল না। তবে রাতে মাংসভাত। বউ-ছেলেমেয়ে সহ কর্তার বাড়িতে পাত পড়বে। কাছিমের মাংস আনিয়েছে কর্তা। বলল, কালীপদ তুই ! আমি তো হরেনকে পাঠিয়েছি তোর কাছে। তোরা সবাই রাতে খাবি। কাছিমের মাংস এয়েছে বাড়িতে। তুই খাবি না, আমরা খাব, খুব খারাপ লাগছিল।

আরে টাকার কি হল তোমার কালীদা।

টাকা দেবে। জমির ধান উঠলেই দেবে। মানী মানুষ—তার ইজ্জতই আলাদা। কত লোকের হাতের টিপ-ছাপ নিয়ে বাণ্ডিল বাণ্ডিল টিন পাইয়ে দিচ্ছে, ক্যাশডোল পাইয়ে দিচ্ছে—সামান্য কটা টাকা তার এক সকালের হাতঝাড়া।

দিবু থামে হেলান দিয়ে তখন বৃষ্টিপাতের শব্দ শুনছিল। তার নিজের সেই দেশ, গাছপালা, পুকুর এবং আস্তানা সাবের দরগার কথা মনে পড়ছিল। সেনেদের বাড়ির কল্যাণীর কথা মনে পড়ছিল। সবই স্মৃতি। আর জীবনে বোধহয় তাদের সঙ্গে দেখা হবে না। দালানবাড়ির গগনী তাকে বেথুন ফলের আচার মেখে খাওয়াত—ওদের কামরাঙা গাছের নিচে গেলে গগনী জানলায় দাঁড়িয়ে ডাকত,

ফ্রকপরা গগনী কখনও গোল্লাছুট খেলত তার সঙ্গে। দিবুকে গগনী দেখলে ছুটে আসত কিসের আশায়! ওদের সঙ্গে আর জীবনেও দেখা হবার কথা নয়। বৃষ্টিপাতের ভেতর একা ডুবে গেলে বোধহয় স্মৃতির প্রাবল্য বাড়ে। আর এখানে পার্বতী, ফণীর দিদি এই দুই বালিকাই হয়েছে তার বড় হওয়ার আকর্ষণ। বহরমপুর চলে গেলে —সে ওদের রোজ দেখতে পাবে না। এই জায়গাটার জন্যও তার কেমন মায়া পড়ে গেছে। সেই খর রোদে সে যখন বাবার চিঠি সম্বল করে মাসতিনেক আগে এই জনপদে এসে উঠেছিল, তখন পার্বতী তাকে ভরমুজের রস খাইয়েছিল। পার্বতীর মধ্যে গগনী কিংবা কল্যাণীর মতো এক ভালবাসার কাঙাল আছে সেদিনই সে ধরতে পেরেছিল। ওর উজ্জ্বল চোখ, খাটো ফ্রকের অন্তরালে দুটো পুষ্ট স্তনের প্রতি তার নজর—সে নিজেই কেন জানি পার্বতীর দিকে তাকাতে পারছিল না। তারপর কি হয়ে গেল সব। বনমালীকে সাপে কাটার পর থেকে দু'-বাড়ির মধ্যে এক পাঁচিল উঠে গেল। সে ভাবল, যাবার আগে অন্তত একবার পার্বতীকে বলবে, তুমি এভাবে থানে গিয়ে পড়ে থেক না। যতীন লোভে পড়ে গেছে। ওর ওঝার মাহাত্ম্যর সঙ্গে জড়িয়ে কোনো ভৈরবী না শেষ পর্যন্ত তোমাকে বানিয়ে ফেলে!

এই একটা আশঙ্কাই দিবুকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। কালীপদ অজস্র কথা বলে যাচ্ছে—সে কিছুই শুনছে না।

একসময় কানে এল কালীপদ বলছে. আরে ললিত ভাই, তোমার এখানে কে নাকি এসে উঠেছে। লোকে বলাবলি করে—তোমার সে কে হয়?

ললিত বলল, কার কথা বলছ!

আরে তোমার দোকানের চা-টা বানায়!

আঃ সে ত' আমার নিজের লোক।

দেখছি না তাকে।

দেখতে ইচ্ছে হয় !

না, দেখতে ইচ্ছে হয় না, তোমার কাকা তো বলছে, সম্পর্কচ্ছেদ তোমার সঙ্গে।

সম্পর্কটা ছিল কখন !

চায়ের দোকানটা বসতের বাইরে। রাস্তার মুখে। রেল লাইন পার হয়ে একটা রাস্তা দশ ক্রোশের মতো হবে হিজলের ওপর দিয়ে চলে গেছে। গরুর গাড়ি যায়। রাঢ় থেকে ধান নিয়ে বেলডাঙার হাটে যায়। তা ছাড়া গঙ্গা পাইয়ে দিতে আসে যারা, তারাই মরার খাটলি কাঁধে রাস্তাটা ধরে যায়। পাঁচ-সাত ক্রোশের মধ্যে এই একখানাই চায়ের দোকান। এ-সব ভেবেই ললিতের এখানে দোকান করা। এখন বসতের ছেলে-ছোকরাও চা খেতে আসে। আড্ডা দিতে আসে। একটাই গাছ এই সুমার জনহীন প্রান্তরে। তার নিচে দোকান সেখানে ললিত ছুলিকে আশ্রয় দিয়েছে গোপনে। দিবু আর ললিত একমাত্র জানে বিষয়টা—এখন ললিত দেখছে ধীরে ধীরে একটা উড়ো খবর ছড়িয়ে পড়ছে। ফেরার ছুলি আসলে ললিতের ওখানেই পুরুষের বেশে উঠে এসেছে। ললিতই ভাগিয়ে নিয়ে গেছে ছুলিকে।

কিন্তু প্রমাণের অভাব।

ছুলি পাজামা-পাঞ্জাবি পরে থাকে। সহসা বোঝার উপায় থাকে না সে মেয়ে। হাতে চুড়ি নেই। মাথার চুল পুরুষের মতো করে ছাঁটা। মুখখানা বড় মায়াবী। রোগা পাতলা চেহারা। চোখের নিচে কালি পড়ে গেছে আতঙ্কে। ললিতও কি করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না বোধহয়।

কালীপদ এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল।

ললিত বলল, এই নাও। বলে সে দুটো কাগজের ঠোঙা এগিয়ে দিল।

চা দিবি ভাই। এই এক কাপ। ডালটা লিখে রাখিস।

ললিত এড়িয়ে যাবার জন্য বলল, আঁচ পড়ে গেছে।

কালীপদ তবু নড়ে না।

ললিত বলল, দেখবে তাকে।

দিবুর বুকটা ধড়াস করে উঠল। আর দেখল, তখনই ললিত ডাকছে, হারু মুখটা দেখিয়ে দে গলা বাড়িয়ে।

আরে না না। আমি দেখব বলে আসিনি। কোথাকার কে—দিনকাল ত ভাল না। সব নিয়ে-থুয়ে না আবার ভাগে।

ললিতের মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছিল। ক'দিন থেকেই চিন্তাহরণ লোক লাগিয়েছে। একবার ভাল করে দেখে বল, সে মেয়েছেলে কি না! সমাজে অনাচার চলবে, হবে না। মেয়েছেলে নিয়ে থাকতে হয় শহরে-গঞ্জে চলে যাক। এখানে সবার ঘরে মা-বোন আছে। চোখের ওপর এমন অনাসৃষ্টি গ্রামের মানুষ সইবে কেন। বিহিত করা দরকার।

ছুলিদি ঝাঁপের ও-পাশ থেকে বলল, ললিতদা ডাকছ।

কালীপদ বলল, ছেলে-ছোকরা মনে হচ্ছে। গলার স্বর ভারি নরম। আমি যাই ভাই। যা উপকার করলি। বলে সে ছাতাখানা খুলে বৃষ্টির মধ্যে বের হয়ে গেল।

ললিত বলল, শুয়োরের বাচ্চা।

দিবোন্দু উঁকি দিয়ে দেখল, কালীপদ আচার্য কতদূর গেল। টাট থেকে সে যখন দেখল, দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে, তখন বলল, তুমি কি ললিতদা! ছুলিদিকে ডেকে লোকটাকে দেখাতে চাইছ! চিনে ফেলবে না!

ললিত মজা করে হাসল। বলল, চিনতে পারলে ডাকি। চিন্তাহরণের বৌ তোর জেঠির বয়সী। কখনও তার মুখ দেখেছিস। বাড়ির বাইরে বের হলেই একহাত ঘোমটা। শুয়োরটা ভাবে, বৌয়ের ঘোমটা ওপরে উঠলেই সতীত্ব খসে পড়বে। ছুলিকে এ-বসতে কে কবে দেখেছে।

শুয়োরটা মানে !

আরে চিন্তাহরণ ! বাড়ির চারপাশে ওর দেখিস না কেমন বেড়া দেওয়া। সব আড়াল করে বাড়ির মেয়েদের সতীত্ব রক্ষা করছে। ওর মেয়েটা দেখবি বেড়ার ফাঁকে চোখ দিয়ে থাকে। ছেলে-ছোকরাদের বাইরে এসে দেখার সাহস নেই। কারোকে বাড়ির বার হতে দেয় না। ডুলিকেও দিচ্ছে না, সে তো তুইও জানিস।

তুমি কি বলতে চাও বুঝতে পারছি না। ডুলিদিকে তুমি বরং বিয়ে করে ফেল। আর কেউ না চিনুক, ডুলিদির বাবা এসে যদি দেখতে চায় তখন কি করবে !

ডুলি কি রাজী হবে ?

কেন হবে না ?

বামুনের মেয়ে না। জাত যাবে।

ডুলি এবার বাইরে বের হয়ে এসেছে—এই ললিতদা, মিছে কথা বলছ কেন ?

এখন দিবু ললিত আর ডুলি বৃষ্টি তেমনি জোরে পড়ছে। কেউ এদিকটায় এলেই দূর থেকে দেখা যায়।

ডুলির এমন কথায় ললিত অবাক হয়ে গেল। আসলে এখানে এনে তালার পর ললিত কেমন বাইরের মানুষের মতো থাকতে থাকতে একদিন ডুলি নিজেই ললিতের কাছে চলে এসেছিল। এবং পাশাপাশি শুয়ে রাত যাপন— এইভাবে দিন গেলে যা হয়, ভিতরে এক অপরাধবোধ—মাঝে মাঝে ললিত নিজেকে বড় ছোট ভেবে থাকে। কিছু যদি একটা হয়ে যায়—এই নিয়ে একটা তার সমস্যা আছে। ললিত বলল, কিরে ডুলি তুই রাজী ?

ডুলি বলল, নিজেকে আগে বোঝাও।

দিবু বলল, যাবার আগে তাহলে ভোজ পাব মনে হচ্ছে।

ললিত সহসা খুব গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, ভাবছি নবদ্বীপে চলে যাব। ওখানে দোকান-টোকান করে ডুলিকে নিয়ে থাকব। বিয়ে

করতে ভয় লাগছে। চিন্তাহরণ না পারে হেন কাজ নেই। তারপর কি ভেবে বলল, কি বাজে বকছি।

দিবু বলল, নবদ্বীপে যাবে কেন। এখানে তোমার দোকান লেগে গেছে। এ-সব ফেলে যায় কেউ ?

ললিত আর একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল, তুলির বাবা যদি নাবালিকা বলে মামলা করে !

দিবেন্দু বুঝতে পারল, ললিতদা কি বলতে চায়। চিন্তাহরণ তুলিদির বাবাকে দিয়ে আদালতে মামলা করাতেই পারে। দিবেন্দু বলল, এই যে বললে, তুলিদি আর নাবালিকা নেই।

ললিত বলল, সেটা আমি আর তুলি জানি।

তুলিদি তখন কেমন লজ্জায় এবং সংকোচে মাথা নিচু করে রেখেছে।

দিবেন্দু বলল, আমি জ্যাঠামশাইকে বরং সব খুলে বলি।

রাজী হবে না। বলে ললিত কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

রাজী হবে না কেন ?

তোর জ্যাঠামশাই প্রথমেই ভাববে, তাহলে তুলিকে ললিত তার দোকানে লুকিয়ে রেখেছে। চিন্তাহরণ যে বিয়ে করবে বলে তুলিকে বড় করে তুলেছিল ওটা ললিতের সহ্য হয় নি। তুলি তলে তলে তবে প্রেমে পড়েছিল। প্রেম-টেম বিষয়টাই ওদের কাছে অদ্ভুত। তা ছাড়া বাঘের মুখের খাবার ছিনিয়ে নিলে কি হয় তা জানিস না ! আমিও খুন হতে পারি, চিন্তাহরণও খুন হতে পারে। আমার স্ত্রীকে নাবালিকা বলে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেলে আমি কি করতে পারি বুঝিস না ! তাছাড়া তোর জ্যাঠা গায়ে পড়ে বিবাদ করতে যাবে না। তা না হলে বনমালীকে আমরা ও-ভাবে ফেলে রেখে আসি ! একটা মরা মানুষকে ও-ভাবে ফেলে আসা যায় ! মরণ সুখো বগলার পাহারায় থাকার কথা। ওরাও ফেলে চলে এসেছিল। কেউ কারো কথা ভাবে না জানবি। কত করে বলে এসেছিলাম,

তোরা পাহারায় থাক, শেষ রাতের দিকে এসে আমরা তোদের ছেড়ে দেব। থাকল। থাকে না। শেষ রাতে গিয়ে দেখি সব সুনসান। একটা হারিকেন শিয়রে নিয়ে বনমালী একা। ভাগ্যিস শেয়াল কুকুরে মুখ দেয় নি। কিন্তু কেন করেছিলাম বল? তোর জ্যাঠার দিকে তাকিয়ে। ওখানে না রেখে এলে মরা কোথায় ফেলে রাখা হবে এই নিয়ে রেষারেষি কতদূর গড়াত কে জানে! খাস মনে রাখিস, আমি তোর কথা ভেবেই কাজটা করেছি। ভয়ে তার চোখ মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল! দুষ্টু লোককে কে ভয় পায় না বল!

দিব্যেন্দু দেখল বৃষ্টিটা ধরে আসছে। বলল, আচ্ছা ললিতদা, চিন্তাহরণকে তাহলে তুমি ভয় পাও!

ভয় পাই না। ভয় ফুলিকে নিয়ে। সে আবার ওর খাবায় না চলে যায়! আগে হলে সবার সামনে দু থাবড়া মেরে আসতে পারতাম। ফুলি আমাকে কিছুটা কাহিল করে দিয়েছে।

দিবুর খারাপ লাগল ভাবতে, ললিতদা, নবদ্বীপে চলে যাবে। এমন একটা লোক নবদ্বীপে চলে গেলে জ্যাঠামশাই আরও একা হয়ে যাবেন। সে ভাবল, নিজে থেকেই কথাটা বলবে জ্যাঠামশাইকে। কিন্তু আশ্চর্য রাস্তায় নেমে মনে হল, জ্যাঠামশায়ের সামনে এ-সব তার বলা শোভা পায় না। বরং কাকীমাকে দিয়ে যদি কাকাকে ধরা যায়। কাকা যদি বাবাকে বলেন। বাবা জেঠিমাকে এবং জেঠিমা যদি রাজী হন, তবে তাদের বাড়িতেই ফুলিদির সঙ্গে ললিতদার মন্ত্র পড়ে বিয়েটা দিয়ে দেওয়া যায়। এই আবাসে বাস করতে হলে কিছু মন্ত্র কত জোর ধরে এই প্রথম দিবু বুঝতে পারল। ললিতদার মতো মানুষও কেমন ঘাবড়ে গেছে।

দিবু চলে যাবার পর ললিত বলল, দিবুটা খুব ছেলেমানুষ ফুলি।

ফুলি বলল, তোমাকে খুব ভালবাসে।

তোমাকেও। বলে ললিত চানে যাচ্ছে বলে বের হয়ে গেল। পাশেই কুয়ো। কুয়ো থেকে জল তুলে নিজে চান করবে, দু' বালতি

জল তুলির জন্য নিয়ে যাবে। যাবার সময় ঝাঁপ বন্ধ করে যায়। কেউ এসে ডাকলেই তখন ভেতর থেকে কথা বলার নিয়ম নেই। ললিত একদিন কুয়োর পাড় থেকেই দেখেছিল, কেউ যেন ডাকছে, সাড়া না পেয়ে ঝাঁপ ধরে টানাটানি করছে।

সে দৌড়ে গিয়ে বলেছিল, মারব কষে চড়। দোকান বন্ধ দেখতে পাচ্ছ না।

তোমার লোকটা!

সে কি জানে! এ ছাড়া ললিত সতর্ক করে দিয়েছে, দোকান বন্ধ থাকলে ডাকাডাকি করবেন না। সবারই শরীর বলে কথা। শহর কিংবা বেলডাঙার হাট থেকে তার মাল আসে বাকিতে। সে বিক্রি করে মরণের হাতে টাকা পাঠিয়ে দেয়। মরণ এসেই এখানে ছোট্ট একটা কয়লার দোকান খুলেছে। মরণের বৌ প্রায়ই বলছে এখানটায় বেড়াতে আসবে।

ললিত বলেছে, যেও দোকানে। আমি একা মানুষ। ঠাট্টা করে বলেছিল, মরণদা কি একলা মানুষের কাছে তোমাকে ছাড়বে।

খুব কাজলামি হচ্ছে দেখছি। তুলিকে নাকি তুমি কোথায় লুকিয়ে রেখেছ!

তুলি তো আমার কাছেই আছে জান না!

যাও ঠাট্টা হচ্ছে।

আসলে ললিত খুব জুয়া খেলছে নিজেকে নিয়ে। তুলি তার ডেরায় এসে উঠেছে. দেখতে দেখতে মাসখানেক হয়ে গেল। অবশ্য সে এরই ফাঁকে তুলিকে নিয়ে নবদ্বীপে একটা জায়গাও দেখে এসেছে। কিন্তু বছরখানেক সে এখানে থাকার পর এমন একটা সুমার বিল, ক্রোশের পর ক্রোশ তার জনহীন বিস্তৃতি নিয়ে তাকে মায়ায় ফেলে দিয়েছে। দ্বারকা, ব্রাহ্মণীর সঙ্গমস্থলের সেই বিশাল বালিয়াড়ি যার পাড়ে দাঁড়ালে কেমন মুহ্যমান অবস্থা হয় তার। তাছাড়া তার দোকানে, যেসব ছেলে-ছোকরা আসে তাদের সঙ্গেও বন্ধুত্ব এবং নতুন

স্বপ্নের কথা শোনাতে তার কেন জানি ভাল লাগে। বিশেষ করে যখনি কবিতা শোনার পর দিবু বলে দারুণ, দারুণ, তখন তার জীবন ভরে থাকে কানায় কানায়। সে এ-সব ফেলে শুধু তুলিকে নিয়ে কোথায়, কতদূর যাবে!

খাওয়ার পাট চুকলে তুলি ওপাশে ঘুমিয়ে নেয়। সেও যায়। পাশে শোয়। তুলি তখন ভয়ার্ত চোখে দেখে ভয়টা তার সেই এক চিন্তাহরণের থাবার মতো। মাঝে মাঝে তুলি কেমন অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে থাকে ললিতের দিকে।

ললিত বোঝে সব। তুলির বাবা নিরুপায় মানুষ, নিরুপায় মানুষকে চিন্তাহরণ আশ্রয় দিয়েছিল—তুলির তখন কৃতজ্ঞতায় সীমা ছিল না। যিনি আশ্রয় দিয়েছেন তার সেবাযত্ন করে, বাড়ির কাজ করে এই যেমন চাষের ধান উঠলে রোদে শুকিয়ে ঘরে তোলা, ধান সেদ্ধ করে চাল করা, সন্ধ্যায় শীতে গরম জল করে এগিয়ে দেওয়া, অর্থাৎ না চাইতেই চিন্তাহরণের সব কিছু এগিয়ে দেবার যে বিচার-বুদ্ধি তুলির মধ্যে কাজ করত, তাই শেষ পর্যন্ত তার কাল হল। চিন্তা হরণ মর্যাদার প্রশ্নেই শুধু স্ত্রীর প্রতি সম্মান দেখান। রক্তহীন নির্জীব, বিশীর্ণা এক নারীর পাশে চাঁপা ফুলের মতো ফুটে ওঠা মেয়েটিকে হাতে পাবার লোভ প্রৌঢ় মানুষটির গজাতেই পারে। বড় দূরদর্শী মানুষ, ক্যাম্প থেকে সঙ্গে করেই এনেছিল হরেনকে, তার বৌকে আর তার মেয়ে তুলিকে। সেই তুলি রাতের আঁধারে খপ করে কায়দে দিয়ে হাওয়া হয়ে গেলে সহ্য করবে কেন? ললিতের মনে হয় তুলি মাঝে মাঝে তার দিকেও তেমনি সংশয়ের চোখে চেয়ে থাকে যেন। কেমন নিজের ওপর তখন রাগ হয় ললিতের তখন মনে হয় সে চিন্তাহরণের চেয়ে খারাপ লোক।

আজ ললিত ওদিকটায় গেল না।

তুলি শুয়ে দু-বার পাশ ফিরে দেখল। না কেউ ঝাঁপ তুলে ভিতরে ঢুকছে না। খাওয়ার পর পাশাপাশি দু'জন শুয়ে ভবিষ্যতের

নানারকম ছবি আঁকতে ভালবাসে। যাত্রাগানের পালা সে লিখছে। সে একটা দল করবে। গরীব মানুষের দুঃখের কাহিনী নিয়ে সে পালাগান তৈরি করবে। তারপর দূর শহরে কিংবা গঞ্জে চলে যাবে, মানুষের কথা বলতে—পালাগানের কথা মানুষের মনে গেঁথে থাকে। যে যেভাবে পারে কাজ করে যাওয়া দরকার। তার সেই ইন্দ্রদা এমনই বলেছিল।

তুই তোর মতো মানুষের জন্য কাজ করে যাবি। গণ-সংগ্রামে সবার কাজ থাকে। সবার হাত না লাগলে এগিয়ে যাওয়া যাবে না। পচা-গলা সমাজটাকে ভেঙে দে ললিত। ভেঙে দে।

এই ভাঙাটা যে কি সে বুঝতে পারে না। দুলির কাছে ঝাঁপ তুলে যেতে তার আজ বড় ভয় করছিল।

মাথায় দুশ্চিন্তা ঢুকলে তার বিড়ি খাওয়ার প্রকোপ বাড়ে। সে পর পর দুটো বিড়ি খেয়ে দোকানের মধ্যেই পায়চারি করতে থাকল। একটা বাজলে সে দোকানের ঝাঁপ ফেলে দেয়। ভিতরটা অন্ধকার হয়ে যায়। পাশের ঘরটায় দুলি তার আশায় শুয়ে আছে। দুপুরে এবং রাতে আজ ক'দিন থেকে শোয়ার অভ্যাস হয়ে গেছে। দুলির সম্মতি না থাকলে, সে পাশে শুতে সাহস পেত না। দুলিকে এনে যেদিন তুলেছিল, সে-রাতে তার যা গেছে, একজন প্রৌঢ় মানুষের থাবা থেকে পালিয়ে বোধহয় দুলি জগৎ-সংসার অন্ধকার দেখছিল। পৃথিবীর কাউকে তখন সে বিশ্বাস করে না। ললিতের আচরণ ভিন্ন। ক্যাম্পে দুলিকে ললিত দিনের পর দিন দেখেছে, তখন সে সত্যি বালিকা। ললিতের সবে গোঁফ-দাড়ি উঠছে। মেয়েটি ছিল ভারি চঞ্চল। দিন-রাত হ্যাঙ্গারের বাইরে যে প্রশস্ত পাকা সড়ক ছিল, সেখানে একাদোকা খেলত। খাবার ভাবনা নেই। শোবার ভাবনা নেই। সরকার সবাইকে পাশাপাশি বড় বড় সব লম্বা হ্যাঙ্গারে এনে তুলেছে। কোনো আব্রু নেই। কলের পাড়ে মেয়েদের ভিড়টা বেশি। ললিত তার কাকার সঙ্গে উদ্বাস্তু। দাঙ্গায় মা-বাবা, ভাই-

বোন সব গেছে। ওরা বর্ডার পার হয়ে এসেছিল এক-কাপড়ে। ঢুলির বাবা, চিন্তাহরণ বগলাদের সঙ্গে একটা খোলা মাঠে দেখা। সবাই বর্ডারের দিকে হাঁটছে। সেই থেকে ঢুলিকে চেনে। চিন্তাহরণ করিতকর্মা লোক—ক্যাম্পে নাম রেজিস্ট্রির সময় সেই যে মাতব্বর বনে গেল—সেটা বড় কৌশলে সে এখনও তা জিইয়ে রেখেছে। একেই বলে মানুষের নিয়তি। ক্যাম্প থেকে এই হিজলে। চতুর মানুষেরা বসে থাকার পাত্র না। ক্যাশডোল দিয়ে সংসার চলে না। সমর্থ যুবকেরা ট্রেনে ফিরি করে, স্টেশনের লাগোয়া চায়ের দোকান বানায়—কলকাতা থেকে শীতের দিনে কমলালেবু আমের দিনে আম, বর্ষায় আনারস বিক্রি করে পয়সা। খবর নিয়ে আসে চিন্তাহরণ, হিজলের বেরিতে কম দামে জমি—যে যা পার সঙ্গে নিয়ে চল। নতুন আবাসের পত্তন হবে। সেও দু-বছর হয়ে গেল।

ললিত সেই থেকে ঢুলিকে দেখে আসছে।

বর্ডার পার হবার পথে যার সঙ্গে প্রথম দেখা আজ সে তার ঘরে। পাশের ঘরে উসখুস করছে। এই স্বভাব ঢুলির। মুখ ফুটে কিছু বলবে না। বললে, ঢুলিকে বোধহয় চিন্তাহরণের থাবার মধ্যে চলে যেতে হত না।

ললিত বিড়িটা খেয়ে ভাবল টাটেই গাটা এলিয়ে নেবে। ভেতরে যাবে না। শাস্ত্রমতো কিছু একটা না করে ঢুলির সঙ্গে শোওয়াটা অধর্মের কাজ। কিন্তু সে জানে না—শাস্ত্রমতে যারা ঘর করে—তাদের সুখ কি এর চেয়ে বেশি! আসলে সে বুঝতে পারে, ভিতরে এক সংস্কার—তাকে দগ্ধাচ্ছে। সে নিজেকে বড় অপরাধী ভাবছে।

ঘণ্টাখানেক দিবানিদ্রার অভ্যাস ললিতের। সে টাটে শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করল।

ও-পাশের মাচানে খচমচ শব্দ হচ্ছে। ঢুলির ঘুম আসছে না। যেন এক অপার আনন্দ থেকে সে ঢুলিকে বঞ্চিত করছে। শরীরে

জ্বালা ধরলে এই বুঝি হয়। জ্বালা তার শরীরেও কম নয়। জ্বর জ্বর মনে হচ্ছে যেন। হাত-পা গরম। চোখ জ্বালা করছে। দাহ ভিতরে জন্মালে যা হয়।

তবু সে নড়ল না। রাতে ঢুলি বলেছিল, আমার ভয় করে ললিতদা।

ভয় একটাই। কুমারী মেয়ে যদি মা হয়ে যায়। যেভাবে আছে তাতে ঢুলি মা হতেই পারে। সে দুটো শাড়ি কিনে এনেছে। রাতে শাড়ি পরে ঢুল। ব্লাউজ গায়ে দেয়। মুখে পাউডার মাখে। অনেকটা সময় ধরে সে ছোট আয়না নিয়ে সাজতে বসে। কাছে গেলেই ললিতের কেমন মাতালের মতো লাগে নিজেকে। তখন একই কথা ঢুলির, না। এখন না।

ঢুলি সুন্দর করে বিছানা করে। আসলে তাদের তো কোনো তক্তপোশ নেই। বাঁশের লম্বা মাচান করা। হোগলা বিছান। তার ওপর শতরঞ্চি পাতা। শতরঞ্চিটা ললিত পেয়েছিল সরকারের ঘর থেকে। দুটো তুলোর কম্বল। তাও সরকারের দান! বছর বছর এখনও লিস্টিতে নাম আছে বলে শীতে কম্বল বর্ষায় দুখানি ধুতি যে যেমন পাবার পায়। দুখানি কম্বলের ওপর ধোওয়া ধুতি চাদরের মতো বিছিয়ে গোপন প্রেমিকের মতো তাকিয়ে থাকলেই ললিত বুঝতে পারে সময় হয়েছে। সে কাছে যায়। নিবিষ্ট হয়ে বসে। ঢুলি তখন মুখ তুলে লজ্জায় তাকাতে পারে না।

শুয়ে শুয়ে ললিতের এসব মনে হচ্ছিল। শাঁখা-সিঁদুর নিয়ে এসে পরিয়ে দিলে কেমন হয়! কিন্তু সেই যে নির্যাতিত ঢুলি, ক্ষেপে গিয়ে তালগাছের নিচে তার সুন্দর চুল কেটে অন্ধকারে নিরুদ্দেশ হতে চেয়েছিল তারপর থেকে সব ঠিকঠাক হয়ে গেলেও চুলটা পুরুষ মানুষের মতো হয়েই আছে। সেখানে যে সিঁদুর পরলে কেমন না জানি দেখাবে। দিবু বামুনের ছেলে। সে যদি শাস্ত্রটাও ভাল করে জানত শাঁখা-সিঁদুর পরিয়ে সে নিজেই ঢুলিকে নিয়ে ইষ্টিশনে

যেতে পারত সবার সামনে বুক ফুলিয়ে। এই আমার ঘরের স্ত্রী। কার কি বলার অধিকার আছে। নাবালিকা তুলি বলে কোর্ট-কাছারি হলে যেন সে বলতে পারে হুজুর তুলির গোপন অভিসার যদি দেখতে পেতেন তবে তাকে নাবালিকা বলতে লজ্জা করত হুজুর। কিন্তু বিয়ে করা বৌকে নিয়ে এইসব হুজ্জতি হলে—তার যা মাথা গরম, যদি কিছু একটা করে বসে। তুলির অসম্মান হলে, সে কাউকে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। কিন্তু তার আগে তুলির গর্ভে যদি সন্তান এসে যায়। সে কেমন এবার সত্যি ভয়ে কুঁকড়ে গেল। আর তখনই মনে হল নবদ্বীপে চলে গেলে সে এসব কলঙ্ক থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। তুলিকে নিয়ে সে সেখানে মনের মতো ডেরা বাঁধতে পারবে।

কখন একটু ঘুম লেগে এসেছিল ললিতের।

কিসের শব্দে সহসা আবার ঘুমটা চটকেও গেল। বাইরে কেউ কি দাঁড়িয়ে ঝাঁপ ঠেলছে। টাটের বরাবর ঝাঁপের জানালা। সেটা খোলা। ফুরফুর করে হাওয়া ঢুকছে। বৃষ্টি কমে গেছে। তবে সে মাঠের দিকে তাকিয়ে বুঝল বৃষ্টিটা একেবারে ধরে যায়নি। ঝির-ঝির বৃষ্টি তখনও হচ্ছে। ঘুমটা কিসের শব্দে ভাঙল সে বুঝতে পারল না।

বালতির শব্দ। মগ থেকে জল তোলার শব্দ।

তুলি কি বাইরে! বৃষ্টির মধ্যে তুলি বাইরে কেন! ওর তো এত তাড়াতাড়ি ঘুম ভাঙে না। দুপুরের ঘুমটা তুলির খুব প্রিয়। সে সহজে উঠতেই চায় না। বার বার ডেকে তুলতে হয়। কারণ ঘুমের ঘোরে শাড়ি-সায়া পরে দোকানে ঢুকে গেলেই মরণ।

ললিত উঠে বসল। বালতি থেকে জল তুলে কেউ কিছু করছে। তুলি ছাড়া আর কে হবে!

সে লাফিয়ে টাট থেকে নেমে ঝাঁপ তুলে ও-ঘরে গেল। দেখল ভিতরে তুলি নেই। বৃষ্টিতে তুলি ভিজছে কেন!

বাইরে এসে অবাক। তুলি মাথায় জল ঢালছে।

কি হল তোর ?

আরও অবাক ঢুলি সায়া-শাড়ি পরেই বাইরে বের হয়েছে।

ললিত তাড়াতাড়ি হাত ধরে টেনে ভিতরে নিয়ে যাবার সময় বলল, তোর কি হয়েছে ?

কিছু হয় নি। হাত ছাড়।

আরে বলবি ত', কি হয়েছে ? মাথা ধরেছে ? বমি পাচ্ছে ? কি হয়েছে বলবি না !

কিছু হয় নি। তুমি আমার হাত ছাড় বলছি।

ঢুলির সেই চোখ—যা দেখলে যে-কেউ ভয় পাবে। দ্বারকার পাড় থেকে মাঠ-চরাদের ডেরা থেকে ধরে আনার সময়ও ঠিক টর্চের আলোতে ঢুলির চোখ এমন জ্বলতে দেখেছিল। সে ভয় পেয়ে হাত ছেড়ে দিল। যেন হাত ছেড়ে না দিলে সেদিনের মতো ফের হাত কামড়ে দেবে।

ঢুলি সোজা গটগট করে হেঁটে কি খুঁজতে থাকল।

ললিত সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে ভেবে পাচ্ছে না, হঠাৎ ঢুলির মাথা গরম হয়ে গেল কেন! সে ঘুমিয়ে পড়েছিল—তা-ছাড়া ঢুলির ভবিষ্যতের কথা মনে হলে সে সাহস পায় না বেহিসেবী হতে। বে-হিসেবী সে হয় না তা নয়, তবু মাথা ঠাণ্ডা থাকলে কতরকমের দুশ্চিন্তা মাথায় এসে ভর করে। ঢুলি কেন যে বুঝতে চায় না।

ঢুলি এটা টেনে ফেলছে, ওটা টেনে ফেলছে।

কি খুঁজছিস বলবি ত।

তুমি একদম কথা বলবে না!

ঢুলি ফের মাথা নিচু করে মাচানের নিচ থেকে কড়াই, ব্যাগ, ঝোলার কৌটো সব টেনে বের করতে থাকল।

আমার কি দোষ বলবি ত'। আমার অন্যায় দেখলে বলবি না? আমি ভাল থাকতে পারি নি।

মায়া পড়ে গেল। সব কিছু হারালেও সে ডুলিকে হারাতে পারবে না। চিন্তাহরণ মল্লিকের যত কূট চালই আসুক তাকে এখন অবহেলায় জয় করতে হবে।

ডুলি যেন স্বপ্ন থেকে উঠে বসেছে। শরীর ঢাকাঢুকি দিয়ে দৌড়ে দোকান ঘরে চলে গেল।

ললিত বলল, আসতে পারি ?

ডুলি বলল. না।

আবার কিছুক্ষণ পর ললিত বলল, আসতে পারি ?

—এস।

ললিত দেখল, ডুলি জামা কাপড় পরে আগেকার ডুলি।

ললিত চোখ নামাতে পারছে না। চুল বড় হলে ডুলির এই অপার সৌন্দর্য কোথায় রাখবে! সে অপলক তাকিয়ে থাকল।

কি দেখছ ?

তোকে।

না। ঠেলা মেরে ললিতকে সরিয়ে দিল।

ললিত ঠেলা খেয়ে সরে গেল এবং সেই পুঁটলিটা নিয়ে বাইরে বের হয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। বলল, এখন থেকে আর ছদ্মবেশে নয়। তুই যা আছিস তাই। দেখি চিন্তাহরণ কি করতে পারে!

সহসা ডুলির ভয়ার্ত চিৎকার, এটা তুমি কি করলে ?

ললিত আগুনটার দিকে তাকিয়ে আছে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি। তেল চিটচিটে জামা-প্যান্ট বৃষ্টিতে ভাল ধরতে চাইছে না। ডুলি ওই আবার টেনে নিয়ে না আসে, সে তাড়াতাড়ি কেরোসিন ঢেলে আগুনটা আরও উসকে দিল।

এই ঘেরির পাড়ে মানুষজনের আবাস। এখনও কেউ ঘরবাড়ি বানাচ্ছে। একঘর নাপিত আনিয়েছে চিন্তাহরণ। জমির বিলি-বাট্টা

তার হাতে। হাজিদের গোমস্তা তার বাড়িতে ওঠা-বসা করে। ঘেরিক্স সব জমিটাই প্রায় বিলি-বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। না হলেও জবর দখল হবে। চিন্তাহরণ সেই ভয় দেখিয়ে রেখেছে গোমস্তাকে। এখনও যে হচ্ছে না, সেটা চিন্তাহরণের মতো সাবেকি মানুষ আছে বলে। কাজেই জমির বিলি-বন্দোবস্তে তার কথাই শেষ কথা। সে এই করে দু-হাতে টাকা লুটছে। যারা আসছে, তাদের এক দর বলছে। গোমস্তার জন্য শতকরা কুড়ি টাকা এবং তার দালালি সহ জমি কেনার অর্ধেক টাকাই প্রায় বলতে গেলে চিন্তাহরণের পকেটে যায়। সে একসঙ্গে রেখেছে বিঘা পঞ্চাশেক জমি। আবাদ করতে মানুষজন লাগে। তার হাতের মুঠোয় অনেক লোক। আগুনটার দিকে তাকিয়ে ললিতের এমন মনে হচ্ছিল।

ছুলি বলল, তুমি পারবে?

পারব ছুলি। ললিত দেখল তখনও আগুনটা জ্বলছে।

কি হারমাদ লোক তুমি জান না ললিতদা?

জানি।

ছুলি দেখছে ললিত ভারী গম্ভীর।

সে ললিতের পাশে বসল। পিঠে মুখ রেখে বলল, আমাকে ফেলে তুমি কোথাও চলে যাবে না তো?

ঝিরঝিরে বৃষ্টি। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। ললিত বলল, ভিতরে যা। বৃষ্টিতে ভিজে অসুখ-বিসুখ বাধাস না।

তুমি ভিজছ কেন?

ললিত আর বাইরে বসে থাকতে পারে না। গামছা দিয়ে মাথা মুছে বলল, ঝাঁপটা তুলে দে।

ছুলি ঝাঁপ তুলতে যাচ্ছে না।

কী হল!

এত তাড়াতাড়ি? কটা বাজে?

ললিত ঘড়ি দেখে বুঝল সত্যি বড় তাড়াতাড়ি ঝাঁপ খুলতে বলছে। দুটোও বাজে নি।

ললিত এও বুঝল ঝাঁপ তুললেই সদর খোলা হয়ে যায়। এই সময়টুকু তুলি এবং ললিতের একান্ত নিজের। রাতে ঝাঁপ বন্ধ করতে দশটা-এগারোটা হয়ে যায়। ভোররাতে উঠে উনুনে আগুন দিতে হয়। কত দূর থেকে আসে সব মানুষজন। গরুর গাড়িগুলি সার বেঁধে আসে। দঙ্গল নিয়ে গাড়োয়ানরা আসে চা খেতে। তখন দোকান এত লেগে যায় যে, তুলি এবং ললিত একসঙ্গে পেয়ে ওঠে না। ফলে এই নির্জন দুপুর এবং বৃষ্টিপাতের মধ্যে যে দু'জনের মধ্যে উষ্ণতা জন্মায় ঝাঁপ তুলে দিলেই তার শেষ।

ললিত তু'লর এই একান্ত নিজস্ব সময়টুকুর কথা ভেবে ঝাঁপ আর তুলতে বলল না। পাজামা আর ঢোলা মোটা কাপড়ের হাফশার্ট— নীচে গেঞ্জি এবং কি করে যে তুলি সব সমান করে রাখে বুঝতে পারে না—দেখলে কেউ মনেই করতে পারবে না যে, তুলি হারু নয়। চরণ, সাধু, বগলা তাকে হারু বলেই ডাকে। সবাই যারা খদ্দের, হারু বলেই ডাকে। এক সকালে হরেন এসেও হারু বলে ডেকেছিল। চা করছিল হারু। হরেন কিছুক্ষণ তাকিয়ে চা খেয়ে বলেছিল, ললিত, আমার মেয়েটা যে কোথায় নিখোঁজ হয়ে গেল!

ললিত বলেছিল, সময় হলেই ফিরে আসবে।

ফিরে আসবে বলছ?

হারু তখন আর দোকানে নেই। ভিতরে চলে গিয়ে ফাই-ফরমাস খাটছিল। পলকে ঘটনা ঘটে। হরেন এলেই হারু ভিতরে চলে যায়।

তা ললিত তোমার হারু বোবা।

বোবা!

কে যেন বলল, না কথা বলে!

এই হারু, তুই কথা বলিস?

তুমি জান না ললিত কথা বলে কি-না?

আমার সঙ্গে তো দেখি আউ আউ করে। অন্য কারো সঙ্গে যদি কথা বলে থাকে—তা তো আমি জানি না!

হারু ভিতরে আউ আউ করছিল তখন। হরেন অগত্যা চলে গেছিল।

হারু চলে যেতেই ললিত ডেকেছিল, হারু খদ্দের দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে আয়।

কিন্তু কোনো সাড়া না পেয়ে সে নিজেই ভিতরে ঢুকে দেখেছিল, ছুলি কেমন অপলক তাকিয়ে আছে দূরে। চোখ দিয়ে ওর জল গড়িয়ে পড়ছে। ললিত কিছু বলতে পারে নি। ছুলি তার অসহায় বাবার জন্য কাঁদছিল। ললিত আর ছুলিকে সেই সকালে কোনো কাজ করায় নি। এক হাতে সব করেছে। মানুষ আহার এবং বাসস্থানের কাছে কত অসহায় হরেনকে না দেখলে বোঝা যায় না। সামান্য দু-বেলা আহার এবং থাকতে পাবে বলে, মেয়েকে বন্ধক রেখে চিন্তাহরণের জিম্মায় গিয়ে উঠেছিল। প্রথম দিন ছুলি দোকানে তার বাপকে দেখে চোখের জল রোধ করতে পারেনি। ইন্দ্রদার কথা মনে হয়েছিল, আমরা সবাই রাঘববোয়াল। শুধু সুযোগের অপেক্ষা। সমাজব্যবস্থা এমন হওয়া দরকার, কাউকেই রাঘববোয়াল হতে দেওয়া হবে না। মানুষ ইচ্ছে করলেই এটা পারে।

এইসব কথার এক জাদুকরী মোহ থাকে। ইন্দ্রদার সেই মোহ তাকে মাঝে মাঝে টানে: সে ভাবে পালাটার নাম 'ভয়ঙ্করী হিজল' না রেখে, 'মানুষ ভয়ঙ্কর' এই নাম রাখলে কেমন হয়। তারপর মনে হয় তার, না এই নামই বেশ। প্রকৃতি রুদ্র, কঠিন খড়ের বন মাইলের পর মাইল—সেখানে সব হিংস্র শ্বাপদের বাস। বান-বন্যা হিজলের তুখোড় দিন-যাপনের গ্লানি পার করে—মানুষকে প্রকৃতির গ্রাস থেকে নিজের আচ্ছাদন তৈরি করতে হয়। নিয়ম শৃঙ্খলা না থাকলে সব বানভাসি জলের মতো—যে যা পারে কুড়িয়ে ঘরে তুলে

নেবে। এক অবিমিশ্র আনন্দ এবং উত্তেজনা ললিতকে সেদিন গ্রাস করেছিল। সেদিনই সে স্থির করেছিল, তুলিকে ছেড়ে বাঁচতে পারবে না। তুলির জন্য সে পচাগলা সমাজের সবরকম বিধি-নিষেধ আলগা করে দিতে সক্ষম।

ঝিরঝিরে বৃষ্টিটা থামছে না। এক-ফাঁকে আকাশে সূর্যও উঁকি দিয়েছে। হিজলের তল্লানিতে যে হাজার বিঘা জমি এবং তার শস্য-ক্ষেত্র সব রোদের আলোয় ঝলমল করে উঠছে। বাইরে বসে তুলি এঁটো বাসন মাজছিল।

ললিত দোকানঘর থেকেই বলল, আবার বৃষ্টিতে বসে বাসন মাজছিস।

তুলি বলল, এই হয়ে গেল।

তুলি বাসন মেজে ঘরে ঢুকলে ললিত বলল, সব ছেড়ে ফেল।

পরব কি!

ঘরে শাড়ি কার জন্য।

বলছ পরতে।

পরলে কি হবে?

জান না কি হবে!

আসলে ললিত মনে মনে সব ঠিক করে ফেলেছে।

বাইরে বের হতে বারণ করছ।

অন্তত আজকের দিনটা।

তুলি বুঝতে পারে না ললিতের মনে কি আছে। সে দেখছে, ক'দিন থেকেই ললিতদা আবার গম্ভীর। নানারকম অনাচার চলছে। পার্বতী নাকি, থান পরে থাকে। বিষহরির পূজার সে সব আয়োজন করে দেয়। যতীন ওঝা লাল রঙের লুঙ্গি আর ফতুয়া গায়ে ঘুরে বেড়ায়। সময় বড় খারাপ। বর্ষায় সাপে-কাটা রুগী আসে। সে তুজনকে ভাল করে তোলায় বিষহরির কৃপা আছে ভাবে সবাই।

বিষহরি স্বপ্নে বলেছে নাকি, পার্বতী সেবায় না লাগলে, পটল আর কপিলকে কালে খাবে। এই এক ত্রাসে ফেলে পার্বতীকে কব্জা করার তালে আছে। তারপরই তুলির মনে হয়—এটা সে ভাবে কেন। ভগবানের লীলাখেলা কে বোঝে! হতেও পারে। স্বপ্নের কথা সত্য হয় সে শুনেছে। তাছাড়া তার নিজের মানুষটা রাতবিরেতে খালি হাতে কতদিন কত কারণে দৌড়ে যায়—মড়া পোড়াতে, ডাক্তার ডাকতে, সে বাদে এ ঘেরিতে আর কে তেমন লোক আছে। সে অলক্ষ্যে কপালে হাত ঠেকাতেই ললিত বলল, কিরে কাকে উদ্দেশ করে।

বলব না।

বল না শুনি।

তুলি জানে ঠাকুর দেবতা নিয়ে মানুষটার ঠাট্টা-তামাশা করার স্বভাব। এমন খোলামেলা প্রকৃতির মধ্যে বাস করে ঠাকুর দেবতাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করা যায় না। সে কিছুতেই বলতে চাইল না।

ললিত ঠাট্টা করে বলল, তোর গোপন দেবতাটি কে বল না।

না, বলব না। বলব না যখন বলছি, বলব না।

দেবতাকে বল না, আমাদের উদ্ধার করে দিতে।

কি উদ্ধার করবে!

আমরা যে স্বামী-স্ত্রী সে কথাটা চাউর করে দিতে।

দেবতা করবে কেন, তুমি নিজে পার না।

এই 'নিজে পার না' কথাটাই ললিতকে বিষম বিপাকে ফেলে দিল। সে বলল, আমি দিবুর কাছ থেকে ঘুরে আসছি। আজ আর ঝাঁপ তুলতে হবে না।

ললিত সোজা দিবুদের বাড়ি উঠে আসার সময় দেখল, পার্বতী থান থেকে ফিরছে। লালপেড়ে সাদা জমিনের শাড়ি পরনে। থানটা বেশ দূরে। থানটা বরং তার দোকান থেকে কাছে। দোকান থেকে দেখা যায়, ভিড় দেখলে বুঝতে পারে আবার সাপেকাটা মড়া এসেছে।

এই অঞ্চলে যতীনের নাম খুব ছড়িয়ে গেছে। তার কাছে নাকি আছে স্বপ্নে পাওয়া এক বিষহরি পাথর। ওটা ছোঁয়ালেই মড়া কথা কয়ে ওঠে। না কথা কইলে, যতীনের হাঁক, বিষহরি উচাটনে আছে। রজঃস্বলা নারী ঠিক ছুঁয়েছে কালে খাওয়া মানুষকে। অনাচার হলে সে রক্ষা করে কি করে! আধিব্যাধি আছে, তার ধন্বন্তরি আছে—সবই হল গে নিয়মের বালাই। অনিয়মে সব যায়। রুগী ছেড়ে দিয়ে সে নিদান হেঁকে দেয়—কোপ পড়ে গেছে বিষহরির—তার আর রক্ষা নাই।

আবাসের মানুষজনের এমন হাঁকে পিলে চমকায়। নিয়তি মানুষের, নইলে ওঝার সেরা ওঝা যতীনের থেকে বিষহরি ফসকে যায় কি করে।

ললিত দেখল, পার্বতী কেমন ঘোরের মধ্যে হেঁটে যাচ্ছে। ঘোর কাটেনি। কালের ভয়ভীতি দেখিয়ে যতীন পার্বতীকে দুর্বল করে ফেলেছে। বনমালীর জন্য পার্বতীর টান গড়ে উঠেছিল, কারণ দিবুদাকে সে যতই স্বপ্নে দেখুক, সে স্বপ্নে দেখা মানুষই থাকবে। বনমালী, পিসির বাড়িতে এসে সেই যে পার্বতীকে দেখে মজে গেছিল, আর নড়তে পারত না। পার্বতী কি ভাবে, সে যারে ভালবাসে, তারে কালে খায়? বিষহরির কোপ তার বাড়িতে ফণা উঁচিয়ে আছে। যেন ফাঁক পেলেই ছোবল বসাবে। পটলটার জন্য পার্বতীর উদ্বেগের অন্ত নেই। চঞ্চল বালক, বৃষ্টি-বাদলায় ঝোপে-ঝাড়ে ঘুরে বেড়ায়। কালের বাসা কোথায় কি ভাবে পড়ে থাকবে কে জানে। থানে গড়াগড়ি দিয়ে, থানে বিষহরির সেবা করে এই সমূহ নিয়তি থেকে ত্রাণের চেষ্টায় আছে পার্বতী। ললিতকে দেখেও মুখ তুলে কথা বলল না। ললিতের একবার ইচ্ছে হয়েছিল, ডাকে, পার্বতী শোন। ইচ্ছা ছিল বলে, মনের ধন্দ দূর করে দে। কপালে থাকলে তুই তা খণ্ডাবি কি করে। যতীনকাকা বড় সেয়ানা, চিন্তাহরণের এরা সাঙ্গোপাঙ্গ, গাঁজার শাগরেদ। সব এরা কাঁচা খেতে ভালবাসে। তুই এটা কেন বুঝিস না।

পার্বতী মাথা নিচু করে বাড়ির দিকে উঠে যাচ্ছে, শাড়ির আঁচল দিয়ে শরীর ভাল করে জড়িয়ে নিয়েছে। খালি গায়ে আঁচল চাদরের মতো করে জড়ানো। কিছুটা মনে হয় আবার হুঁশ ফিরে এসেছে। এই সেদিন কি দেখে এমন একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে গেছিল সে জানে না। দিবু যা বলেছে, তাতেও সে তার কোনো অর্থ খুঁজে পায় না। তবে সাপেকাটা মরা সেই রাতে একা দেখতে গিয়ে কোনো ভয়-টয় পেতে পারে। আশ্চর্য, সে তো হারিকেন হাতে লাশ নিয়ে যাবার সময় দলের সঙ্গে পার্বতীকে দেখেনি। কিংবা ফেরার পথেও চোখে পড়ার কথা। কি করে একা এতদূরে গেল মেয়েটা!

দিবুর কথা শুনলেও অবাক হতে হয়। পার্বতীকে বসতের কোথাও না খুঁজে পেয়ে দিবু অন্ধকার হিজলে নেমে গেছিল, ডাকছিল, পার্বতী তুমি কোথায়। কোনো সাড়া পায়নি। কেবল সে নাকি দেখেছে, বনমালীর শিয়রে এক নারী বসে। নির্জন মাঠে, এই দৃশ্য দিবুকে পাগলা করে দিয়েছিল। হুঁশ ছিল না তার। হুঁশ ফিরলে সে দেখেছে, টর্চটা ঝোপের মধ্যে ঝুলে আছে। তার আলো আকাশ প্রান্তে উঠে গেছে। টর্চটা হাতে নিয়ে সে ফেরার সময় দেখেছিল—সেই নির্জন খাঁ খাঁ প্রান্তরে হাঁটু গেড়ে বসে পার্বতী হাতজোড় করে কার জন্য যেন প্রার্থনা করছে। এইসব আধিভৌতিক রহস্য এখন আবাসের সব ঘরে ঘরে কথাবার্তার মধ্যে জায়গা পেয়ে যায়। রাতের অন্ধকার নেমে এলে ঘর ছেড়ে অনেকে একা বের হতে ভয় পর্যন্ত পায়। ফুলিও রাতে বাইরে বের হলে ডাকে, এই ওঠো। আমি বাইরে যাব। একা আমার ভয় করে।

ভয়েরই কথা। সে রাতে কতদিন একা এই নিঃসঙ্গ ঘেরির পাড়ে দাঁড়িয়ে আলো আঁধারের সৌন্দর্য উপভোগ করেছে। সামনে যতদূর চোখ যায় শুধু জোনাকির ওড়াউড়ি। দূর থেকে ভেসে আসে দিবুদের বাড়ির ঠাকুরঘরের আরতির কাঁসি-ঘণ্টার আওয়াজ। যেন এই শব্দমালা যতদূরে যাবে, ততদূর এক নির্ভয় মানুষের জন্য অপেক্ষা

করে থাকে। সেও রাতে এই ঘণ্টাধ্বনি শুনলে মনে জোর পায় তারপর আবার সব নিথর নিস্পন্দ। কেবল জোনাকির ওড়াউড়ি, কখনও দূর আকাশে নক্ষত্র খসে পড়ার দৃশ্য। আর পেছনে মাঝে মাঝে শোনা যায় দূরাতীত শব্দের মধ্যে ট্রেনের টংলি টংলি শব্দ। এমন নিষ্ঠুর প্রকৃতির মধ্যে মানুষের কত যে দরকার ঈশ্বরের সেই ভেবেই তারা প্রথমে একটা অশ্বত্থের চারা পুঁতেছিল। যতীনকাকাকে থান করে দিয়েছিল। আবাসের নিরাপত্তার জন্যই এটা করা হয়েছিল। এখন সেই ধুয়ে যতীনকাকা অন্য চেহারা নিচ্ছে। পার্বতীর জন্য ললিতের ভেতরটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠল। কপিলকাকার এমন সুন্দর নিষ্পাপ মেয়েটাকে বুজরুকি করে পাপের পথে টানছে।

আসলে একেই বলে লাম্পট্য। চিন্তাহরণ চেয়েছিল ছুলিকে নিয়ে শেষ জীবনে ফুর্তি করবে, সেই একই রোগে ধরেছে যতীন খুড়োকে। কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। দৈব-নির্ভর জীবন হলে যা হয়। সে এইসব ভাবতে ভাবতে দিবুদের বাড়ির সামনে গিয়ে ডাকল, দিবু, দিবু রে।

দিবুর ভাই কঙ্কণ গোয়ালঘরের পাশে কি করছিল বসে। ললিত-দাকে দেখেই ছুটে এল।

এখন সূর্য বাজার-শহর রেল পুলের পাশে হেলে পড়েছে। আকাশ পরিষ্কার। ঝিরঝিরে বৃষ্টি থেমে গেছে। ললিত ছাতাটা রাস্তাতেই বন্ধ করে দিয়েছিল। এখন সেটা দণ্ডের মতো হাতে ঝুলছে। আর এই ঘেরির পাড়ে বালি মাটি বলে, জল শুষে নেয় সহজে। বৃষ্টির জল কোথাও আটকে থাকে না। কাদা লাগে না হাঁটতে গেলে। যেন বৃষ্টিতে এই আবাসের সব মালিন্য ধুয়ে নিয়ে গেছে। প্রকৃতির মধ্যে এক গোপন খেলা আছে। না হলে মনটা যে এতক্ষণ নানা দুর্ভাবনায় ছোট হয়ে ছিল, বিকেলের এই রোদ এবং নীল আকাশ সহসা তা দূর করে দিতে সক্ষম হবে কেন! সে বলল, কঙ্কণ, তোর দাদাকে ডেকে দেত।

কঙ্কণ দৌড়ে ভেতর বাড়িতে চলে গেল। দাদা জ্যাঠামশায়ের ঘরের বারান্দায় শোয়। ওটা দাদার থাকার জায়গা। বাড়ি থেকে বের না হলে ওটার মধ্যেই দাদা শুয়ে বসে থাকে। সে এসে দেখল, দাদা ঘুমাচ্ছে।

সে ডাকল, এই দাদা ওঠ। ললিতদা তোকে ডাকছে।

দিবু পাশ ফিরে শুল। উঠল না। শুধু বলল, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কেন? ভেতরে আসতে বল।

কঙ্কণ দৌড়ে খবরটা দিতে গেলে মনে হল, তার নিজেরই যাওয়া উচিত। সে কঙ্কণের পেছনে গায়ে হাফশার্ট গলিয়ে বাইরে বের হয়ে গেল। কোন গুরুতর খবর না থাকলে দোকান ছেড়ে ললিতদা আজকাল বড় আসে না। এই আবাসের কোনো সংকটে মানুষটা একাই একশো। সে এটা যত বোঝে, বাড়ির অভিভাবকরা যেন ততটা বোঝে না। না, গুরুত্ব দিতে চায় না ললিতদাকে—কোন্‌টা সে ঠিক বুঝতে পারে না।

ললিতদা গোয়ালঘরের পাশে কেমন অপরাধী মুখে দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল, কি ব্যাপার, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে এস না।

জ্যাঠামশাই ঘুমাচ্ছেন। মা-কাকীমারাও ঘুমাচ্ছে। বাড়ির কাজের লোক নতুন এসেছে। সে তাকে রতনকাকা ডাকে। রতনকাকা জমি থেকে একবোঝা ঘাস নিয়ে এসেছে।

গরুগুলকে সেই ঘাস জাবনায় ছড়িয়ে দিচ্ছে।

বাঁশের বেড়া পার হলে, কপিলকাকার বাড়ি। বাড়িটা ফাঁকা মনে হচ্ছে। পার্বতী বোধহয় ঘরে। কপিলকাকা মাঠে। নিজের জমি নিজেই নিড়ান দেয়। পটল আলে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর বাবা ছেলে দু-বোঝা ঘাস সন্ধ্যা হতে বাড়ি নিয়ে আসে। দিবু এ-দৃশ্য আজকাল রোজই দেখছে। পার্বতীকে নিয়ে বোধহয় কপিলকাকাও ভাল নেই। ললিতদার কথায় হুঁশ ফিরে এল। কেউ বোঝে না। বাড়িটার দিকে তাকালে তার যেন সব কিছু অর্থহীন হয়ে যায়।

ললিতদা বলল, কি রে চিনতে পারছিস না।

দিবুর হুঁশ ফিরে আসে। লজ্জায় পড়ে যায়। যার খোঁজে ললিতদা এসেছে সে নিজেই কেমন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। সে এখানে এজন্য দাঁড়ায় না। ললিতদাকে বলল, ভেতরে এস।

ললিত বলল, কেন এখানে কি অসুবিধা! তোর সঙ্গে কথা আছে।

তারপর ললিত যখন দেখল রতন গোয়ালঘরে এবং কঙ্কণ পাশে দাঁড়িয়ে তখন কি ভেবে বলল, রাস্তায় চল, কথা আছে।

ওরা রাস্তা পার হয়ে ঘেরির ঢালুতে নেমে এল। ললিতের মাথার চুল এলোমেলো করে দিচ্ছিল হাওয়ায়। সে একহাতে চুল কপাল থেকে তুলে দিতে গিয়ে বলল, আমরা আজই নবদ্বীপ যাচ্ছি। এ ভাবে থাকা ঠিক না।

তোমার দোকান।

সেই তো ঝামেলা। দোকান বন্ধ থাকবে। রাতে তুই শুতে পারবি কি না জিজ্ঞেস করতে এলাম।

দিবুকে চিন্তিত দেখালে ললিত বলল, চরণও থাকবে সঙ্গে। কিন্তু জানিস ও চরণের অবস্থা। গরীব মানুষ। হাত টান থাকতেই পারে। তুই সঙ্গে শুলে ও সাহস পাবে না।

দিবু ঠিক কথা দিতে পারল না। জ্যাঠামশাইকে না বলে বাড়ির বাইরে থাকে কি করে!

কটায় যাবে?

রাতের গাড়ি ধরব ভাবছিলাম।

সকালের গাড়িতে যাও। একটা রাত দেরি হলে কত আর অসুবিধা হবে। তারপর কি মনে হতেই বলল, হঠাৎ নবদ্বীপে, কি ব্যাপার বলত! তা হলে শেষ পর্যন্ত সেখানেই থাকবে ভাবছ?

সেখানে থাকব না। ওখানে যাচ্ছি তুলিকে শাঁখা-সিঁদুর পরাতে। যতই ভাবি না কেন এসব মানব না, আসলে আমরা কি জানিস,

মানে, সব কিছু ঠেলে ফেলেও দিতে পারি না। ছুলি অবিশ্বাস করতে শুরু করেছে। এটাই হল গে আসল কামড়।

ফিরে আসবে কবে?

দু-একদিন থাকতে হতে পারে। ওখানে কল্যাণ আছে। ওর বাড়িতেই উঠব। কোথাও শাঁখা-সিঁদুর দিয়ে দেওয়া।

দোকানে দাও না। আমি না হয় কাল দাঁটুই যাচ্ছি। যা যা বলবে নিয়ে আসব। সাইকেলে গেলে বেশিক্ষণ লাগবে না।

না রে সে হয় না। ছুলির ইচ্ছা বর যেমন বিয়ে করে নিয়ে আসে, আমিও তাকে সেভাবে নিয়ে আসি। একটা টিনের সুটকেস কিনতে হবে। নীল রঙের একটা বেনারসী কিনব ভাবছি। নীল রঙটা ওর পছন্দ। আলতা, পাউডার, শাড়ি, দু' গাছা সোনার চুড়ি, শাঁখা—সব দিয়ে সাজিয়ে আনতে চাই নবদ্বীপ থেকে। ঘেরির পাড় ধরে হেঁটে ফিরব। সবাই দেখবে ললিত বিয়ে করে ফিরছে। তোকে কেউ কিছু বললে, জানাবি ললিতদা বিয়ে করতে গেছে।

যাবার সময় কেউ দেখতে পেলে।

সে পাক। তাতে আমি ভয় পাই না। আমি যে ক্যালনা লোক নই সেটাই দেখাতে চাই দিবু। নতুন কোরা কাপড় পরে, সিল্কের পাঞ্জাবি গায়ে পাম্পসু পরে ফিরব। দেখি তখন চিন্তাহরণ কি করতে পারে।

দিবু বলল, কি দরকার সেধে ঝগড়া করার। বরং তোমরা কাল রাতের ট্রেনেই যাও। অন্ধকারে গেলে কেউ দেখতে পাবে না।

ললিত হাসল। তুই কি মনে করিস, কেউ জানে না ছুলি আমার কাছে আছে?

সেটা তো লোকের সন্দেহ। তোমাকে ঘাঁটাতে চায় না। সাহস পাচ্ছে না। সত্যি যদি হারু শেষ পর্যন্ত ছুলি না হয়। এই নিয়ে মজা উপভোগ করার তো লোকের অভাব নেই। চিন্তাহরণ কিভাবে কামড় বসাবে তাই নিয়ে ভাবছে। জ্যাঠামশাইকে নাকি সকালে বলে গেছে, দু-দিন সবুর করুন, আপনাদের নাটক দেখাব।

কৈ আমাকে ত' সকালে বলিস নি।

এসে শোনলাম।

ললিত গম্ভীর হয়ে গেল। কোন কথা বলছে না। কিছু যেন ভাবছে।

দিবু এবং ললিত দু'জনেই চুপ। সামনে বিশাল প্রান্তর—প্রান্তর পার হয়ে সূর্য দূরের কোনো হিজল গাছে যেন লটকে আছে। গভীর এক রক্তাভ আলো দিগন্তব্যাপ্ত। অনেক দূরে ললিতদার দোকান, আরও দূরে মা মনসার থান। থান পার হয়ে চিন্তাহরণ বগলা সুখোদের পাড়া। কোথাও উনুনের ধোঁয়া, আকাশের নিচে পাখিদের উড়ে যাওয়া। জমি থেকে উঠে যাওয়া কৃষিজীবী মানুষের মিছিল, গরু-বাছুর ঘরে ফিরছে। আলো জ্বলবে ঘরে ঘরে! সংকীর্তনের দল আছে একটা—ওরা পাড়ায় কীর্তন নিয়ে বের হবে।

দিবু বলল, ওরা কি মনে করছে, ঢুলি তোমার কাছেই আছে।

ঢুলির বাবা না বলা পর্যন্ত কিছু হবে না। ওর বাবার একটাই সংশয়। ঢুলি ত বোবা ছিল না। চুল কেটে ফেলায় মুখশ্রীও পাল্টে যেতে পারে। তবু বাবা, চিনবে না সে হয় না। আমার কি মনে হয় জানিস, আসলে ভয়েই সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। আমাকে ত জানে। সেদিন ত সেই বনমালীর লাশ নিয়ে ঝঞ্ঝাট বাধাতে চাইলে ঢুলির বাপের সামনেই তড়পে গেছিলাম—ঢুলির বাপও ত্রাসের মধ্যে পড়ে গেছিল। মুখের ওপর বলে এসেছিলাম তুমি কি আমরা জানি। ঢুলির গায়ে পায়ে দাগ। ঢুলিকে এঁটো করে দিয়েছ। কাদির বড়বাবুর ভয়ও দেখিয়ে এসেছি।

দিবু জানে ললিতদা সব পারে। সাক্ষ্য প্রমাণের দরকার হলে সভায় ঢুলিকে দরকার হলে উলঙ্গ করে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে—এই দেখুন মহাজন মানুষেরা লালসা মানুষকে কতটা অমানুষ করে তোলে। ললিতদা ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেবে বলেও ভয় দেখিয়ে

এসেছিল। হারমাদ ইতর মানুষের বিরুদ্ধে ললিতদা না করতে পারে হেন কাজ নেই।

দিবু বলল, তুমি নাকি ওর বাড়ি জ্বালিয়ে দেবে বলে শাসিয়ে এসেছ?

কে বলল?

জ্যাঠামশায়ের কাছে অভিযোগ, আপনার ভাইপোটিকে সামলান। থানা পুলিশ হবে। এত বাড় ভাল না। বলে কি না ঘরবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেবে। এত বড় হুমকি।

ললিতদা মাথা নিচু করে বলল, তুমি আমার আশ্রয়ে না থাকলে তাই করতাম দিবু। এখন আর পারব না। তুমি আমার হাত-পা বেঁধে দিয়েছ।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে আরও কিছুটা এগিয়ে গেল। কপিলকাকার বাড়ি পার হয়ে ফটকি বোনদির বাড়ি। ঘরে লম্ফ জ্বলছে। বুড়িটা সেদিনও পার্বতীকে শাপমন্যি করেছে। ঠেস দিয়ে কথা বলেছে। ভাইপো বনমালী এলে পার্বতীর গতরে কাম কিলবিল করে বলত। এখন ঠাণ্ডা মেরে গেছে। বুড়ির তিনকুলে কেউ নেই। পার্বতীই জল এনে দেয়। দরকারে ধান ভেনে দেয়। রোদে ধান শুকিয়ে তুলে রাখে। বনমালী আর পার্বতীকে নিয়ে বিলাপ করে করে কত কেচ্ছা গেয়েছে। সেই বুড়িটার এখনও সম্বল বলতে পার্বতী। কুঁজো হয়ে গেছে। কুয়ো থেকে জল তুলতে পারে না। কাপড় কাচতে পারে না। জাঁতায় ডাল ভাঙতে পারে না। বাড়ির কাজের ফাঁকে ফাঁকে বুড়িকে এখনও আগের মতোই সব করে দেয় পার্বতী। দুপুরে থানে থাকে। সন্ধ্যায় থাকে। ভর ওঠার দিন অনেক রাতে কপিল কাকা লণ্ঠন নিয়ে পার্বতীকে বাড়ি নিয়ে আসে।

দিবু দেখল হিজলের ভুবনডাঙা ঘেরিতে এক মস্ত চাঁদ উঠে এসেছে। থালার মতো। কাঁচা সোনার রঙ ধরে গেছে আকাশে। আর তখনই দেখল, পার্বতী হাতে পরাত নিয়ে থানের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। চুল খোলা। পেছনে দৌড়ে যাচ্ছে পটল।

ললিত বলল, আজ পূর্ণিমা আমি আজই যাব। দেরি করলে শেষে ট্রেন পাব না।

আর কিছু না বলে ললিতদা চলে যাচ্ছিল। দিবু সামান্য বিস্মিত গলায় ডাকল তালে দোকানে···

চরণকে বলব। সুখোকে বলে যাব। চরণ আমার কথা বললে সুখো ঠিক থাকবে।

ললিতদার অভিমান হতেই পারে। জ্যাঠামশায়ের বিপদে ললিতদা এত করেছিল সেই ললিতদার দোকান পাহারা দেবার জন্য দিবু জ্যাঠামশাইকে না বলে রাতে থাকতে পারছে না। একজন সাবালকের কাছ থেকে ললিতদা বোধহয় এমন জবাব প্রত্যাশা করে না। তাই যে জন্যে আসা সেটার ফয়সালা না করেই চলে যাচ্ছে। যেন ও কার সঙ্গে কথা বলা! এখনও জ্যাঠামশায়ের দোহাই দেয়। মনুষত্বে কোথায় যেন অভাববোধ করে দিবু। সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে বলল তোমরা রওনা হয়ে যাও। আমি থাকব।

না না দরকার হবে না। তোর জ্যাঠামশাই মত দেবেন না। তোকে বলেই ভুল করেছি।

দিবু এবার গিয়ে সামনে দাঁড়াল। বলল, আমার ওপর রাগ করছ কেন। নিজে বুঝতে পারছ না তুলিদিকে নিয়ে কি ফাঁপরে পড়েছ। দেশ ছেড়ে এসে আমার জ্যাঠামশায়েরও তাই হয়েছে। সব কিছু হারিয়েছেন—আবার কি যেন তাঁর হারাবার কথা আছে।

ললিত চলে গেলে দিবু বাড়ি ফিরে এসে দেখল, রাতের খাওয়া-দাওয়ার পাট একটু তাড়াতাড়িই সারা হচ্ছে। জ্যাঠামশাই বাদে সবার খাওয়া হয় গেছে। মা-জ্যেঠিদের এই ত্বরা কেন সে বুঝতে পারে। থানে আজ আবার পার্বতীর ভর উঠবে। সবাই প্রশ্ন করবে। পার্বতী উত্তর দেবে। চুল খোলা হাত-পা ছড়িয়ে ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে বসে থাকে। কোন এক অপার্থিব জগতের দিকে সে যেন চেয়ে থাকে। তার বাহ্যজ্ঞান থাকে না। থানে পুজা হয়। আরতি হয়।

ধুপের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার হয়ে যায়। আর বাদ্য বাজে। বারান্দায় শতরঞ্চি পেতে দেওয়া হয়। আবাসের বুড়ো বুড়িরা বৌ-ঝিরা আসতে শুরু করে। খাসনবিশ মশাই আসেন। চিন্তাহরণ আসে তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। চিন্তাহরণের জন্য একটা চেয়ার নিয়ে আসা হয় মাথায় করে। হরেনই কাজটা করে। মেয়েরা বারান্দায় বসে। বাইরে দাঁড়িয়ে আবাসের জোয়ান-বুড়ো সব। কেবল আসে না উপেন রায়। দিবুর বাবাও আসে না। যারা এটাকে তামাশা ভাবে তাদের মধ্যে সুখো বগলারা আছে। তারা যে যায় না তা নয়। তাদের কাছে এটা একটা ভারি মজার ব্যাপার।

দিবু নিজেও একদিন গিয়েছিল। প্রথম দু-তিনদিন পর পর ক'রাতে ভর উঠেছিল। এখন সেটা পক্ষকালে দাঁড়িয়েছে। শনি-মঙ্গলবারেও হয়। এক শনিবারে সেও ললিতদার সঙ্গে থানে গেছিল। ভরের সময় ঘরটা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন থাকে। পার্বতীকে দেখা যায় না। দেখা গেলেও ঘোলা জলের নিচে প্রতিমার মতো। অথবা কুয়াশার মতো এক আবছা পার্বতী আশ্চর্য গলায় কথা বলে। পার্বতীর যে এ কণ্ঠস্বর নয় সে ধরতে পেরেছে। কেমন গম্ভীর প্রেতাত্মার কণ্ঠ যেন পার্বতীর ভিতরে কথা কয়ে ওঠে। আর দেখেছে এইসব কথা ফলেও যায়। কিছু জবাব অত্যন্ত কৌশলে এড়িয়ে যায় পার্বতীর সেই প্রেতাত্মা। তখন পার্বতীকে কেমন ভয় লাগে দিবুর। নতুন শাড়ি লাল পেড়ে, কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা হাতে থানের শাঁখা পায়ে আলতা—পার্বতী তারপর জবাব দিতে দিতে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেই—যতীন ওঝা বের হয়ে বলবে বাদ্যবাজাও, মা মনসা পার্বতীকে মুক্তি দিয়েছেন।

তখন বাদ্য বাজতে থাকে।

তখন জয়জয়কার বিষহরির।

যতীন ওঝা পরাত থেকে বাতাসা প্রসাদ দেয় হাতে হাতে।

কপিলকাকা লণ্ঠন নিয়ে একটু দূরে বসে থাকে। জ্ঞান ফিরলে মেয়েকে নিয়ে বাড়ি যাবে।

পটল তখন থানে দিদির মাথার দিকে বসে ডাকে, এই ওঠ দিদি। দিদি, ও দিদি ওঠ না।

পটলের ডাকে চোখ মেলে তাকায়। বোধ হয় বুঝতে পারে না কোথায় আছে। গায়ের কাপড় সামলে উঠে বসার চেষ্টা করে। পারে না। কেমন অসাড় হয়ে আছে সব। বড় দুর্বল বোধ করে।

যতীন ওঝা উপুড় হয়ে চোখে-মুখে কি লক্ষ্য করে পার্বতীর। চোখ খোলা। সে কোন রকমে দু-হাতে তুলে ধরে পার্বতীকে। যেন অসুস্থ পার্বতীকে ধরে ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বারান্দার বাইরে বের করে দিলে কপিলকাকা বলে, আয়। কিন্তু পার্বতী হাঁটতে পারে না। নেশাগ্রস্ত হলে যেমন পা টলে, পার্বতীর তেমনি পা টলতে থাকে। দিবুর দেখে কষ্ট হয়। সে দূরে দাঁড়িয়ে একদিন এই দৃশ্যটা দেখার পর আর থানে ভর ওঠার সময় যেতে সাহস পায়নি।

যতীনও কিছুটা পথ হেঁটে আসে পার্বতীর সঙ্গে। কপিলকাকা পার্বতীকে ধরে ধরে ঘেন্নির পাড়ে তুলে নিয়ে যায়।

যাবার সময় দিবু ভিড়ের ভেতর থেকে শুনতে পায় যতীন ওঝা বলছে, পার্বতীকে একগ্লাস দুধ দিও খেতে। আর কিছু খেতে পারবে না। কি ঝাঁকুনিটা না তার শরীরে যায়।

দেবী মহিমায় মানুষের নাকি এমনই হবার কথা।

দূর থেকে এইসব দেখার পরই দিবুর কেমন একদিন মাথাটা খারাপ হয়ে গেছিল। সকাল থেকে লক্ষ্য রেখেছিস, কখন পার্বতীকে একা পাওয়া যাবে। কুয়োর জল আনতে গেলে একা পাওয়ার সুযোগ থাকে। কিন্তু বর্ষা এসে যাওয়ায় খরা ভাব কেটে গেছে। ঘন্নির তলানিতে এখানে সেখানে কাছেই জল। বাড়ি থেকে বেশি দূরে আর হাঁটতে হয় না। কলপাড়ে আসে। সেখানে লোকজন সব সময় থাকে। পার্বতীকে একা পাওয়া যায় না।

এক বিকেলে কপিলকাকা বাড়ি না থাকলে, সে খুব সতর্ক নজর

রেখে উঠে গেছিল পার্বতীর বাড়ি। গিয়ে দেখে বারান্দায় ফর্টি
বুড়ি বসে আছে। পাহারা থাকে তবে।

গরুটা নিয়ে পার্বতী আগে ঘাস খাওয়াতে ঘেরির নিচে যেত
একা অনেকদিন এটা দিবু দেখেছে। ভর ওঠার পর থেকে তাও আর
দেখা যায় না।

বাড়িতে মা-জ্যেঠিমা সেজে-গুজে থানে যাবে বলে ছুটোছুটি
করছিল এ-ঘর ও-ঘর। কাকীমার হয়নি বলে তারা এখন দাঁড়িয়ে
আছে উঠোনে। দিবুকে দেখেই মা বলল, তোমার ভাত বাড়া আছে
খেয়ে নিও।

জ্যাঠামশাই বারান্দায় চেয়ারে বসে আছেন একা। পায়ের
কাছে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। দিবু জানে মানুষটা একদিন জেল খেটেছে
স্বদেশী করতে গিয়ে। এক ধরনের আদর্শ এবং পরিমণ্ডলের মধ্যে
মানুষ তিনি। এইসব দেবী মহিমা সম্পর্কে তাঁর কোন স্পষ্ট মতামত
নেই। বাড়ির মঙ্গল অমঙ্গলের কথা ভেবে কাউকে যেতে নিষেধ
করেন না। দিবু পায়ে পায়ে বারান্দায় উঠে গিয়ে ডাকল
জ্যাঠামশাই।

জ্যাঠামশাই কেমন কিছুটা আত্মগত ছিলেন। দিবুর ডাকে মুখ
তুলে তাকালেন। দিবু কিছু বলতে চায়। কিন্তু কি এক সংকোচে
বলতে পারছে না।

তিনি বললেন, কিছু বলবে ?

আজ আমি বাড়িতে শোব না।

কোথায় শোবে ?

ললিতদা নবদ্বীপ যাবে রাতের ট্রেনে। দোকানটা খালি পড়ে
থাকবে। আমাকে শুতে বলেছে।

তুমি বললে না কেন রাতে বাড়ির বাইরে থাকার নিয়ম নেই।

ওর খুব জরুরী কাজ। বলেছে, না গেলেই নয়। দোকান খালি
রেখে যেতে ভরসা পাচ্ছে না।

তাই বলে তুমি ওর দোকান পাহারা দেবে!

আমি একা থাকব না। চরণ থাকবে সঙ্গে।

চরণ কে?

পরেশ সাহার ছেলে।

পরেশ সাহাকেও বোধ হয় জ্যাঠামশাই ঠিক চিনতে পারছেন না। নতুন কলোনি। কত সব জায়গা থেকে লোক আসছে।

দিবু আরও বুঝিয়ে বলল, খাগড়ার বাজারে ফল বিক্রি করে। একদিন ও ঠাকুরের ভোগের জন্য কিছু ফল রেখে গেছিল।

ও সেই পরেশ। কিন্তু তোমরা থাকবে, ভয় পাবে না?

ভয়ের কি আছে।

জ্যাঠামশাই কি বুঝলেন কে জানে। শুধু বললেন, তুমি কি বলেছ থাকবে?

ললিতদা আমাদের জন্য এত করে। বলেই থেমে গেল দিবু।

আসলে সে যেন মনে করিয়ে দিতে চাইল, ললিতদাই রাজ কলেজে খোঁজ-খবর নেবার জন্য তার সঙ্গে কান্দি গেছিল। সে ছেলেমানুষ বলে একা ছাড়তে জ্যাঠামশাই রাজী হন নি এবং বলেছিলেন, দেখ সঙ্গে ললিত যায় কি না। ললিতদা নির্দ্বিধায় যেতে রাজি হয়েছিল। এসব মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যই যেন দিবুর কথাটা বলা।

মাঠের মধ্যে দোকান। রতনকে বলে দিচ্ছি। সে থাকবে।

দিবু মহা সঙ্কটে পড়ে গেছে। এমনিতেই তাকে নিয়ে পার্বতীর সঙ্গে বাতাসে ওড়া কেচ্ছায় মাথা হেঁট হয়ে আছে জ্যাঠামশায়ের। যেন সে এ-কারণে সব জোর হারিয়ে ফেলেছে। মুখের ওপর আর তার কথা সরছে না। শুকনো মুখে সে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে।

জ্যাঠামশাই বোধহয় তার সংকট ধরতে পেরেছেন। বললেন, তুমি থাকবে। সঙ্গে রতনও থাকবে। বিছানাপত্র বাড়ি থেকেই নিয়ে যেও।

সে খেয়ে-দেয়ে বিছানাপত্র নিয়ে রতনকাকার সঙ্গে রাস্তায় নেমে এল।

জ্যোৎস্না রাত। এই রাতের আশ্চর্য এক মায়া থাকে। হাওয়া দিচ্ছে বেশ জোর। দূরে থানে পেট্রোম্যাক্সের আলো জ্বলছে। দিবুর সঙ্গে আসায় রতনের একটু আজ কাজ থেকে তাড়াতাড়ি ছুটি। গরু-বাছুর গোয়ালে বাবা তুলবেন। সন্ধ্যার পর তাঁর তাস খেলার আড্ডা থাকে। সেখান থেকে ফিরতে বেশ রাত হয়। বাবা এবং ছোটকাকা শহর থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত জ্যাঠামশাই বিছানায় যান না। বাবা বাড়ি গেলেই বলবেন রতন ললিতের দোকানে শুতে গেছে। গরুগুলো ঘরে তুলে ফেলিস।

রতনকাকা যেন জোরেই হাঁটছে। যেতে যেতে বলল, দিবু আমি কিন্তু একবার থানে যাব।

ভর ওঠার দিন যতীনই পেট্রোম্যাক্সটা জ্বালিয়ে বারান্দার বাঁশে ঝুলিয়ে রাখে। দেবী মাহাত্ম্য বলে কথা। থানে মানতের হিড়িক পড়ে যাচ্ছে। থানের পাশে যে অশ্বত্থের চারাটি বড় হচ্ছে তার নিচে মা শীতলার মূর্তি। মহামারী থেকে এই আবাসকে রক্ষার জন্য যতীন ওঝা বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলছে। তার ইচ্ছে আছে অশ্বত্থের চারার গোড়াটি শান দিয়ে বাঁধিয়ে দেবে। আসলে মানুষটা এরই মধ্যে তার জীবিকার সন্ধান পেয়েছে। পার্বতীকে হাত করে সেটা আরও জাঁকিয়ে তোলার ইচ্ছে। কবে দেখা যাবে একদিন ওখানে থানের নামে মেলা বসে গেছে। আসলে মানুষ বোধহয় এ-রকম-ভাবেই বাঁচে। কিন্তু পার্বতীর ভর ওঠার মধ্যে কি যেন এক গোপন ষড়যন্ত্র থেকে গেছে। দিবুর এমন মনে হলেই মাথাটা গরম হয়ে যায়।

কি কৌতূহল হল কে জানে। দিবু পাশে হাঁটতে হাঁটতে প্রশ্ন করল, তুমি কি জানতে চাও রতনকাকা!

আমার দিবু একটাই প্রশ্ন। দেবী যদি কৃপা করে বলেন।

কি প্রশ্ন তোমার?

ঐ একখানিই। বলতে লজ্জা লাগছে।

সবার সামনে বলতে লজ্জা করবে না ?

সেই। না বললেও নয়।

সেটা কি ?

তোমার কাকীমা ফিরে আসবে কি না :

দিবু জানে রতনকাকার স্ত্রী অন্য কার সঙ্গে চলে গেছে। ওর ধারণা, ফুসলে ফাসলে নিয়ে গেছে, বুদ্ধি কম। বেচারা ভুল করেছে। দু-এক বছর গেলেই ভুল শুধরে যাবে। ঘরের লক্ষ্মী আবার ঘরে ফিরে আসবে।

দিবু কিছু বলল না। সে পা চালিয়ে হেঁটে গেল। সে গেলে ললিতদা রওনা হবে। সব বুঝিয়ে দেবে। ঝাঁপের তালা চাবি সব। দোকানে এসে দেখল ঝাঁপ বন্ধ। ভেতরে আলো জ্বলছে। সে ডাকল, ললিতদা।

ঝাঁপ তুললে সে অবাক। ছুলিদি কি সেজেছে! ললিতদা পাটভাঙা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে রেডি। কিন্তু সঙ্গে রতনকে দেখে দিবুর দিকে তাকিয়ে থাকল।

অর্ডার। একা থাকবে না। সঙ্গে রতন থাকবে। বিছানাও নিয়ে আসতে বলল।

ললিত নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, পরশু ফিরে আসব। দেরি হলেও ঘাবড়ে যাস না। সকালে চরণকে বলিস চা করে দেবে। সব আছে। পারিস ত' বিক্রি-বাটায় বসে যেতে পারিস। মানুষ এতে ছোট হয়ে যায় না। দুধটা গরম করে রাখতে বলবি চরণকে। একটা টাকা দিস। যা আছে ওতে হপ্তাখানেক দোকান চলে যাবে।

দিব্যেন্দু ভেবে পেল না এত কথা কেন। সে বলল, আরে না না। দোকান আমাকে দিয়ে হবে না।

ছুলিদি বলল, একটু না হয় দাদার জন্য করলে।

আমি এ-সব বুঝি না ছুলিদি। কি দাম-টাম জানি না। তাছাড়া জ্যাঠামশাই বলবেন, দোকানটাও তোমাকে দিয়ে গেল দেখছি।

সব লেখা আছে গায়ে। এই ছাখ লিস্টি। দোকানটা বন্ধ থাকলে অনেকের অসুবিধে হতে পারে।

একবার তার ইচ্ছে হল বলতে তুমি তো এ-সব আগে বলনি। তবু ললিতদার মুখের দিকে তাকিয়ে সে হাঁ বা হুঁ কিছু বলতে পারল না। একবার কি মনে হতেই শুধু বলল, তোমরা রওনা হয়ে যাও।

রতন তখন বলল, আমি আসছি দিবু। বলেই মাঠ ধরে দৌড়।

ললিত কি খুঁজছিল। শ্লিপার জোড়া। পরা হয় না ঝেড়ে-ঝুড়ে সেটা পায়ে গলিয়ে দেবার সময় বলল, তোকে একটা কথা বলব ভাবছিলাম। এখন মনে হচ্ছে, না—কষ্ট পাবি। ফিরে আসি। তারপর সব দেখা যাবে।

দিবু বুঝতে পারে না, সহসা এ-কথা কেন। তার কি কোন খারাপ খবর আছে। রওনা হবার মুখে—কথা বাড়ালেই বিড়ম্বনা। সে তবু যেন না বলে পারল না—উচাটনে রেখে যাচ্ছ কেন! না বলে গেলে ঘুমাতে পারব!

বের হবার মুখে শুধু বলল, ভাবিস না। ফিরে আসি আগে। তারপর যতীন আর চিন্তাহরণকে নিয়ে পড়া যাবে।

দিবু কেমন দুশ্চিন্তায় বাইরে বের হয়ে এল। বলল, দাঁড়াও আসছি।

সে ঝাঁপটা ফেলে তালা মেরে দিল। হাতে ললিতদার টর্চ। সাপখোপের উপদ্রবে কেউ টর্চ কিংবা লণ্ঠন না নিয়ে রাস্তায় হাঁটে না। এত উপদ্রব যে উঠোনেও আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়। বিছানার নিচে পর্যন্ত তেনারা পড়ে থাকেন। শোবার আগে ভাল করে বিছানা ঝেড়ে নিতে হয়। ভাল করে মশারি গুঁজে নিতে হয়। দিবু একা ফিরে এলে হাতে কোনো লণ্ঠন থাকবে না। সেই ভেবে ললিত বলল, ও কিছু না। চরণের কাছে গেছিলাম। চরণ বলল, যতীন ওঝা নাকি ভরের আগে পার্বতীকে আফিংয়ের জল খাওয়ায়।

সত্যি!

এত নিষ্ঠুর লোকটা!

ললিত ব্যাগটা হাতে নিয়ে হাঁটা দেবার সময় বলল, আফিংয়ের নেশা ধরে গেলে পার্বতী জীবনেও আর স্বাভাবিক হবে না জেনে রাখিস। তারপর বলল, মন খারাপ করিস না। আমিও ভাল নেই। চিন্তাহরণ জেনে ফেলেছে তুলি আমার কাছেই আছে। তুলিকে আমি হারু সাজিয়ে রেখেছি। গ্রামসভা ডাকছে। হারুকে নিয়ে যেতে হবে। তার আগেই ভাগাচ্ছি। ফিরে আসি। সব হবে।

ললিতদার স্বর আশ্চর্য ঠাণ্ডা। ছোটদি একটু দূরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। লাল ডুরে শাড়ি পরেছে। পথে যদি কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তাতেও ঘাবড়াবে না। এমন এক জেদ নিয়ে তারা বের হয়েছে।

এক দমে ললিতরা বাড়ি পার হয়ে মাঠে নেমে গেল। ঘেরির পাড়ে পাড়ে [illegible] সারি। লোকজন খাচ্ছে—মাঝে মাঝে ধ্বনি শোনা যাচ্ছে—জয় বিষহরি কি জয়। জয় মা মনসা কি জয়। বাদ্য বাজছে।

দিবু ফিরে ঝাঁপটা একেবারে তুলে দিল। কাঠে গজাল মারা হচ্ছে কোথাও। অবস্থাপন্ন যারা আছে তারা বানভাসি জল আসার আগে নৌকা বানাচ্ছে। বানভাসি জলে সব ভেসে গেলে একমাত্র পারানি তখন নৌকা। জ্যাঠামশাইও খবর দিয়েছেন, মিস্ত্রিরা এসে দেখা করে গেছে। ভাল আমকাঠের খোঁজে আছেন। কিংবা গাম্ভারি কাঠের। তাঁদের বাড়িতেও একখানা কোষা নৌকার দরকার।

চরণ, রতনকাকা একসঙ্গেই ফিরে এল। চরণ ভর সন্ধ্যার দিন থানে না গিয়ে থাকতে পারে না। কারণ জায়গাটা মেলার মতো হয়ে যায়। পাঁচ দশ ক্রোশ দূর থেকেও লোক আসতে শুরু করেছে। কি করে যে এ-সব বাতাসের আগে চাউর হয়ে যায়। মুমূর্ষু রুগী এসেছিল নাকি একটা। খাটিয়ায় শুইয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। পাঁচসিকা পয়সা

দিয়ে একটাই প্রশ্ন লিখে দিতে হয়েছে। আরোগ্য চায়। দেবী মহিমায় যদি আরোগ্য লাভ করে। আধি-ব্যাধি নিয়ে মানুষের বাস। মহামারী আসে ধেয়ে। সাপ-খোপের উপদ্রব। বানবন্যা কত সব প্রকৃতির বিনাশী আচরণ। তার মধ্যে মানুষ বড় একা। খড়কুটোর মতো দৈবনির্ভর করে সংসারের পলতেটা জ্বালিয়ে রাখতে চায়।

দিবু বাইরে দাঁড়িয়ে এ-সব ভাবছিল। কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। প্রথম এখানে এসে মনে হয়েছিল, এই সুমার হিজল বিলে জ্যাঠামশাই বাড়ি কেন করতে গেলেন। পৃথিবীর দূরতম কোনো। এক গ্রহে যেন সে হাজির। পরীক্ষার জন্য তাকে একটা বছর দেশে ঠাকুমার সঙ্গে থাকতে হয়েছে। এখনও বাড়ি ছেড়ে সবাই আসে নি। ধীরে ধীরে দেশের বাড়ি খালি করা হচ্ছে। সে এসেই দেখেছিল, এক ধূসর উষর মাঠে মানুষ আবাস তৈরি করে প্রকৃতির সঙ্গে লড়বে বলে কোমর বাঁধছে। তার মনে হয়েছিল, অগম্য এমন একটা জায়গায় কি স্বাদে যে বাপ-জ্যাঠারা বাড়ি করতে গেল! নিজেকে বড় আলগা মনে হচ্ছিল। অথচ এই জ্যোৎস্না রাতে থানের পেট্রোম্যাক্সের আলো নিভে গেলে এক অন্ধকার প্রকৃতি তাকে গ্রাস করতে থাকল। কেমন নিদারুণ তার আকৃষ্ট করার এক বিশাল মায়া। থাবা উঁচিয়ে তাকে গ্রাস করতে আসছে। সে বাইরে ছুটে যেতেও পারবে না। মাটির ভেতর তার শেকড় নেমে গেছে। পার্বতীর জন্য তার চোখে জল এসে গেল। একটি অসহায় মেয়ের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যতীন ওঝা জীবিকার সন্ধানে মত্ত।

ভেতরে বিছানা করা হয়েছে। নিচে চরণ আর রতনকাকা শোবে। সে টাটে। বাঁশের মাচান করে দোকানের টাট বানানো। মসলাপাতির টিন সরিয়ে দিলে একজনের মতো শোবার জায়গা হয়ে যায়। ও-ঘরটায় ঝাঁপ ফেলে তালা মেরে গেছে ললিতদা।

চরণ বিড়ি ধরাল একটা। বলল, দিবু কাল গ্রামসভা হবে, যাবি না?

তুই কোথায় শুনলি।

নেপাল কর বাবাকে বলে গেছে। সকালে মল্লিক তোদের বাড়ি নিজে যাবে তোর জ্যাঠামশায়কে বলতে।

দিবু খবরটা আগেই পেয়েছে বলে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করল না। সে রতনকে বলল, রতনকাকা দেবী তোমাকে কি বলল?

ছাড়ান দাও। আমার কথা কে কানে লয়।

কিচ্ছু বলল না।

ভিড় ঠেলে যেতেই পারি নি। ঢুকলেই সবাই হা হা করে আসছে।

খুব ভিড় হয়েছিল বুঝি।

হবে না। কি কথা গ! হাঁক শুনলে হাড় গলে জল হয়ে যায়। জ্বলজ্বল করছে মুখ। নথ কাঁপছে। ও দর্শন করাও পুণ্যি।

তা'লে খুব পুণ্য সঞ্চয় করলে দেখে।

তা বলতে পার। পাপী-তাপী মানুষ। আর জন্মে কি কু-কর্ম করে এয়েছিনু, ভগমান এ-জন্মে শোধ নিচ্ছে। জোরজার করে ঢুকে আর পাপ বাড়াতে চাই না। কে বলবে, কপিলের মেয়ে! সাক্ষাৎ ভগবতী। কত জন্মের পুণ্য থাকলে এটা হয় দিবু?

দিবু পাশ ফিরে শুয়ে বলল, সে তো জানি না রতনকাকা।

এত লেখাপড়া শিখছ, এই গুহ্য কথাটা জান না। বইয়ে লেখা থাকে শুনেছি। শাস্ত্র ঘাঁটাঘাঁটি করলে জানা যায়।

দিবুর ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল। সে জড়ানো চোখেই বলল, হবে।

এরপর কেউ আর কথা বলছে না। চরণ চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। কাল একটা বড় ঝড় উঠবে। আফিংয়ের জল খাওয়ায়, সেই জানে শুধু। বাপ তার খাগড়ার বাজার থেকে আফিং এনে দেয় যতীনকে। বাপের নিজেরও এতে দুটো পয়সা হয়। কথায় কথায় বাপ খাবার সময় বলে ফেলেছিল—ওটা সরিয়ে রেখ। সকালে যাবার সময় যতীনকে দিয়ে যাব।

তার মা কথাটা বুঝতে না পেরে বলেছিল, ওটা, কি বলছ!

আরে আফিংয়ের পুরিয়াটা।

সে অবাক হয়ে বলেছিল, বাবা, যতীন ওঝা আফিং খায়?

সে খাবে কেন! ওঝা মানুষ, মন্ত্রতন্ত্রের আচার নিয়ে ব্যস্ত—আফিং খেয়ে নেশা করলে তার চলবে কেন!

তবে কে খায়।

খায় কেউ। আফিংয়ের জল খেলে বুঁদ করে রাখা যায়। তাতে যোগ তৈরি হয়। দেবী মহিমা বাড়ে। দেবীর মাথা সাফ রাখতে, যতীন পার্বতীকে আফিংয়ের জল খাওয়ায়। পাঁচ কান করবে না। দেবীর কোপে আমরা তবে সবাই পড়ে যাব। যতীন বার বার সতর্ক করে দিয়েছে।

দিবু ভোররাতে স্বপ্ন দেখে কেমন ধড়ফড় করে উঠে বসল। যেন কোন এক নারী বিশাল প্রান্তরে দু-হাত তুলে ছুটে যাচ্ছে। হাজার হাজার গৃধিনী উড়ে যাচ্ছে পেছনে। সামনে তার প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড। দু-হাত তুলে নারী যেন সেই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেবার আগে বলছে, আমাকে বাঁচাও। যদি কোন স্বর্গলোক থাকে সেখানে আমি যেতে চাই এবং এক কাপালিক সামনে পথ আগলে বলছে—সেই যে তৃতীয় নাগলোক, তৃতীয় দিব্যলোক—যাহা নভোমণ্ডলের ঊর্ধ্বে, যাহাতে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করা যায়—যে স্থান সর্বদা আলোকময় সেখানে তুমি গমন কর। অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে স্বর্গের পথনির্দেশ আছে।

স্বপ্নের ঘোর তবু কাটছে না। সে সেই নারীর আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছে—তথায় আমাকে অমর কর, অমর কর। যেথায় সকল কামনা নিঃশেষে পূর্ণ, যেথায় জীবনে তৃপ্তিলাভ হয়, তথায় আমাকে অমর কর। যথায় বিবিধ প্রকার আমোদ-আহ্লাদ বিরাজ করিতেছে, যথায় অভিলাষী ব্যক্তির তাবৎ কামনা পূর্ণ হয়, তথায় আমাকে অমর কর।

গলায় রুদ্রাক্ষের মালা—বাজুতে রুদ্রাক্ষের মালা—নগ্নপদ—রক্তাম্বর পরনে—জটাধারী সেই কাপালিক অঙ্গুলিনির্দেশে অগ্নিকুণ্ডে

প্রবেশ করতে বলছেন নারীকে। তাকে অগ্নিদগ্ধ হয়ে স্বর্গলাভের পথ বাতলে দিচ্ছেন।

ভোর রাতের স্বপ্ন সত্য হয়। এমন এক সরল বিশ্বাস দিবুর আছে। সে নারী কে? পার্বতী, না ফুলিদি, না ফণীর দিদি—কে সেই নারী—যে অমরত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষায় দিক্‌ বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রান্তর মধ্যে ছুটে যাচ্ছে। কার মুখ সেটা?

পূবের জানালায় দেখতে পেল আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। সে ঘামছিল। বাঁশের লাঠিটা সরিয়ে এনে ঝাঁপ তুলে সে বাইরে বের হয়ে এল এবং সকালের শান্ত-সমাহিত প্রকৃতির মধ্যে দাঁড়িয়ে আশ্চর্য এক সরল বিশ্বাসে মন আপ্লুত হয়ে গেল—ঊর্ধ্বাকাশে সত্যি যেন সেই স্বর্গ। সেখানে ঈশ্বরের রাজ্য। সরল বিশ্বাসে সে বলল, আপনি তাকে রক্ষা করুন। তারপর সে হেঁটে যেতে থাকল সামনের দিকে।

ঘেরির পাড়ে উঠে যেতেই মনে হল, এ-ভাবে তার ঝাঁপ খোলা রেখে চলে আসা উচিত হয়নি। সেও যেন পার্বতীকে নিয়ে এক ঘোরের মধ্যে পড়ে গেছে। সে জন্য পার্বতীকে তার স্বপ্নের কথাটা বলবে বলেই ছুটে যাচ্ছিল। সে আবার নেমে যাবার সময় দেখল, হরেন পড়ি মরি করে সাতসকালে ললিতদার দোকানের দিকে নেমে আসছে। সে দাঁড়াল। তাকে সামনে পেয়েই কেমন আতঙ্ক গলায় বলল, ললিত নাকি পালিয়েছে?

পালাবে কেন? নবদ্বীপে গেছে।

দিবুর আসলে লোকটার সঙ্গে কোন কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। চিন্তাহরণের দালাল, শয়তান ফেরেব্বাজ মানুষ মনে হল হরেনকে। অকম্মা বাপ, তার আবার এত ফুটানি। ললিতদা পালিয়েছে। তুমি কি করছিলে! ফুলিদিকে রাতে যখন চেপে ধরেছিল তোমার গুরু, তখন কোথায় ছিলে! নিখোঁজ এতদিন, খোঁজ করনি কেন? সব জানে। আসলে কেলেঙ্কারী প্রকাশ হয়ে

পড়বে ভয়ে চুপ মেরে গেছিলে। ললিতদা চলে যেতেই ভড়পানি শুরু হয়েছে।

দিবুর কথা বোধহয় হরেনের বিশ্বাস হয় নি। সে দৌড়ে ললিতের দোকানের দিকে এগিয়ে গেল। চরণ বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁত মাজছে। রতনকাকা অনেক আগেই উঠে চলে গেছে। দোকান খালি ফেলে চরণ যেতে ভরসা পায়নি। দিবু এসে বলল, কোথায় গেছিলে। উঠে দেখি নেই।

হরেন তখন উঁকি মারছে।

চরণ বলল, হরেনকাকা যাকে খুঁজছে সে নেই।

দিবু ভেতরে ঢুকে বলল, চরণ উনুনটা জ্বালা। চা কর। হাত-মুখ ধুয়ে এসে আজ দোকান লাগাব।

চরণ উৎসাহ পেয়ে যায়। সকালে চা—ভাবা যায় না।

হরেন যেভাবে ছুটে এসেছিল, ঠিক সেইভাবে আবার ছুটে ধান পার হয়ে ঘেরির পাড়ে উঠে গেল।

রাস্তায় লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। ওরা প্রশ্ন করল, কি ললিত ভেগেছে!

হরেন কপালে করাঘাত করে বলল, আমার নিষ্পাপ মেয়েটার কপালে ভগমান এই লেখা ছিল।

চিন্তাহরণ প্রাতঃকৃত্য সারতে মাঠে নেমে গেছিল। কানে পৈতা গোঁজা। হাতে লোটা একখান। বাড়ির কাজের লোক অবিনাশ রাস্তার পাড়ে দুটো শান ফেলে হাত-মুখ ধোবার জায়গা করে দিয়েছে কবে থেকে। সেখানেই সে কল থেকে এক বালতি জল তুলে রেখে দিয়েছে। কর্তা ফিরে এসে সেখানে বসে হাত-মুখ ধোয়। মেজাজ গরম। হুলি এভাবে ললিতকে নিয়ে হাওয়া হয়ে যাবে বুঝতে পারে নি। রায়মশায়কে বলেছিল নাটক দেখাবে। গ্রামসভা ডেকে সবার সামনে হারুকে এনে বলবে, এই দেখুন, সমাজ-সংসার আছে। স্ত্রী

পুত্র কন্যা আছে। সংসারে থেকে এমন অনাচার কে সহ্য করে! অমন সমাজের কেঁথায় আগুন। আপনারা সবাই আছেন। সবার ঘরেই মা বোন আছে। চোখের সামনে কুমারী মেয়ের সর্বনাশ—আপনারা সবাই গণ-দেবতা—আপনাদের যা হুকুম হবে, আমরা সবাই তা মাথা পেতে নেব। কর্তার মেজাজ গরমের কথা ভেবে অবিনাশের এ-সব মনে হচ্ছিল।

তবে অবিনাশ জানে, কর্তা বড় ধুরন্ধর লোক। সহজে ললিত পার পাবে না। সে যেখানেই যাক। কর্তার একটাই দোষ, তা হল গে চরিত্রগত দুর্বলতা। এক সময় তো উড়ো খবর ছিল, হরেনের মেয়ে দুলির গায়েগতরে আর একটু মাংস লাগলে শেষ পক্ষের বৌ করে নেবে। হরেন নিজেও এই ভেবে বেশ সে-সময় কর্তৃত্ব ফলাচ্ছিল। বিধি বাম হরেনের। মেয়েটা রাতে বেপাত্তা হয়ে গেল। কর্তা হরেনকে নিয়ে থানায় এজাহার দিতে গেল। ফিরে এল। খড়ম পায়ে এ-উঠোন ও-উঠোন করল।

বড় দুই ছেলেও বাপের কু-কীর্তির ভয়ে এখানে আর আসেই না। লায়েক ছেলে ঘরে থাকতে তৃতীয় বিবাহ—ছিঃ মানুষ না। প্রথম পক্ষ দেশেই গেছে, দ্বিতীয় পক্ষ বিছানায় পড়ে গোঙায়—কর্তার চলে কি করে। তারপর ফের উড়ো খবর দুলি ললিতের দোকানে এসেই উঠেছে। সে গেছে। দুলিকে সে দেখেনি। চেনে না। তখন কর্তার কাছে সে ছিল না। দুলি যাবার পরই কর্তার লোকের অভাব। হরেন তাকে খোরাকিসহ মাসকাবারি মাইনেতে এনে তুলেছে। হরেন নিজেও কর্তার জমিতে খাটা-খাটনি করে। কর্তার সঙ্গে হাটে যায়। গরু দুয়ে দেয়। গরুর জন্য ঘাস তুলে আনে জমি থেকে। একখান সংসারে তো কাজ কম থাকে না। কাজ-কামে থাকলেও কর্তার অন্দরে ঢোকা নিষেধ। সে শুধু হরেনের প্রবেশ পত্র আছে। দুলিকে এই আবাসের খুব কম লোকই দেখেছে। দুলি হরেনের মেয়ে শুধু এই খবরটুকু সবাই রাখে। ললিতের দোকানের

ছোকরা চাকরের কাজটা যে তুলির ছদ্মবেশ সেটা তুলির নিখোঁজ হবার পনের-বিশ দিন পরও কেউ টের পায় নি। হরেনই একদিন এসে বলেছিল, ধন্দ ধরে গেল। তা আমার মেয়ের কি সুন্দর চুল— ওর তো তা নেই। মুখখান তুলির। তা বললে হয় কর্তাকে। বলব বলব করেও বলতে সাহস পায় না। ভাদ্র মাসের কুকুরের মতো কর্তার মেজাজ। কবে তাকে আর তার ল্যাসাক্ষেপা বৌটাকে তাড়ায় সেই ভয়েই আছে। তার ওপর ফের তুলির খবর দিলে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা না হয়ে যায়। এই ভাবতে ভাবতে একদিন তার ভাবনাটা বেলুনের মতো ফুটে গেল।

সত্যি বলছিস তুলি ওখানে ?

মনে লয়।

জিজ্ঞেস করলি না ?

করলাম। ললিত বলে চাকর। গোকর্ণে বাড়ি।

তোকে দেখে কিছু বলল না তুলি।

তুলি কেন হবে। তুলির মতো দেখতে। মনটা পোড়ে। টানে চলে যাই, ললিত পছন্দ করে না। আমাকে দেখলেই ক্ষেপে যায়।

সেই থেকে সংশয়।

সংশয় এখন টসটসে পাকা ফল হয়ে গড়াচ্ছে।

যাবার সময় ললিত তার কাকার সঙ্গে দেখা করে বলে গেছে চিন্তাহরণকে বল, তুলিকে আমি বিয়ে করে এখানে এনে তুলছি।

কাকা মানুষটি তার কাপড় ফিরি করে। ভাইপোটির মাথা কে এক ইন্দ্রদা এসে যে বিগড়ে দিয়ে গেছিল, সেই থেকে বনিবনা নেই। তবু শুভকাজে যাচ্ছে বলে গুরুজনদের প্রণাম করে গেল। তবে ললিতের সঙ্গে তারা তুলিকে দেখেনি। এই সুমার মাঠে তুলিকে কোথাও দাঁড় করিয়ে দেখা করে গেছে বোধ হয়।

মাথায় এখন কর্তার বজ্রপাত।

এক নম্বর, তুলির গায়ে আঁচড় লেগে যদি থাকে !

দু নম্বর, তার খাইস উঠেছিল যাকে নিয়ে সেই এখন শত্রুপক্ষের ঘরে।

তিন নম্বর, মাথা হেঁট হয়ে যাবে সব প্রকাশ হয়ে পড়লে। তার আগেই কর্তার বিহিত করা দরকার।

মুখ ধুচ্ছে কর্তা। গলায় উপবীতখানা জ্বলজ্বল করছে। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। কনুইতে সর্বসিদ্ধি তাবিজ। একজোড়া খড়ম সে এনে রেখেছে—দয়া করে হাত-মুখ ধুয়ে তা শ্রীচরণে গলাবেন। গলা সাফ করছেন। খাকারি দিয়ে কফ তুলছেন। মাঝে মাঝে চোখ তাঁর রক্তবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এদিক-ওদিক কি দেখছেন। সকাল বেলায় এত মাথা গরম হলে চলে না—সে বোধটি টনটনে। কিংবা তিনি বিষয়টি মাথায় রেখেছেন এও বুঝতে দেন না।

এক নম্বর প্রশ্ন, ক'জন মুনিষ জমিতে নামছে?

অবিনাশের উত্তর, সতের জন।

ধানের নিচে জমিটা দেখলাম নিড়ানি পড়ে না। আগাছা বাড়ছে।

সব সাফ হয়ে যাবে।

ইস্টিশনে কে গেছে।

ধীরেন।

সকালে ধীরেন সাইকেলে ইস্টিশনে যায় কাগজ আনতে। আবাসের খবরের সঙ্গে দুনিয়ার খবর রাখার উৎসাহ তাঁর প্রবল। কাগজখানা বেলায় এলে, চেয়ারে বসে মনোযোগ দিয়ে পড়লেন। জলখাবার খান কলা আর দুধ। চা খান তারপর। মাথায় ছাতা নিয়ে বের হন জমি দেখতে। বোনাবুনি শেষ। এখন চারাগাছ কত বড় হয়েছে আলে আলে ঘুরে তা একবার দেখা। স্বাভাবিক একেবারে। কে বলবে মাথায় বজ্রাঘাত নিয়ে মানুষটা ঘুরছে।

একবার বললেন, কালীপদকে ডাক।

কালীপদ এলে বললেন, বিজিনেস লোন পাবি। সই দিয়ে যাস। তোর দুই মেয়ের নামেও ক্যাশডোল করিয়ে দেব।

তারপর হাঁকলেন, যতীন ওঝাকে ডাক।

সাঁঝবেলায় সাধারণত ডাক পড়ে। এই সকালে ডাক পড়তেই যতীন হন্তদন্ত হয়ে হাজির। যতীন বারান্দায় বসে তামাক সাজতে লেগে গেল।

শুনেছিস সব। চিন্তাহরণ চেয়ারে বসে উদ্গার তুললেন ছুটো।

কী!

ললিত ছুলিকে ভাগিয়ে নিয়েছে।

বড়ই কুকর্ম। কিছু আর থাকল না।

তামাক কর্তার হাতে দিয়ে নিচে একটা জলচৌকিতে বসে থাকল যতীন। কর্তা নিবিষ্ট মনে তামাক খাচ্ছেন। খুবই আত্মমগ্ন।

যতীন ফের বলল, এক নম্বর ঠুকে দেন। বুঝুক।

বিকেলে সভা আছে। আসবি। হরেন গণ-দেবতার কাছে বিচারপ্রার্থী। কোর্ট-কাছারি করে কিছু হয় না।

কর্তার মুখে রামনাম শুনে যতীন ভড়কে গেল। যে কোর্ট-কাছারি করে হয়কে নয় করে কত জমি কব্জা করে ফেলল, তেনার মুখে এমন কথায় যেকোন মানুষের ভড়কে যাবার কথা।

বিচারে কিন্তু থাকবি! ধানের জমিটা তুই পাবি। দাগ নম্বর মিলিয়ে দেখি। দেবোত্তর করে দেব ভাবছি।

যতীন উঠছিল।

নে তামাকটা খা।

তামাক খেয়ে উঠে যাচ্ছিল—বোঝাই যায় এই অবেলায় কর্তার সামনে বসে থাকতে তার অস্বস্তি হয়। সাঁঝ লাগলে কর্তার দিল সাফ। শতরঞ্চ পেতে গল্পগুজব—দেশ বাড়ির কথা, নদীর কথা, মাছ ধরার গল্প এবং নারীঘটিত কেচ্ছার সঙ্গে গঞ্জিকা সেবন। সে এক তুরীয় মার্গের ব্যাপার। যে আসে সেই বোঝে কি মহিমা তার। তখন কর্তার মতো বিবেকবান মানুষ ছুটি কম হয়। হুঁকো রেখে সে উঠে যাচ্ছিল—তখন আবার ডাক, বস।

যতীন ওঝা বসল।

কর্তা একটা পা চেয়ারে তুলে বললেন, তুই নাকি পার্বতীকে আফিংয়ের জল খাওয়াস।

যতীন সহসা হাউমাউ করে কর্তার পা জড়িয়ে ধরল।

আজ্ঞে ও মিছাকথা কর্তা। আমি বিষহরির দাস। সব তেনার কিরপাতে হয়। তাঁর মহিমা বোঝা ভার। সব মিছাকথা।

হাচা মিছা যাই হোক, সাবধানে থাকা ভাল। কুৎসা বাতাসের আগে যায়।

উঠে যাবার আগে চিন্তাহরণ একবার যতীনের মুখখানা দেখল। ভয়ে আমসি। কাজে আসবে। দয়া করে যেন বলা, তুই ভালে যা। আর শোন, সবাইকে খবরটা দিবি, থানে সভা বসছে। সামিয়ানা টানিয়ে দিবি। হরেন আমার বাড়ি থেকে চেয়ার নিয়ে যাবে। রায়মশায়ের কাছে আমি নিজেই যাব।

যতীন জানে এই ঘেরিতে একমাত্র কোনো কাঁটা থাকলে মল্লিকমশায়ের, সে হল গে রায়মশাই। কোনো কিছুতেই মাথা পাতে না। পুনর্বাসন দপ্তর থেকে টিন, হাউস লোন, ক্যাশডোল, বিজিনেস লোন—কত কিছু দিচ্ছে। মল্লিকমশাই হপ্তায় দপ্তরে একবার কাগজ-পত্র সঙ্গে নিয়ে যায়। অফিসার এলে তদন্ত করায়। তবে এই মানুষটির ওপর আর কারো কোনো কথা নেই। ছয়কে সহজেই নয় করে দিতে পারে। শহরে জোর মুরুব্বি আছে তার। কংগ্রেসের এক নেতার নামে সব সময় মল্লিকমশাই দোহাই দিয়ে থাকে। এরপর সে যত জাঁদরেল অফিসার হোক—মুখে তার আর রা সরে না। মল্লিকমশাই পারে না হেন কাজ নেই। টিউকল দিয়েছে সরকার। কুয়ো খোঁড়ার টাকা বের করেছে। বলতে গেলে দানছত্র। সকাল হলেই লোক এসে বসে থাকে পায়ের কাছে। রাস্তায় যাবার সময় যতীন দেখল সুখো যাচ্ছে। জমির পাট্টা পাচ্ছে না, যদি কর্তা দয়া করেন সেই আশায় যাচ্ছে চিন্তাহরণের কাছে।

যতীন বলল, কর্তার মেজাজ খারাপ। হিতে বিপরীত হতে পারে। পাট্টার কথা বলতে যেও না।

কেন কি হল।

ললিত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ছুলিকে নিয়ে চলে গেছে। বিয়ে করে ফিরে আসবে বলেছে।

এই করে ধীরে ধীরে আবাসে জানাজানি হয়ে যায়। চিন্তাহরণ মল্লিক গ্রামসভা ডেকেছে। নয়া আবাস, কত রকমের কীট-পতঙ্গের উৎপাত, তার ওপর যদি ঘরের লোক বুকে ছুরি বসায়, তখন আর মেজাজ ঠিক থাকে কি করে!

সুখো গিয়ে দেখল, একখান ফতুয়া গায় দিয়ে ছাতা মাথায় মল্লিক বাড়ি থেকে বের হচ্ছে। সঙ্গে হরেন-বগলা। চিন্তাহরণ রাস্তায় কখনও একা চলে না। বাড়িতে সে একা থাকে না। হরেন-অবিনাশ পাহারাদার তার। চিন্তাহরণ মল্লিক জানে—তার কাজকর্মে সবাই খুশি নয়। তার প্রস্তাব-প্রতিপত্তিতেই অনেকের গা-জ্বালা ধরেছে। সাবধানের মার নেই। রাস্তায় সুখোকে পেয়ে বলল, চল। রায়মশাইর কাছে যাচ্ছি। যেতে যেতে সুখো তার জমির পাট্টার কথা তুলল। খুব খুশি মনে যেন চিন্তাহরণ বলল, হবে, সব হবে। আমি ত' মরে যাই নি।

মাথায় বজ্রপাত, ঘিলু জ্বলছে, তুই বেটা কুলাঙ্গার, ব্রাহ্মণ কন্যার গায়ে হাত দিলি। জানিস মুনি-ঋষিরা পার পায়নি, ভস্ম হয়ে গেছে—আহা ছুলির সেই স্বর্ণকান্তির কথা ভাবলে, চোখ জুড়িয়ে আসে। কত ঘিলু ঘামিয়ে অঙ্ক কষে কাজটা করা, দাঁও মরবি তুই। মল্লিক কি মরে গেছে! কোথায় নিয়ে যাই তোকে দেখ না। এবং এক অগ্নিকুণ্ড দেখতে পায় মল্লিক। দাউদাউ করে জ্বলছে।

রায়মশাই আছেন?

উপেন রায় ভাইপোকে ডেকে বলল, দেখ ত' বাইরে কে ডাকছে। বসতে বল। দুজন রুগী সামনে বসে। একজনকে হাঁ

করতে বলছেন। গলার পাশে টিপে দেখছেন। চোখ টেনে দেখছেন। খাদ্যের অভাব। ওষুধে কিছু হবে না। তবু এরা বড় আশা নিয়ে থাকে, বাঁচে! তাঁর কাছ থেকে বেঁচে থাকার সঞ্জীবনী সুধা কামনা করে। তিনি বললেন, পাঁচ পুরিয়া থাকল। দু-দিন অন্তর খালি পেটে সকালে খাবি। ওষুধ খাবার এক-ঘণ্টা আগে, এক-ঘণ্টা পরে বিড়ি খাবি। মনে থাকবে!

থাকবে কর্তা।

কলমি শাক খাবি। গিমা শাক খাবি। ডাল খাবি। সজনে পাতা বাটা খাবি। পুনর্নবার রস খাবি সকালে। পারিস ত' দুধ খাবি ছিটেফোঁটা।

দিবু বাইরে আসতেই মল্লিক একেবারে দরাজ প্রাণ—এই যে বাবাজীবন, তোমার কৃতিত্বের খবর আমরা সব রাখি। সুখোর দিকে তাকিয়ে বলল, দিবু আমাদের গর্ব। এই যে দিবু বাবাজীবন, চল ভিতরে যাই। তোমার জ্যাঠামশাই খুব ব্যস্ত।

না, ব্যস্ত না।

চিন্তাহরণ দিবুর সঙ্গেই হাঁটতে হাঁটতে ভেতর ঢুকে গেল। হাতের লাঠিখান ঘোরাচ্ছে। এটা তাঁর স্বভাব। ভেতরে ঢুকেই হাঁক-ডাক এই যে বড়দি মেজদি, যেন কতকাল ধরে দেখা নেই, তোমরা কোথায়। ভাইটির তো খবরও নাও না। ভাইটির তো মন মানে না সে চলে আসে।

দিবু ভেবে পায় না, এমন মেজাজী মানুষের পক্ষে ভেতরে একজন শয়তান পুষে রাখা কি করে সম্ভব! লোকটাকে সে একমাত্র মাঠে নামলে দেখতে পায়। কিংবা শহরে যাবার জন্য স্টেশনে ট্রেন ধরতে গেলেও দেখতে পায়। তখন কেমন গম্ভীর এবং অভিভাবকসুলভ দৃষ্টি। দুলিদির সে রাতের বর্ণনা শোনার পর লোকটাকে সে পিশাচ ভেবে থাকে। কিন্তু এই মুহূর্তে তার মনেও ধন্দ ধরিয়ে দেয়। মা-

জ্যেঠির সঙ্গে কথা বলছে, দিদিরা আপনাদের রূপের কি শেষ আছে —এই উগ্রচণ্ডা, এই অন্নপূর্ণা।

অথচ লোকটাকে দেখলেই দিবুর কেন জানি পায়ের রক্ত মাথায় উঠে যায়। কেমন নির্লজ্জ বেহায়া মনে হয়। মা-জ্যেঠির চেয়ে বয়সে কত বড়, অথচ হাবভাবে কচি খোকাটি। জ্যাঠামশাই রুগী-পত্তর না ছেড়ে যে ওর সঙ্গে কথা বলবেন না সেটা টের পেয়েই বড় ঘরের বারান্দায় উঠে গেছে। বলছে, কত করে বললাম, একদিন ভাইটির বাড়িতে আসা হোক—কপাল। কে যায়। ভাইটির টান থাকলে কি হবে বোনেদের তো টান নেই।

মা-জ্যেঠিরা হুঁ হাঁ করছে। বোঝাই যাচ্ছে পরিবারের কর্তাটি চায় না বেশি মেলামেশা। কিছুটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টায় দিবু দেখল তার মা রান্নাঘরে ঢুকে গেছে। চা করতে হবে। ঘরে যা মিষ্টি বানান থাকে, তাই দিতে হবে। এটা এ বাড়ির মর্যাদার প্রশ্ন। চিন্তাহরণ কি টের পেয়ে বলল, এখন আর চা না। রায়মশাইয়ের সঙ্গে স্বল্প কটি কথা আছে। দিবু বাবাজীবন দেখ না, হল কি না।

জ্যাঠামশায় তখন ডাকলেন, আসুন।

চিন্তাহরণ ওদেরও ডেকে নিয়ে এল। হরেন এসেই জ্যাঠামশাইর পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়ল, আমার সর্বনাশ রায়মশাই। নাবালিকা হরণ। ললিত আমার মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছে।

চিন্তাহরণ কথা কেড়ে নিয়ে বলল, আপনি ব্রাহ্মণ সন্তান। আমি হরেন ব্রাহ্মণ সন্তান। —বর্ণশ্রেষ্ঠ, কি যে অধোগতি সমাজ সংসারের, দেশছাড়া হয়েছি বলে কি সব গেছে! শূদ্রের এত তেজ থাকবে কেন? নাবালিকা হরণ হলে সমাজ সহ্য করে কি করে!

জ্যাঠামশাই বললেন, সমাজ আর আছে কোথায়।

নেই বলছেন! না না, রায়মশাই আপনি এ কথা বলবেন না। আপনি এমন কথা বললে, এরা সব দাঁড়ায় কোথায়। মাথায় পা রাখতে চায়। এত বড় আস্পর্ধা। আদালতে যাবে বলছে হরেন,

অনেক বলেকয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে থামিয়েছি। গ্রামসভাতে বলেছি, বিচার চা। গণ-দেবতার রায় নিতে বলেছি। বলুন, এটা ঠিক কাজ করেছি কি না।

খুব ভাল কাজ।

আপনি থাকবেন।

জ্যাঠামশাই উঠে গিয়ে ওষুধের বাক্সটা আলমারিতে তুলে রাখলেন বারান্দায় একখানাই চেয়ার। জ্যাঠামশাই উঠে চিন্তাহরণকে বসতে দিয়েছিলেন, কিন্তু চিন্তাহরণ বসেনি। তক্তপোশে বসেছে। তক্তপোশে দিবুর বিছানা নেই বলে খালি। হরেন, সুখো দাঁড়িয়ে।

জ্যাঠামশাই বললেন, আমি গিয়ে কি করব।

একটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে আসার দরকার।

জ্যাঠামশাই হাসলেন। কোনো কথা বললেন না।

চিন্তাহরণ বলল, আপনি না গেলে জোর পাব কোথায়। যেন চিন্তাহরণ কত নির্ভরশীল রায়মশায়ের ওপর।

রায়মশাই বললেন, চেষ্টা করব যাবার।

চিন্তাহরণের চোখ মুহূর্তে গোলাকার হয়ে গেছিল, যেন মাথা থাবড়ে থুবড়ে আবার তাকে ঠিক করা। বেসামাল হলে সব যাবে। কাজটা গুছিয়ে নিতে হয় কি করে সে জানে।

চা এল এ সময়। চিন্তাহরণ বলল, আবার চা :

খান, আর তো কিছু দেবার নেই। রেকাবীতে দুটো করে নারকেলের সন্দেশ।

রায়মশাই বললেন, ললিত শুনেছি বিয়ে করে ফিরবে। দুলির ইচ্ছে না থাকলে এটা হয় কি করে ?

ফুসলে-ফাঁসলে নিয়ে গেছে। বুঝলেন না।

রায়মশাই গম্ভীর হয়ে গেলেন। চিন্তাহরণ কিছুটা যেন প্রমাদ গুণল। আসলে ভেতর থেকে সেও খুব জোর পাচ্ছে না। তবে

এটা যে নিন্দনীয় কাজ, সেটা আবাসের লোকদের বোঝান দরকার। ললিতকে ঘেরিছাড়া করতে না পারলে সব উচ্ছন্নে যাবে।

চিন্তাহরণ বলল, দেখেন সবার ঘরে মা-বোন আছে। ছেলেপুলে বড় হচ্ছে। সাপ কার ঘরের গর্তে মাথা বের করবে বলা যায় না। একজন কুমারী মেয়ের এটা সর্বনাশ বলতে পারেন।

রায়মশাই উঠে পড়লেন। শুনেছি তুলি নাবালিকা নয়। তুলি যদি বিয়েতে রাজি থাকে আপনারা কিছু করতে পারেন না।

এবারে চিন্তাহরণের চেহারা বের হয়ে পড়ল। বলল, আপনার ভাইপোটি তো শুনেছি দোকান পাহারা দিচ্ছে।

ও একা নয়। রতন চরণ সঙ্গে আছে।

কাজটা কি ভাল হচ্ছে? ললিতকে আস্কারা দেওয়া হচ্ছে না।

আমি স্নানে যাব। আর কোনো কথা আছে!

চিন্তাহরণ অপমানিত হয়েই বের হয়ে গেল। রাস্তায় নেমে বলল, পুরিয়া দিয়ে লোক বশ করার তালে আছে। এক এক করে সব ভাঙব। আগে ঘুঘুর বাসাটি ভাঙি তারপর রঘুর বাসায় হাত দেওয়া যাবে। চিন্তাহরণ কোন অন্যায়কেই প্রশ্রয় দেয় না। একেও দেবে না। আসলে সে যা করবে মনস্থ করেছে, করবেই।

রাস্তায় চিন্তাহরণ বিশেষ আর গজগজ করল না। যাবার পথে জমিগুলি একবার দেখে গেল। বাড়িতে ঢুকে যাবার সময় শুধু বলল, এ কাজ রায়মশায়ের। দেখলি তো কি ভাবে কথা বলল। ওঁর সায় না থাকলে ললিত সাহস পেত না।

সাপে-কাটা বনমালীকে নিয়ে যে রগড় করবে বলে চিন্তাহরণ ভেবেছিল, তাও ভেস্তে দিয়েছিল ললিত। ললিত এত সাহস পায় কি করে! আসলে ললিতকে রায়মশায়ই নাচাচ্ছে। পার্বতীর গোপন প্রেম ভালবাসা আছে ওর ভাইপোটির সঙ্গে, সেটা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় এক ধরনের সান্ত্বনা আছে মনে। তোমরা যে ধোওয়া তুলসীপাতা নও লোকে বুঝুক। গরীব মেয়েটারে নিয়ে খেলান হচ্ছে।

অবশ্য বিষয়টার মধ্যে কিন্তু রয়ে গেছে। দিবু বাবাজীবন যদি তার কন্যার পাণিপ্রার্থী হয়—কি ভাবে সেটা করা যায়, কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছে না। দু' বাড়িতে মেলামেশা থাকলে সুবিধা। সেটিই নেই। নেই বলেই দম্ভ মনে হয় সব। এত দম্ভ কিসের। দম্ভ চূর্ণ করতে পারার মধ্যে এক ধরনের বীরত্ব থাকে। এখন চিন্তাহরণ তাই নিয়ে ভাবছে। বিকালেই দেখা গেল সামিয়ানা টাঙান হয়েছে। লোকজন আসতে শুরু করেছে। আসলে এই নিরিবিলি জীবনে উত্তেজনার বড় অভাব। পার্বতীর ভয় হওয়াটা একটা উত্তেজনার খোরাক যুগিয়েছে। এর আগে সাপে কাটা বনমালী। আজ গ্রামসভা। একে একে সবাই আসতে শুরু করেছে। চিন্তাহরণ আসেনি। সবাই এলে তাকে ডাকা হবে।

চিন্তাহরণ এলে সভার কাজ শুরু হল। হরেন দাঁড়িয়ে তার অভিযোগ সবাইকে পড়ে শোনাল।

চঞ্চল দেখাল ভিড়টাকে। অভিযোগটির খসড়া চিন্তাহরণই করে দিয়েছে।

চিন্তাহরণ ঠাণ্ডা গলায় বলল, আমি কাউকে ছোট করতে চাই না। তবু তোমরা মনে রাখবে আমাদের পাপের বোঝা ভারি না হলে দেশছাড়া হতাম না। ললিত জাত কুল মানে না। ছোট-বড় মানে না। আজ হরেনের হয়েছে, কাল তোমার ঘরে হবে। বেচারা গরীব বলে ওর হয়ে দেখছি কথা বলবারও কেউ নেই।

গরীব কথাটা অনেককে সুড়সুড়ি দিল। ভেতর থেকে কে বলে উঠল, ওর দোকান পুড়িয়ে দাও।

চিন্তাহরণ বলল, না না, এতটা উগ্র হওয়া ভাল না। বরং বলা ভাল, হরেনের মেয়ে হরেনকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। নাবালিকা আছে। সাবালিকা হলে সে যা ভাল বুঝবে করবে। তারপর কালীপদকে ডেকে বলল, একটুতেই তোদের মাথা গরম হয়ে যায়। দোকান পুড়িয়ে দেওয়া কি ভাল। কত কষ্ট করে দোকানটা

ললিত দাঁড় করিয়েছে। তুই তো বলে খালাস, দোকান পুড়িয়ে দাও।

কালীপদ কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল চিন্তাহরণের কথায়। এমন ত কথা ছিল না। চিন্তাহরণের পরামর্শমতো কাজ করে সে বেকুব। অথচ বলতেও পারছে না, কি বলতে হবে না হবে শালো শুয়োরের বাচ্চা তুমিই তো ডেকে শিখিয়ে দিয়েছিলে। বলেছিলে জিগির দিবি, পুড়িয়ে দাও। সে একাই বলেনি, সুখো, বগলাও তার দেখা-দেখি বলেছে। মরণ হ'ল গে শেষ পর্যন্ত তার। কি সাধু প্রকৃতির মানুষ সেজে এখন তাকে সবার সামনে ধমকাচ্ছে! একবার মুখ ফসকে বেরও হয়ে গেছিল, কর্তা এ তো আপনার শেখানো বুলি, আমার কি দরকার বলার দোকান পুড়িয়ে দাও। কিন্তু বলতে পারল না। দুই মেয়ের নামে ক্যাশডোল, তার নামে বিজিনেস লোন— এতগুলি কাঁচা টাকা হাতছাড়া করবে কোন সাহসে। মুখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকল শুধু।

তারপর গণ-দেবতার রায়ে ঠিক হল, ললিত এলে আবার গ্রাম-সভা বসবে। নাবালিকা অপহরণের দায় থেকে তার মুক্তি নিশ্চয়ই মিলবে—কারণ মানুষ মাত্রেই ভুল করে—দুর্মতি হয়েছিল তার, সেটা অপনোদনের নিমিত্ত গ্রামসভা স্থির করিয়াছে, বালিকা কন্যা তার পিতার সহিত বসবাস করিবে। কিছুটা সাধু ভাষায় লেখা হল, কিছুটা চলতি ভাষায়। বাবা মা'র মন মানে! ঘরের মেয়ে অপহরণ হলে ইজ্জতের প্রশ্নও থাকে! সে বাবদে জরিমানা একখানা গরু। হরেনকে একখানা গরু ক্রয় করিয়া দিতে হবে।

চিন্তাহরণ এখন সভার লোকজন দেখছে। নানারকম লোকের বাস। সেই খবর দিয়ে প্রায় সবাইকে আনিয়েছে। তবে তাকে যারা দেশে থাকতে চেনে—তারা কেউ যে আসবে না সে জানত। ক্যাম্পে থাকাকালীন অনেকের সঙ্গে পরিচয়। সে তাদেরই চিঠি দিয়ে আনিয়েছে। কিন্তু এখন দেখছে, দিন যত যাচ্ছে, কিছু লোক সাতে-

পাঁচে থাকতে চায় না। তারা আসে না। কিছু লোক দম্ভ নিয়ে বাস করে—তারাও আসে না। রায় মশাই, খাসনবিশ সে দলের। তবে খাসনবিশ মশায়ের মেয়েটি আগুন হয়ে উঠছে। কোথায় আসামে আগের পক্ষের বড় ছেলের কাছে ছিল। বড় ছেলে রেলে কাজ করে। আবাসে ঘর-বাড়ি বানিয়ে মেয়েকে নিয়ে এসেছে। শহরে বড় হলে সৌখীনতা বাড়ে। পায়ে জুতো পরে বাড়িতেই হাঁটাহাঁটির অভ্যাস। লম্বা ফ্রক এবং ববকাটা রেশমী চুল। মেজ ছেলেটির সঙ্গে মানাত ভাল। খাসনবিশ বোঝে না, দিনকাল যা আসছে, ঐ মেয়ে অপহরণ না হয়ে যায়। মেয়েদের তো আর চিনতে বাকি নেই—কত করে বুঝিয়েছি তোরই সব। এত যে ররররা দেখছিস সব তোর। একেবারে তখন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। গভীর জলের মাছ হয়ে গিয়ে এখন সাঁতার কাটছিস লজ্জা করে না! বুড়ো বাপটা আমার কাছে পড়ে থাকে লজ্জা করে না! তোর ন্যালাক্ষ্যাপা মাকে খাওয়াই লজ্জা করে না! তবে তোর মা আছে বলে রক্ষে। তোকে খেলিয়ে না তোলা পর্যন্ত ওতেই চালিয়ে নিতে হবে। চিন্তাহরণ চাদরখানা কাঁধে ফেলে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে ঘেরির পাড়ে উঠে গেল। পেছনে সুখো, যতীন, বগলা, কালীপদ।

এই যখন নতুন আবাসের অবস্থা তখন কপিল একবোঝা ঘাস নিয়ে বাড়ি ঢুকছে। মন-মেজাজ ভাল না। পটল নিড়ানিখান বগলে নিয়ে বাপের পিছু পিছু আসছে। ঘাস জলে ধুয়ে আনা হয়েছে। বাঁধা গরুটা সেই দেখে গলা লম্বা করে জিভ বার করে ঘাস খাবার চেষ্টা করছে। পার্বতী বাঁশে হেলান দিয়ে বসেছিল। সে উঠে গেল। ঘাস জাবনায় দিয়ে গরুটাকে বেঁধে দিল কাফিলা গাছের গুঁড়িতে। আগে খোঁটা ছিল, এখন তাই ডালপালা গজিয়ে গাছ হয়ে গেছে। জিয়ল গাছের এই নমুনা, মাটি জল বাতাস পেলেই হল। নিজ

থেকেই সে লেগে যায়, হাওয়ায় বড় হয়। ডালপালা মেলে দেয়। বছরে একবার ডালপালা ছেঁটে দিলে গাছ আরও বাড়ে।

পার্বতীর সঙ্গে কপিলের কথা কমে গেছে। দু'জনের মধ্যে এখন দুস্তর ব্যবধান। কে বলবে কপিল এই মা-মরা মেয়ে আর ছেলের হাত ধরে ইজ্জত রক্ষার্থে উদ্বাস্তু হয়েছিল একদিন। এখন মেয়ের গায়ে দেবী মহিমা লেগেছে। সবাই কেমন আলাদা চোখে দেখে। আগের মতো বাড়ি ঢুকে বলতে পারে না—পার্বতী মা আমার গরু-টাকে কেন জল দে! খড়গুলো তুলে রাখ। রাতে সেদ্ধ ভাত করিস। ওতেই হয়ে যাবে। ক'খানা কাঁঠাল বীচি সিদ্ধ দিস। ওতেই হয়ে যাবে। ধূপ-ধুনো দে।

কপিল জানে তার কন্যা বড় শান্ত নিরীহ। বড় বড় চোখে যখন চেয়ে থাকে তখন কেমন অবলা জীব মনে হয়। এমনটা অবশ্য আগে ছিল না। আগে লাফিয়ে বেড়াত। হাট থেকে কামরাঙা কিনে আনলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে নুন দিয়ে খেত। উষা সইয়ের সঙ্গে কড়ি খেলত বসে, কিংবা বাঘবন্দী। কখনও দেখেছে হিজলের উষর মাঠে দুই সখীতে ছুটছে। জল আনছে কাঁখে করে। ঘেরির জলে সাঁতার কাটত। বৃষ্টি পড়লে ঘেরির পাড় ধরে ছুটত। কখনও নিমগ্ন হয়ে খুঁটে আনত কোঁচড়ে জল-শাক। সব কিছুতেই তখন পার্বতীর বড় বিস্ময়। সব কিছুতেই চিৎকার, ও বাবা বাবা রে, গ্যাখ আকাশে কি তুমুল কাণ্ড। মেঘ জমে কালো। হাট থেকে ফিরে এলে আনাজপাতি মাছ দেখে উচ্ছল হয়ে উঠত। এই সেদিনও এটা ছিল। দিবু আসার পর ঘেরিতে পার্বতীর যে কি হল আর দৌড়ায় না! লাফায় না। বাঘবন্দী খেলার জন্য ছুটে যায় না। কত সহজে কত চাঞ্চল্য থেকে মুক্ত হয়ে গেল। পার্বতী মাথা নুয়ে হাঁটে। কারো দিকে যেন আর ভাল করে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। কুয়ো থেকে জল আনতে গেলে একখান শুকনো গামছা গায়ে জড়িয়ে নেয়। ভিতরে এক গোপন মহিমায় ডুবে গেলে যা হয়ে থাকে আর কি। বাড়ির বারই

হয় না। তারপর বনমালীকে সাপে কাটায় কী যে হল, কে জানে, কেমন বেয়াড়া হয়ে গেল ক' দণ্ডের জন্য। অন্ধকারে তাকে দেখতে গিয়ে কি যে কু-বাতাসে পড়ে গেল। না' হলে তার এমন লাজুক মেয়েটা উলঙ্গ হয়ে থানের দিকে হেঁটে যেতে পারে! কি যে ঘোরে পড়ে গেল! থানে গিয়ে চিৎপাত হয়ে পড়তেই, বাদ্য বাজাও, শাঁখ বাজাও, সব দেবী মহিমা! যতীন তাই নিয়ে কি হুলস্থুলটাই বাঁধিয়ে দিল।

জিয়ল গাছের খোঁটার মতো পার্বতীর যখন মাটিতে লেগে যাবার কথা, যখন বড় বড় চোখে সব কিছু দেখার কথা, গোপনে কাউকে খোঁজার কথা, তখনই কি না দেবী এসে তার ওপর ভর করল! দেবী না অন্য কিছু! ওঝা ডাকতে পারে—কিন্তু সব মানুষ যে ক্রমে দেবী মহিমা টের পাচ্ছে। ধরে একদিন পেটাতে ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু সত্যি যদি তেনার দয়া হয়। মা মনসার কোপে পড়ে কে যেতে চায়! পটল আছে তার। পটলের যদি কিছু হয়! আর কখনও মনে হয়, ঘেরির সবাই মিলে তার মেয়েটাকে বাড়ির বার করে দিতে চাইছে। বিপদে আপদে তার ভরসা ছিল দিবুরা, তারাও কেমন এই ভর হবার দিন থেকে আলগা হয়ে গেল। তার বড় একটা সংকোচ ছিল পার্বতী যুবতী হয়ে উঠছে, বিয়ের কিছু করতে পারছে না, তাই বলে বনমালীকে নিয়ে যে কথা উঠেছিল, সেটাই বা রাখে কি করে! চাল নেই, চুলো নেই, স্বভাব-চরিত্র ভাল না—তার সঙ্গে মেয়েটার কপাল জুড়ে দেয় কি করে! অথবা হাওয়ায় কথা ভাসে, পার্বতীর নাকি দিবুকে মনে ধরেছিল। মনে ধরলে হয় না। দেখতে, হয় নাগাল পাওয়া যায় কি না। তোর বাপ বেঁটেখাটো মানুষ অত লম্বা কোটা পাবে কোথায়!

রাগ দুঃখ ক্ষোভ জ্বালা অভিমান সব এখন কপিলের বুকে ভর করে আছে। বাপ-বেটিতে কেমন সম্পর্কহীন। পার্বতী ওদের ফিরতে দেখেই উনুন ধরিয়েছে। চা করে পটলের হাতে পাঠিয়ে দিয়েছে।

সঙ্গে এক-ডালা মুড়ি। পটল এসে দাঁড়িয়ে থাকলে পার্বতী ভাইটির দিকে একবার তাকায়। কেমন তখন চোখ জলে ভার হয়ে আসে। পটল বোঝে দিদি তাকে বাবার জন্য চা মুড়ি নিয়ে যেতে বলছে। বাপ বারান্দায় বসে আছে বেড়াতে হেলান দিয়ে—যেন তার ক্ষুধা তেষ্টা কিছু নেই। দিলে খাবে, না দিলে খাবে না। কোন খোঁজখবর নেবার যেন বাপের আর দরকার হয় না। সে আবার দৌড়ে যায়। দিদি তারটা বেড়ে দেয়। আল্লার তাকায়। কিছু বলে না দিদি। পটল বোঝে, বাটিটায় মুড়ি তার। দিদি খেল, কি খেল না কেউ খোঁজখবর নেয় না। যতীন ওঝা এলে বাড়িটা আরও হিম মেরে যায়। দিদির যে কি হয়! কোন ভ্রূক্ষেপ নেই যেন তাকে নিয়ে কিংবা তার বাবাকে নিয়ে। পটল আর আগের মতো দিদির কাছে দৌড়েও যায় না! তেল মাখিয়ে দে বলে না। খেতে দে বলে না। সে নিজেই তেল মাখে। নিজেই স্নান করে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। দিদি বেড়ে দিলে খায়। না দিলে মাচানে চুপচাপ শুয়ে থাকে।

যতীন ওঝা এলে দিদি অপেক্ষা করে থাকে, ওঝা কি বলে। থানে লোকজন কেমন আসছে। মানসিক কত পড়ছে। ভর ওঠার সময় দিদি যাকে যা বলেছে, তার কতটা ঠিক। ঠিক না হলে দিদি কেমন আরও ক্ষেপে যায়। কার প্রতি তার এই আক্রোশ পটল কিছুতেই ধরতে পারে না। পার্বতী অবশ্য জানে না, কিংবা মনে করতে পারে না সে কি বলে। কেমন ঘোর লেগে যায়। থানে সে যখন যায়, স্নান সেরে যায়। একখানা লাল পেড়ে শাড়ি পরে। চুল খোলা থাকে। যাবার সময় সে মাটির দিকে তাকিয়ে যায়। সে বুঝতে পারে, সব আবাসের লোক তাকে কৌতূহল নিয়ে দেখে। দিবুদাদের বাড়ি পার হয়ে যাবার সময় তার অভ্যাস ছিল, সে নাইতে গেলে, কিংবা জল আনতে গেলে, যখনই হোক না অভ্যাস ছিল একবার চোখ তুলে কাউকে খোঁজা। কাউকে দেখা। এখন আর তাও হয় না। থানে গেলেই সবাই সরে দাঁড়ায়। তাকে পথ করে দেয়।

তামার টাটে চরণামৃত থাকে। যতীন তাকে সেটা খেতে দেয়। ওটা খেলেই তার ঘোর লেগে আসতে শুরু করে। ঝিম মেরে পড়ে থাকে। সব কিছু দুরাতীত মনে হয়। অর্থহীন মনে হয় এবং এক সময় সে সংজ্ঞা হারাবার আগে ধূপ-ধুনোর গন্ধে টের পায়, কেউ তার হয়ে প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে। হাসছে, কিংবা অভিশাপ দিচ্ছে। তটস্থ সবাই—সে তখন নিজের মধ্যে থাকে না।

যতীন যখন নিয়ে আসে, তখন করজোড়ে নিয়ে আসে। যখন দিয়ে আসে তখন করজোড়ে দিয়ে আসে। ভরের দিন পার্বতী বুঝতে পারে, ভর শেষে তার হাঁটার ক্ষমতা থাকে না। বাবা পটল লণ্ঠন নিয়ে সড়কের ধারে বসে থাকে। আসলে সে এ-সবের মধ্যে কি যেন এক প্রতিহিংসা খুঁজে পায়। প্রতিহিংসা না দিবুদাকে ভড়কে দেবার জন্য, না সেই জ্যোতির্ময় আলো এবং দেবী মহিমা রাতের গভীর নিশীথে তাকে যে বরাভয়ের কথা বলে গেছিল তাই তাকে এতটা উন্মাদ করে তুলেছে। মনে হয়েছিল, যেন মা মনসা এক ঝলসানো আলোর গভীরে দাঁড়িয়ে তার মাথায় হাত রাখছে। দিব্যলোক থেকে দেবী নেমে এসে, তার মাথায় হাত রেখে বলেছে, তোর দিবুদার কোনো ভয় নেই। পটলের ভয় নেই। বাপের ভয় নেই। আমি তুষ্ট থাকব। তুই আমার সেবা কর। আমার মহিমা প্রচার কর। মহিমা প্রচারে বিঘ্ন ঘটলে দিবু পটল কারো নিস্তার নেই আমার কোপ থেকে। এই জলা জায়গায়, খড়ের বনে অজস্র কীট-পতঙ্গের মতো তেনারা ঘুরে বেড়ায়। আমার মহিমা প্রচার করলে তারা তুষ্ট থাকে। বনমালী গেছে, আর কে যায় ছাখ। আর কারে কালে খায় ছাখ। তুষ্ট না করলে তোর সব যাবে।

পার্বতী উনুনে শুকনো খড়কুটো ঠেলে দিচ্ছিল। আগুনে তার মুখ জ্বলজ্বল করছে। দেখলে মনে হয় কেমন সে এক পরিত্যক্ত রমণী। হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে আগুনটার দিকে তাকিয়ে আছে। নিরাসক্ত চোখেমুখে।

কপিল অসহায় মানুষের মতো তেমনি বেড়াতে হেলান দিয়ে বসে আছে। পটল ঘরের মেঝেতে বস্তা পেতে লণ্ঠনের আলোয় পড়ছে। ঠিক পড়ছে না কারণ দিদির ভর হওয়ার পর থেকেই তাকে সব সময় সতর্ক থাকতে হয় দিদিটা যেন কোনদিকে না আবার চলে যায়। ঘেরির তলানিতে ছুটে গিয়ে কখন না আবার ডুবের পর ডুব দিতে থাকে। একবার জলে নামলে আর উঠতে চায় না। প্রথম প্রথম সে কি অসহায় অবস্থা। হঠাৎ হঠাৎ উধাও। কোথায় গেল, কোথায় গেল! খোঁজ খোঁজ। তালবনের অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে। কোথায় গেল, কোথায় গেল, খোঁজ খোঁজ, কেউ বলতে পারে না। দেখা গেল খড়ের বনে গিয়ে চুপ-চাপ বসে আছে। দেবী মহিমায় পড়ে গেলে যতীন বুঝিয়েছে এমনই হবার কথা। যতীন ওঝা তখন বাপের সঙ্গে সব সময় থাকত। বাপ মাঠে গেলে যতীন ওঝা দখিনের ঘরে শুয়ে থাকে। দেবী না আবার পালায়।

পটল আসলে পড়ছে না। সে বসে পড়ার ভান করছে। সে জানে লণ্ঠন জ্বেলে পড়তে বসলে বাপ খুশি থাকে দিদি খুশি থাকে। আজকাল সে খুব বাধ্য হয়ে গেছে। এমনিতেই সারা বাড়িটায় কেমন হিম কুয়াশায় ঢেকে আছে, তার ওপর সে বাধ্য না থাকলে, বাপও হয় তো যেদিকে দু চোখ যায় চলে যাবে। মা নেই, দিদিটা কেমন হয়ে গেল, তার ওপর বাপ যদি ঘর ছেড়ে চলে যায়, তবে সে কার কাছে থাকবে, বাবাকে খুশি করার জন্য সে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ দুই মাসকে গ্রীষ্মকাল বলে—জোরে জোরে পড়ছে। আষাঢ় শ্রাবণ দুই মাসকে বর্ষাকাল বলে। সে ছয় ঋতুর নাম মুখস্থ করছে।

গরুটা তখন গোয়ালে হাম্বা করে ডাকল।

পটল পড়া বন্ধ করে শুনল, গরুটা ডাকে।

বাবা গোয়ালঘরের দিকে উঠে যাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি আলোটা হাতে নিয়ে বাবার পেছনে পেছনে গেল। গিয়ে দেখল, বাছুরটা দড়িতে প্যাঁচ খেয়ে পড়ে আছে। কেমন গলায় আটকে গেছে ফাঁস।

বাবা এবং সে তাড়াতাড়ি দড়ি খুলে দিতেই দেখল দিদিও এসে দাঁড়িয়েছে। পটল বলল, হরিণার চোখ দুটো জানিস দিদি কেমন হয়ে গেছিল। আর তখনই মনে হল টর্চ মেরে কেউ ঢুকছে।

কে?

- আমি দিবু কপিলকাকা।

পার্বতী বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

পটল কি করবে বুঝতে পারছে না। দিবুদা তাদের বাড়ি এসেছে ভাবতেই গর্বে বুক ভরে গেল।

কপিলের অস্বস্তি, কোনো কি আরও খারাপ দুঃসংবাদ আছে তার! যে ছেলেটাকে সে স্নেহ করে, কথাবার্তা ভারি সুন্দর এবং আবাসের সবার কাছে যার সুনাম শুনতে পায় এবং যে শহরে চলে যাবে পড়তে আর যাকে নিয়ে পার্বতীর গোপন ভাব-ভালবাসা আছে বলে কুৎসা রটে, সে নিজে থেকে যেচে এলে অস্বস্তিতে পড়ে যাবারই কথা।

কপিল লণ্ঠনটা তুলে ধরল উঠোনে নেমে। লণ্ঠনের আলোয় সহসা দিবু হকচকিয়ে গেল। আলোটা চোখে কেমন লাগছে। তাকে যেন অনাবৃত করে দিচ্ছে। তুমিও সুখে নেই। সারাটা দিন তোমার মাথার মধ্যে পোকায় ঘিলু কেটেছে। থাকতে না পেরে একা একা গোপনে চলে এসেছ।

কপিল দিবুকে কি বলবে ঠিক বুঝতে পারছে না। বসতে বলবে, না পার্বতীকে ডেকে বলবে, তোর দিবুদা এসেছে, বসতে দে—ঠিক বুঝতে পারছে না। মেয়ের সঙ্গে তার কথা বন্ধ হয়ে গেছে দিবুরা জানবে কি করে! পার্বতীও গোয়ালঘরে কেমন একঠায় দাঁড়িয়ে আছে। কি যেন তার ভয়। সামনে যাবার সাহস নেই। কেমন নিথর হয়ে যাচ্ছে তার সারা শরীর। সে অন্ধকার থেকেই দেখছে চুরি করে। দিবুদাকে দেখে মাথাটাও কেমন সাফ হয়ে গেছে। ভেতরের ঘোর ঘোর ভাবটা কেটে যাচ্ছে। সে যেন আগের পার্বতী হয়ে

যাচ্ছিল। এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা থেকে পটলই তাদের বাঁচাল। সে লাফিয়ে এসে দাঁড়াল সামনে। হাত ধরে বলল, এস না দিবুদা। বসবে। বলে সে হাত ধরে বারান্দার দিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকল।

দিবু নিজেও কি ভাবে কথা শুরু করবে বুঝতে পারছে না। তার সঙ্গে পার্বতীর নাম মিশে গিয়ে কেমন তাকে কিছুটা অসহায় অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। ললিতদা সঙ্গে থাকলে কত ভাল হত। ললিতদার ফেরার কথা পরশু। কিন্তু ততদিন সে মাথায় এই পোকা নিয়ে থাকবে কি করে! ঘুমাতে পারবে না। ছটফট করবে। কপিলকাকাকে বলা দরকার। এখনও রশি আলগা হয়ে যায়নি, নেশায় পেয়ে বসলে পার্বতীকে আর রক্ষা করা যাবে না। এত সব ভাবার পরও কথাটা সে আরম্ভ করবে কি করে বুঝতে পারছে না। আগের সম্পর্ক থাকলে তবু যা হোক সে সহজভাবে কথা বলতে পারত। জ্যাঠামশাই যে তাকে শহরে পাঠিয়ে দিচ্ছে সে নানাদিক চিন্তা করে। নানা দিকের মধ্যে এ পরিবারটিও আছে। পার্বতীর কথা ভেবেই হয়ত জ্যাঠামশাই তাকে এখান থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। ললিতদার দোকানে শুতে যাবার পথে কথাটা বলে যাবে ভেবেছিল। সারাদিন চেষ্টা করেও এদের বাড়ি আসতে পারেনি। জ্যাঠামশাই যেখানেই থাকুন দিবুর মতিগতি টের পান, তাছাড়া লোকজনও রাস্তায় চলাচল করে। দেখে ফেলতে পারে। সবাই ভাববে, দিবু নিজেও কম না! গোপনে পার্বতীদের বাড়ি উঠে যাবার মতলবে থাকে। দিবু এতসব ভেবেছে সারাদিন। এই সময় যখন রাস্তায় কেউ নেই ভেবে সে রতনকাকাকে এগিয়ে যেতে বলে এখানটায় গোপনে চলে এসেছে।

দিবু বলল, পার্বতীকে দেখছি না।

পটল লাফিয়ে উঠানে নেমে গেল, ও দিদি তোকে ডাকছে।

পার্বতী নড়তে পারছে না। পার্বতী অন্ধকারে দাঁড়িয়ে।

পটল দিদিকে ডাকছে, আয়না দিদি।

দিবু বলল, ও গোয়ালে দাঁড়িয়ে আছে কেন।

জান দিবুদা আমাদের হরিণাটা মরে যেত। গলায় ফাঁস লেগে গেছিল।

দিবুর মনে হল ফাঁসটা এখন পার্বতীর গলায় ঝুলছে। সে বলল, ঠিক আছে ওকে টেনে আনতে হবে না।

মেয়েটা সব সময় ভীতু স্বভাবের। তার এজন্য টান বেড়ে যায়।

কপিল বলল, তুই শহরে চলে যাচ্ছিস শোনলাম।

তাই কথা হচ্ছে।

সেই ভাল। এখানে থাকলে সব যাবে।

দিবু খেই হারিয়ে ফেলছিল আবার পেয়ে গিয়ে বলল, তুমি কাকা পার্বতীকে থানে যেতে দিও না।

পার্বতীকে এ সময় সে দেখল ছায়ার মতো সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

কপিল নিরুত্তর।

দিবু ফের বলল, যতীন ওঝা লোক ভাল না।

পার্বতী কেমন রুখে উঠল, কে ভাল শুনি!

পার্বতীকে দিবু এমনভাবে কখনও দেখিনি। যে পার্বতী তার সঙ্গে কথা বলতে পারত না, লজ্জায় সংকোচে মাথা নিচু করে রাখত—তার এই রুখে ওঠা দিবুর মধ্যে কেমন এক প্রবল প্রতিপক্ষ তৈরি করে দিল। বলল, আমি বলছি ভাল না। তুমি যাবে না।

একশোবার যাব। ঠাকুর দেবতা নিয়ে তামাশা!

দিবু বুঝল পার্বতীর যে লজ্জা ছিল, সেদিন সেই উলঙ্গ নারী মহিমা দর্শন করিয়ে তা থেকে বুঝি মুক্তি পেয়েছে পার্বতী। এ পার্বতীকে সে সত্যি চেনে না। পটল এবং কপিলকাকা দুজনেই কেমন হতবাক হয়ে গেছে পার্বতীর দিবুর প্রতি এই আচরণে।

পটল দিদিকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলছে এই দিদি, তুই কি রে। তুই কেমন হয়ে যাস ভর উঠলে। বাবা কেমন চুপচাপ বসে থাকে ঘেরির পাড়ে তুই বুঝিস না! আমার ভয় করে।

হ্যাঁ বুঝি। ছাড় পটল, ওর কথা শুনলে মা মনসার কোপ বাড়বে।

দিবু ক্ষেপে গিয়ে বলল, ওসব কোপ দেখা আছে। শোনো পার্বতী তুমি যদি যাও ভাল হবে না। ওঝা তোমাকে আফিংয়ের জল খাওয়ায়। কপিলকাকা আপনার জেনে রাখা ভাল, আফিংয়ের জল খাইয়ে ওঝা পার্বতীর ভর তোলে।

মিছে কথা। তুমি দিবুদা দেবীর নামে কুৎসা রটাচ্ছ।

পার্বতী তুমি বুঝতে চেষ্টা কর। ধান করে মানসিক পেয়ে লোকটার দুপয়সা আয় হচ্ছে। হোক। এতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু লোকটা তোমাকে নষ্ট করে দিচ্ছে।

আমি নষ্ট—এ কথা বলতে পারলে!

তুমি না পার্বতী! তোমার দেবী।

দেবী নষ্ট! দিবুদা ও কথা বলনা! দোহাই। পার্বতী ভয়ে কেমন সিটিয়ে যাচ্ছে। যেন হাজার লক্ষ মনসার বাহন বৃষ্টিপাতের মতো এখনই আকাশ থেকে ভেসে আসতে পারে। পার্বতী বলল, দিবুদা মা মনসাকে একথা বল না! বললে আমরা সবাই তার কোপে পড়ে যাব! তুমি আমি পটল বাবা—সবাই। বলেই হাউহাউ করে কাঁদতে থাকল। আমার তবে কেউ থাকবে না দিবুদা। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ঘরের মধ্যে দৌড়ে ঢুকে গেল পার্বতী।

দিবু বলল, মাথাটি গেছে।

কপিল তেমনি নিরুত্তর।

পটল জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে। সে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে চোখের জল সামলাচ্ছে। দিদিকে কাঁদতে দেখলে তার চোখে জল চলে আসে।

দিবু বলল, যাই।

কপিল কিছু বলল না।

যাই বলেও দিবু যেতে পারল না। পা যেন গেঁথে আছে মাটিতে। সে ফের কি ভেবে বলল, মন শান্ত হলে বুঝিয়ে বল। আফিংয়ের জল খেয়ে কি আড়ষ্ট হয়ে থাকে দেখে বোঝ না কপিল-

কাকা। হাঁটতে পর্যন্ত পারে না! তোমাকে ধরে নিয়ে আসতে হয়!

কপিল এবার কথা বলল। আমার কপাল। না'লে ও একা বনমালীকে অন্ধকারে দেখতে যাবে কেন? বাতাস লাগলে হয়। তুই কি দেখেছিলি বনমালীর শিয়রে দেবী স্বয়ং বসে আছেন।

বনমালীর শিয়রে মা মনসা বসে ছিল কিনা জানি না। তবে দূর থেকে দেখেছি একজন নারী শিয়রে বসে আছে। পার্বতী একা একটা মরা মানুষের শিয়রে বসে থাকতে পারে বিশ্বাস হয় না। পার্বতী কি বনমালীর শিয়রে বসেছিল! জিজ্ঞেস করে জেনে নিও না।

জিজ্ঞেস তো করি। কিছু বলে না। এখন তো আর কথাই হয় না। সব ভবিতব্যের ওপর ছেড়ে দিয়েছি। পার্বতীটা গেল! দুর্ভাবনা পটলটাকে নিয়ে।

'পার্বতীটা গেল' কথায় দিবুর ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। কী করে যে এই নাগপাশ থেকে পার্বতীর মুক্তি মিলবে।

দিবু কিছুক্ষণ ভারি আচ্ছন্ন ছিল। সে যে পার্বতীদের বাড়ি বসে আছে ভুলে গেছে। সে যে কপিলকাকাকে সতর্ক করে দিতে এসেছিল তাও ভুলে গেছে। পার্বতী উনুনের ধারে বসে। মুখে কোনো কথা নেই। পটল ঘরের মধ্যে বসে, কোনো কথা নেই। সামনে তার লণ্ঠনের আলো। বই খোলা।

তখনই কপিলকাকা সহসা কেমন ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। দিবুর সামনে কেমন ক্ষ্যাপা বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ল। বলল, তুই কার কাছে শুনলি? পার্বতীকে আফিংয়ের জল খাওয়ায় কার কাছে শুনলি?

চরণ বলল, ওর বাবাকে দিয়ে হবার নাকি আফিং আনিয়েছে।

যতীন নিজের জন্যও আনতে পারে।

সে তো নাকি চুপি চুপি বলেছে দেবীর ভোগে লাগে।

কপিলের মাথাটা ঘুরছিল। কে জানে এই করে মেয়েটাকে নেশায় ফেলে দিচ্ছে কি না! থানে সে যায় এর টানে তবে! স্নানটান সেরে

পার্বতী যায়। ওখানটায় ঝিম মেরে পড়ে থাকে। এইসব চোখের ওপর সে দেখেছে। নিষ্ঠুর প্রকৃতি আর তার অমোঘ আচরণে কপিল ত্রস্ত। সম্বল বলতে থান। সেই থানে যতীন মা মনসার নামে এমন হীন কাজে প্রবৃত্ত হবে! সে ভেবে উঠতে পারে না। থান মাহাত্ম্য এবং পার্বতীর দেবী মহিমার দৌলতে সে এ-বাড়িতে খুঁটি পুঁতে ফেলেছে। যখন খুশি আসে যায়। পড়ে থাকে। কেমন সে সহসা ব্যভিচারের গন্ধ পেল। আর তখনই দেখা গেল জ্যোৎস্নায় ঘেরির পাড় ধরে সে ছুটছে।

দিবু চিৎকার করে উঠল, কপিলকাকা কোথায় যাচ্ছ?

পার্বতী কেমন সংজ্ঞা ফিরে আসার মতো দৌড়ে এসে বলল, দিবুদা দ্যাখ বাবা কোথায় গেল!

পটল ছু-লাফে বের হয়ে বাপ কোথায় ছুটে যাচ্ছে শুনে সেও ঘেরির পাড় ধরে ছুটতে থাকল।

দিবু ওদের পেছনে কিছুটা ছুটে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে। টর্চটা ফেলে গেছে। সে উঠোনে উঠে বলল, পার্বতী বারান্দায় টর্চটা আছে। দাও।

পার্বতী বাইরে বের হয়ে টর্চটা হাতে দেবার সময় বলল, কোথায় গেল বাবা।

মনে হল থানে। পটল পেছন পেছন লণ্ঠন নিয়ে গেছে।

পটল যাওয়ায় পার্বতীর উদ্বেগ কমে গেল। সে জানে, পটলের সামনে বাবা কিছু একটা করে ফেলতে পারবে না। এখন যত দুর্যোগই আসুক একমাত্র পটলই পারে সেখান থেকে বাবাকে ফিরিয়ে আনতে। আর কারো সাধ্য নেই। সে বলল, দিবুদা বস। বাবা না আসা তক তুমি যেও না। আমার ভয় করে।

এই ভয় কথাটাতে দিবুর মধ্যে কেমন এক উৎক্ষেপণ শুরু হল। সে না বলে পারল না, তোমার ভয়! ভয় কিসের? তোমার মধ্যে দেবী মহিমা বিরাজ করছে, তোমার ভয় কিসের!

দিবুদা !

তুমি একা অন্ধকারে বনমালীর খোঁজে যেতে পার, তখন ভয় করে না ?

দিবুদা !

সত্যি করে বল, সেদিন সাপে-কাটা লাশ বনমালীর শিয়রে একা অন্ধকারে তুমি বসেছিলে কি না !

বসেছিলাম।

তা'লে সেই নারী তুমি ?

হ্যাঁ।

ভয় করল না ?

সাপে-কাটা রুগী মরে না। সে তো লখীন্দর বেহুলা। ঠিক জায়গামতো গেলে বিষ নামিয়ে দিতে পারে। বনমালীদাকে বলতে গেছিলাম, ভয় নেই, তোমার বাবা-কাকারা এসে নিয়ে যাবে। তখন ভাল হয়ে যাবে। অসুস্থ মানুষকে দেখতে গেলে দোষের ?

তুমি পাগল পার্বতী। পাগল। বনমালী মরে যখন লাশ—আর তুমি এমন অবুঝ ? সেখানে গেলে তাকে একা দেখতে ? সেই দূর মাঠে—একা, অন্ধকারে—আর আমি তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে কতদূর চলে গেছি ! অন্ধকারে কোথায় ঘেরি তাও টের পাচ্ছি না। পথ ভুল হলে কোথায় হারিয়ে যাব ভয়ে যখন দৌড়াচ্ছি, দেখি একটা ঢিবির মধ্যে হারিকেন আর সামনে বনমালীর লাশ। তাও সহ্য হত—কিন্তু দেখি এক নারী, তুমিই সেই, তুমি। তুমি !

পার্বতী বলল, হ্যাঁ দিবুদা আমি। পার্বতী দিবুর সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল।

কেন গেছিলে সেখানে মরতে ?

দিবুদা তোমাকে খুঁজতে গিয়ে লোকটাকে কালে খেয়েছে। আমিই তাকে তোমার খোঁজে পাঠিয়েছিলাম। থানে পড়ে থাকল বনমালীদা বেহুঁশ হয়ে। যেতে পারলাম না। বাবা লাঠি নিয়ে বসে

আছে, গেলেই মাথা ভেঙে দেবে। আমার জন্য লোকটাকে সাপে কাটল, তাকে একবার আমার দেখা উচিত না ? মা মনসার তবে কোপে পড়ে যাব না। তুমিই বল, না গেলে বাবা, পটল, তোমার— কারো রক্ষে আছে!

মানুষের সরল বিশ্বাস কোথায় শেষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে! দিবুর সমস্ত রাগ নিমেষে জল হয়ে গেল। সে বলল, পার্বতী তুমি বড় হয়েছ, টের পাও না ?

জ্যোৎস্নায় পার্বতীর যেন শীত করছিল।

পার্বতী তুমি ভাল হয়ে যাও। দেবী মহিমা থেকে তুমি মুক্ত হও। কপিলকাকা কেমন হয়ে গেছে ছাখ। তুমি তো কি সুন্দর ছিলে পার্বতী। কি চেহারা হয়েছে দেখেছ! তুমি আর আফিংয়ের জল খেও না।

দিবুদা, আমি সত্যি বলছি ও খাই না। গেলে থানের চরণামৃত নিতে হয় তাই নিই।

কোত্থেকে ?

তামার টাটে আলাদা করে ওঝা রেখে দেয়।

ওটা খেও না। দোহাই। আর যদি খাও তবে থান টান সব পুড়িয়ে দেব। ললিতদা ভীষণ ক্ষেপে রয়েছে।

পার্বতী যা করে না কখনও, এই প্রথম দেখল দিবু, পার্বতী হাত বাড়িয়ে তার মুখ চেপে ধরেছে, দিবুদা দোহাই ও-কথা বল না! দিবুদা ওনার কোপে তোমার আমার সব যাবে। দিবুদা—আ-আ।

দিবু দেখল ওর শরীরের ওপর পার্বতী ঢলে পড়েছে। সে তাড়াতাড়ি জড়িয়ে ধরতেই পার্বতী আবেগে মথিত হতে থাকল। কাঁপতে থাকল থিরথির করে। কি আশ্চর্য জগৎ, নিরন্তর সুখ এবং করতালি বাজে কোথাও—যেন সেই প্রান্তর, সবুজ কখনও, কখনও নীল কখনও সুমধুর। নক্ষত্র থেকে ফোঁটা ফোঁটা কুয়াশার জল গড়িয়ে পড়ছে।

ঘরের মধ্যে পার্বতীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে দিবু অনেকক্ষণ

অপলক দেখছিল। আর তখনই দপদপ করে লণ্ঠনের আলোটা নিভে গেল।

কপিলকাকার গলা পাওয়া যাচ্ছে' সব মিছে কথা। ওঝা বলল, সব মিছে কথা। যে বলে দেবীর অভিশাপে তার জিভ খসে পড়বে। যে বলে, দেবীর কোপে পড়ে যাবে। দেবীর নামে কুৎসা রটালে কেউ পার পাবে না। সব মিছে কথা। মিছে কথা।

কোনো এক মগ্ন চৈতন্য থেকে উত্থিত হলে যেমনটা হয়, দিবু তেমনি ঘর থেকে বের হয়ে উঠোন পর্যন্ত হেঁটে এল। কেমন কোলাহলের মতো মনে হচ্ছিল কপিলের কথাবার্তা। তার শরীর ঝিমঝিম করছে। পটল ছুটে এসে দিবুকে জড়িয়ে ধরে বলছে, দিবুদা জান ওঝা তোমাদের সবাইকে দেবীর নামে অভিশাপ দিচ্ছে। বলছে, তোমাদের জিভ খসে পড়বে! দেবী মহিমা যে টের পায় না তারই কপাল পোড়ে।

কপিল তখনও বলতে বলতে আসছে, আমার কি সৌভাগ্য, দেবী আমার বাড়িতেই বিরাজ করছেন। কোটি জন্মের সুকৃতির ফলে এটা হয়। তোমরা সবাই পার্বতীর নামে ওঝার নামে কুৎসা রটাচ্ছে। দেবী কাউকে ক্ষমা করবে না। পার্বতী পার্বতী। উঠোন থেকেই ডাকল। আলো কোথায়। বাতি জ্বলে না কেন! সব এত অন্ধকার করে রেখেছিস কেন। ওঠ। ওঠ। তুই মা সাক্ষাৎ জননী জগজ্জননী।

দিবু বলল, পার্বতী ঘরে। শুয়ে আছে।

সে তারপর পরম এক আচ্ছন্নতায় ডুবে যেতে থাকল। তার খেয়ালই নেই সে ঘেরিব্ব পাড় ধরে টর্চ না জ্বেলেই হেঁটে যাচ্ছে। এটা তার কি হল! কেমন এক দিগন্ত প্রসারিত মাঠ সামনে। সেই মাঠের পাড়ে সে একা দাঁড়িয়ে। সে সমুদ্রের কল্লোল শুনতে পেল। যেন লক্ষ লক্ষ তরঙ্গমালা সমুদ্রের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সে ডুবে আছে গভীর এক নীল জলরাশির অভ্যন্তরে। সে বলল, পার্বতী তুমি যদি এ-ভাবে আরোগ্য লাভ কর, যদি এই তোমার ইচ্ছে হয়,

তবে তাই হোক। তোমার আরোগ্যলাভে আমার সব নিমজ্জিত হোক, তবু আমি সরে দাঁড়াব না।

সে এসে দেখল রতনকাকা তার জন্য দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। তাকে দেখেই বলল, তোর এত দেরি!

দিবু বলল, আমি এখন ঘুমাব রতনকাকা। সে আর কোনো কথা বলল না। শুয়ে পড়ল। গভীর নিদ্রায় তারপর দিবু সত্যি এক পরম তৃপ্তির আস্বাদন পেল। পার্বতী নাকে নথ পরে দাঁড়িয়ে। কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা। মাথায় সিঁদুর। পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তার। সে দেখল, পার্বতী মুচকি হাসছে। লজ্জায় তার দু-গাল রক্তিম। আনত। নাগপাশ থেকে পার্বতী মুক্ত।

পরদিন যা খবর, তা আরও রোমাঞ্চকর। যতীন ওঝা চিৎকার করে বলে যাচ্ছে, দেবীর মতিভ্রম হয়েছে। দেবী থানে আসছেন না।

চিন্তাহরণ বলল, তোর মরণ হবে এবার। যতীন বলল, কেন? কেন?

তুই যে আফিংয়ের জল খাওয়াস সব জানাজানি হয়ে গেছে।

যতীন এই প্রথম টের পেল, তার সব যেতে বসেছে। তার হিসাব-নিকাশে ভুল বের হয়ে পড়েছে।

রায়মশাই যা লোক তোকে ঝুলিয়েও দিতে পারে।

পুলিশ, না না। এ্যা কি বলছেন!

পুলিশে দেবে না। শালো তুমি একজন কচি খুকিকে তোমার কব্জায় নিয়ে আসার জন্য ঘোট পাকিয়েছিলে। দিবু ললিত সব ভেস্তে দিচ্ছে।

যতীনের সেই রক্তাম্বর এবং গলায় রুদ্রাক্ষের মালার তেজ অতি তুচ্ছ মনে হবে ভাবতেই সে কেমন বেপরোয়া হয়ে গেল। বিহিত দরকার। চিন্তাহরণের পায়ের কাছে বসে পড়ল—কি হবে তবে কর্তা!

মাথা ঠাণ্ডা কর। ধৈর্য ধর। কি বলল পার্বতী?

বলল, থানে সে আসবে না। দু-দিন থেকে আসছে না।

কেন।

সে বলে কিনা দেবী মহিমা না ছাই। তোমরা আমাকে কি পেয়েছ!

কপিল কি বলে!

কপিলের যা স্বভাব, সে তেড়ে মারতে গেছে মেয়েকে!

দেবীর গায়ে হাত! তুই নিরস্ত করলি না।

করলাম। বললাম, মতিভ্রম হয়েছে। ওটা সেরে যাবে। বাড়িতে আজেবাজে লোক ঢুকতে দাও কেন?

আজেবাজে লোকটা কে?

দিব্যেন্দু। সে গেছিল পরশু রাতে। কি ফুসমন্তর কানে দিয়ে এসেছে কে জানে।

তোর সমূহ বিপদ দেখছি।

যতীনের গলা কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে। দুপুরবেলায় থানে ভিড় হয়। দেবী বসে থাকেন। পূজা আসে। মানসিক আসে। দেবীরই পাত্তা নেই। ঘরে বসে রান্না-বান্না করছে। পটলকে তেল মাখিয়ে দিয়েছে। খোঁজ করতেই জানাল, তার সময় নেই থানে যাবার। কপিল মাঠে ছিল। সে পর্যন্ত খবর পেয়ে ছুটে এসেছে। সে বলেছে, মা তুই তো আমার ঘরে জন্মসূত্রে। আর কি অধিকার আমার। সব মানুষ তোর দিকে তাকিয়ে। যা তুই ওঝার কথা শোন। তুই না গেলে মা-মনসার কোপে পড়ে যাব।

কপিল এত করে বলেছে!

কানে ভাল করে মন্ত্র ঢুকিয়ে দিয়েছি। বলেছি, দেখ যারা এ-সব বলছে সব অগ্নিদগ্ধ হবে। আগুনে পুড়ে মরবে। দেবীর রোষে আগুন জ্বলে উঠবে।

বলেছিস তুই?

কি করব কর্তা, আপনার আদেশ লঙ্ঘন করি কি করে!

শোন তবে, যখন বলেই ফেলেছিস, তখন তো তাকে সত্য করে তুলতে হবে। আজ কালই যা হয় কর। একাই তোকে কাজটা সারতে হবে। দেবীর কোপে কী হয়, একবার সবাইকে বুঝিয়ে দে। দিবুকে পুড়িয়ে মার। ললিতের দোকানে আগুন ধরিয়ে দে।

কিন্তু সাহসে কুলায় না কর্তা।

আমি ত' আছি ব্যাটা। ওঝাগিরি ফলাবি, তুকতাক করে বেড়াস—তখন ভয় হয় না। ভড়ং ত' কম না। রক্তাম্বর পরে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরে ক্ষ্যাপা প্রকৃতিকে কলা দেখাতে চাস, আর আগুন দেবার নামে ভয়। ললিতকে দেশছাড়া না করতে পারলে আমারও শান্তি নেই। তুই না করিস, হরেন আছে, কালীপদ আছে, যে কেউ করবে। তবে বলে দিচ্ছি তোর হ্যাপা তখন তুই সামলাবি। আমার কাছে এলে খড়ম পেটা করব।

যতীন অগত্যা কি করে। দুই প্রতিপক্ষের একপক্ষকে হাতে না রাখলে তার চলে না। চরণ রটিয়েছে খবর। সুতরাং দেবী মহিমায় চরণ গেছে। আগুনে তিন তিনটে প্রাণী যাবে। ভাবতেই কপালে ঘাম দেখা দিল।

তখন রায়মশাই ডেকে বললেন, তোর ললিতদা কবে ফিরবে, দিবু?

আজও তো এল না!

রায়মশাই দেখলেন, দিবু যেন কি লুকিয়ে যাচ্ছে। ডাকলেন, কাছে আয়।

কাছে গেলে ভাইপোটির চোখ আরও ভাল করে দেখলেন। বললেন, চোখ তোর ছলছল করছে কেন রে! দেখি হাতখানা।

হাতখানা দেখে বললেন, জ্বর আসবে। নাড়ি চঞ্চল। দুপুরে আজ ভাত খাবে না।

দিবু এ-জন্য সকাল থেকে জ্যাঠামশায়ের কাছে যায় নি। সবসময়

সে তার জ্যাঠামশাইকে এড়িয়ে গেছে। দেখলেই টের পাবে। গা ম্যাজম্যাজ করছে সকাল থেকে। শরীরে ব্যথা। রোগের আঁচ পেলেই জ্যাঠামশাই কেমন নিষ্ঠুর হয়ে যান। খেতে দেন না। বার্লি, মুড়ি, খৈ, দুধ—হালকা খাবার। সে বড় ভয় পায়। ভাত বন্ধ হয়ে গেলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। পার্বতীকে নিয়ে সে এখন অন্য এক ঘোরের মধ্যে আছে। এটা যে তার কি হয়ে গেল! সংকোচ, লজ্জা অপরাধবোধ—আবার মনের মধ্যে বেজে ওঠে একতারা, কোন এক বাউল নিশিদিন তা বাজায়।

জ্যাঠামশাই বললেন, পার্বতী শুনছি থানে যাচ্ছে না।

দিবুর মুখ কেমন সহসা অতর্কিতে লাল হয়ে গেল।

কি হয়েছে পার্বতীর!

জানি না ত'।

দিবু আর দাঁড়াল না। পার্বতীর এই পরিবর্তনে সেও কম বিস্মিত নয়।

সে ঘর থেকে বের হয়ে ঘেরির পাড়ে এসে দাঁড়াল। ললিতদা থাকলে দোকানে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে পারত। তার কোন কিছু ভাল লাগছে না। পার্বতীকে দেখার আকাঙ্ক্ষা। ওদের বাড়ির ভেতরটা দেখা যায়। পটল পার্বতী কেউ নেই। পার্বতী দু-দিন ধরে থানে যাচ্ছে না। তবে কি দিবু এটা পছন্দ করছে না বলে! ওর সাপখোপের ভীতি, কালের ভীতি এত সহজে উবে যায় কি করে! মনের মধ্যে পার্বতী সেই রাতের ঘটনায় কোন দৃঢ়তা খুঁজে পেয়েছে! অথবা সন্দেহ সংশয় এতদিন দিবুকে নিয়ে যা তার ছিল, তা নিঃশেষ হয়ে গেছে! সে আর নিজেকে নষ্ট করে দিতে চায় না। কিংবা বয়ঃসন্ধিকালে যে অপার্থিব এক জগৎ বিরাজ করে—সেখানে সব কিছুই মোহময় ঠেকতে পারে—দিবুর ওপর প্রতিশোধ চরিতার্থ করার জন্য পার্বতী নিজেকে নষ্ট করে দেবে বলে স্থির করেছিল! অতর্কিতে এক বানের জলে ভেসে গিয়ে নতুন

পৃথিবীর সে কি সন্ধান পেয়েছে। দেবী মহিমাকে পর্যন্ত অবহেলায় তুচ্ছ করতে পারছে। ওটা যে টর্চের আলো, ঝোপের মধ্যে ঝুলে থাকায় আলোটা আকাশমুখো হয়েছিল, সব সে ব্যাখ্যা করার পর কি বুঝতে পেরেছে, সবটাই তাহলে মনের ভুল! এতদিন যা ভেবেছিল, কোনো জ্যোতির্ময় আলো দিব্যলোক থেকে যার উৎপত্তি নিমেষে তা ভেঙে খান খান হয়ে গেল! এ-সব ভাবতেই ভেতরে এক জয়ের আনন্দ, আশাতীত সাফল্যের রোমাঞ্চ অনুভব করল দিবু। তার কেন জানি পার্বতীর কাছে দৌড়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু পারছে না। পার্বতী মাঠে তখন পটলকে ধরার জন্য ছুটছে। পটল পালাতে চাইছে, পার্বতী ধরে নিয়ে আসছে। ঘেরির পাড়ে দিবুকে দেখেই পটলের হাত ছেড়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। নিমেষে উধাও।

রাতে এই ঘেরিতে অন্য চেহারা।

সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। চিন্তাহরণ বসে আছে যতীন আসবে বলে। আসতে দেরি করছে। বারান্দায় লণ্ঠন জ্বলছে। হরেন বসে বসে ঝিমোচ্ছিল। আজ তিন-চারদিন ধরে রাতে তার একবিন্দু ঘুম হয়নি। পরাজয়ের গ্লানিতে ভুগছে। এখানে এসে ওঠার পর এত বড় হার তার!

যতীন এল এক সময়। সতর্ক পা ফেলে। চুপি চুপি। দেবীর কোপ কত প্রবল, প্রমাণ না হলে তার থান উঠে যেতে পারে। সবার মধ্যে আতঙ্ক ধরিয়ে দেওয়া দেবীর নামে।

ওখানটায় টিন আছে। চিন্তাহরণ তক্তপোশে বসেই আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল। এই হরেন যা সঙ্গে। আগুন ধরাবে যতীন। তুই তেলটা বেড়ার গায়ে ছিটিয়ে দিবি। বৃষ্টি নেই। সব শুকিয়ে কাঠ। জতুগৃহ হয়ে আছে। আগুন দিলেই দাউদাউ করে জ্বলে উঠবে। আকাশ মেঘলা। বৃষ্টি নামলে জ্বলবে না। শুয়োরটা এসে দেখবে

সব পুড়ে ছাই। লঘু গুরু জ্ঞান না থাকলে এই হয়। যা যা, আর দেরি করিস না। কাজটা হাসিল হলে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারি।

যতীন বলল, লণ্ঠনটা সঙ্গে নি। রাস্তায় লতাটতা পড়ে থাকতে পারে।

মরতে চাস! তুই ন' ওঝা ব্যাটা। তোর আবার ডর কিসের! তোর না পাথর আছে! লণ্ঠন নিয়ে ওদিকে নেমে গেলে টের পাবে।

তবে অন্তত একটা টর্চ।

কিচ্ছু সঙ্গে না। আগুন দিলে দেখবি মাথা ঠিক থাকবে না। কি নিতে কোন্‌টা ভুলবি, কোনটা ফেলে আসবি, পুলিশ এসে তখন ধরুক। গামছাও সঙ্গে না। পাটকাঠি আর কেরোসিন তেল। আগুন ধরে গেলে ছুটবি। কাঁচা কাজ করেছিস ত' ধানের ভিটে সুদ্ধু উপড়ে ফেলব। ওরা নেমে গেলে চিন্তাহরণ ঘরের লণ্ঠনটাও নিভিয়ে দিল।

ঘেরি থেকে নেমে আসার সময় মনে হল, হরেনের পা ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে। সে হাঁটতে পারছে না।

যতীন মাঝে মাঝে ভয় তাড়ানোর জন্য রুদ্রাক্ষের মালা জপছে। বিষহরি, বিষহরি। এত বড় পাপ কাজ সে কখনও করেনি। ঘুট-ঘুটে অন্ধকার। সামনে হরেন। হাতে তার এক আঁটি পাটকাঠি। দোকান জ্বলবে। তিনটে লোক জ্যান্ত পুড়ে মরবে।

কি হল!

হরেন উবু হয়ে বসল। কাঠিগুলি হাত থেকে পড়ে গেছে। বলে সে উবু হয়ে বসলে দেখল আঁটিটা সামনেই আছে। হাঁটুতে ভর দিয়ে আবার উঠে দাঁড়াল। তুলির একমাত্র আবাস, সে নিজের হাতে পুড়িয়ে দিতে যাচ্ছে। ভেতরে রতন, চরণ, দিবু ঘুমাচ্ছে। সব পুড়ে মরে থাকবে। তেলটা চারপাশে দিতে বলেছে। সে বলল, যতীনদা কাজটা কি ভাল হবে?

কি বললে!

না, বলছিলাম, এতবড় পাপ কাজ। তিন তিনটে লোক পুড়ে মরবে। হরেনের গলা কাঁপছে থরথর করে।

যতীন বলল, কর্তা যে প্যাঁচে ফেলেছে, দু-কূলেই মরণ লেখা, আমার। তারপর সে ছুটতে থাকল। যেন দেরি করলেই হোঁচট খাবে। যেতে পারবে না। শরীর অসাড় হয়ে পড়ে থাকবে পায়ের নিচে কি আছে টের পাবে না। রাস্তা সংক্ষিপ্ত করার জন্য তারা জঙ্গল মাড়িয়ে যাচ্ছে। কুকুরগুলো ঘেরির পাড়ে দাঁড়িয়ে ঘেউঘেউ করছে। এই ঘেরিতে এত কুকুর থাকে তারা যেন জানত না। আসলে চোরের মতো গতিবিধি হলে যা হয়, দূর থেকে জোনাকি উড়ে এলেও ভয়—যতীন মাঝে মাঝে ঝোপের মধ্যে বসে পড়ছে। হরেনকে হাত টেনে বসিয়ে দিচ্ছে। মানুষের গলার আওয়াজ পাচ্ছে। কারা যেন ফিসফাস কথাবার্তা বলছে। আসলে সবই শব্দ। সে উঠে পড়ে আবার হাঁটে। এইটুকু পথ, অথচ মনে হচ্ছে যোজন দূর। ঘরটা যত এগিয়ে আসছে তত হরেনের এবং যতীনের কাঁপুনি বাড়ছে।

আর আগুন দিয়ে দৌড়ে আসার সময়ই ওঝার পায়ে কুট করে কিসে কামড়াল। দাঁড়ালে ধরা পড়ে যাবে। ছুটছে। আঙুলটা কেমন অবশ হয়ে আসছে। সে যে হাত দিয়ে দেখবে তারও সময় নেই। যেন হৈ-হল্লা শুনতে পাচ্ছে। আগুন ধরে উঠেছে, মড়মড় শব্দ শোনা যাচ্ছে। বাঁশ ফাটার শব্দ। ওরা দৌড়ে যখন চিন্তাহরণের বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল, তখন চুপি চুপি চিন্তাহরণ দরজা খুলে দিল। বলল—শাবাশ, দেখবি যতীন, তোর থানের মাহাত্ম্য কত এবারে বাড়ে।

যতীন কোনরকমে বলল, জল খাব কর্তা। বুক ফেটে যাচ্ছে। টর্চ বাতিটা দেন। দেখি। আর টর্চ মেরে ক্ষতস্থান দেখেই সে আঁতকে উঠল। ঢলে পড়ার আগে একটা কথাই উচ্চারণ করতে পারল—হাঁ বিষহরি!

সহসা কেমন দমবন্ধ ভাব হয়ে আসতেই চরণ চোখ খুলে তাকাল। দেখেই চিৎকার, আগুন। আগুন। রতন চিৎকারে তড়াক করে লাফিয়ে বসল। সেও হাঁকল, আগুন আগুন। দরজা ঠেলে দেখল, বাইরে থেকে বন্ধ। ঝাঁপের দরজা। চরণ লাথি মারতেই কি একটা সরে গিয়ে দড়াম করে শব্দ হল। আগুন ধোঁয়ায় শ্বাসকষ্ট। কোনরকমে টেনে আনল ঝাঁপটা, তারপর নিচ দিয়ে হামাগুড়ি দিল। রতনের কাপড়ে আগুন ধরে গেছে। সে কাপড়টা খুলে উলঙ্গ হয়ে দৌড়াল—পেছনে চরণ। ঘেরির পাড়ে উঠে ফের চিৎকার, আপনারা কে কোথায় আছেন—ললিতদার দোকানে আগুন লেগেছে। লেলিহান অগ্নি তখন আকাশের দিকে ভয়ঙ্কর দু-হাত যেন প্রসারিত করে দিয়েছে। চিৎকারে আবাসের মানুষজন জেগে গেছে। যে-যেদিক থেকে পারছে ছুটছে। কেউ ঘড়া নিয়ে, বালতি নিয়ে, কেমন ভূতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে সবাই। কেউ আবার কিছু না নিয়েই ছুটে গেছে। কি করবে বুঝতে পারছে না। রায়মশাই, কপিল, পটল, মরণ, সুখো, চিন্তাহরণ—কেউ বাদ যায়নি। চিন্তাহরণ নিজেও একখান বালতি নিয়ে দৌড়ে এসেছে। হৈ-হল্লা চিৎকার। খাসনবিশ ছুটছে একখান ভিজা কাঁথা যদি চালে ফেলে দেওয়া যায়। বাঁশ, কলার ডিগ হাতে আবাসের মানুষরা, আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে। মেয়েরা, বৌরা জল নিয়ে আসছে।

পার্বতী একা দাঁড়িয়ে। দিবুদা কোথায়! দিবুদা, দিবুদা! সে চিৎকার করছে, দিবুদা কোথায়?

রায়মশাই এমন ভয়ঙ্কর ত্রাসের মধ্যেও ঠাণ্ডা গলায় বললেন, দিবুর জ্বর। বাড়িতে আছে।

পার্বতীর হাঁটু কাঁপছিল। মুহূর্তে তা কেমন যেন থেমে গেল। গলা শুকিয়ে কাঠ। সে কি করবে বুঝতে পারছিল না। সবার দেখাদেখি সেও দৌড়ে গেল। হাতে বালতি নিয়ে ঘেরির তলানি থেকে জল নিয়ে ছুটল। যাবার সময় দেখল অনেকের মধ্যে দিবুদা

চাদর গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে ললিতদার এই দুঃসময়ে কোনো কাজে লাগতে পারছে না বলে বিমর্ষ। সে পার্বতীকে পাশ দিয়ে ছুটে যেতে দেখেও কিছু বলল না। আগুন লাগল কি করে! ললিতদা এলে সে কি বলবে! জ্বর হওয়ায় জ্যাঠামশাই রতনকাকে একাই পাঠিয়েছিল শুতে। বিড়িটিড়ি খেয়ে চরণ কিংবা রতনকাকা ভুল করে ফেলেনি ত'।

সে নিচে নেমে দেখল সব শেষ। কিছুই বের করা যায়নি। আগুন একইভাবে জ্বলছে। কত কষ্ট করে জীবন বাজি রেখে ললিতদা দোকানটা সাজিয়ে তুলেছিল। কত স্বপ্ন দেখত দোকানটা নিয়ে। ইচ্ছে ছিল তার দোকানের পাশে একটা জলছত্র দেবে। দূর দূর থেকে মানুষজন এই পথ ধরে বেলডাঙা যায়। তপ্ত দুপুরে পথিকের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সুন্দর একখানা গাছের ছায়ায় জলছত্র। ক্লাব করবে একটা। ক্লাব থেকে এটা করা হবে। জায়গা ললিতদাই দেবে বলেছিল। ললিতদার কথা ভেবে, দুলিদির কথা ভেবে তার চোখে জল এসে গেল। দোকানটা চোখের ওপর পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। ললিতদা ভেবেছিল, দিবু থাকলে তার দোকান থেকে কেউ কিছু সরাতে পারবে না। এখন পুরো দোকানটাই জ্বলে জ্বলে শেষ হয়ে গেল। পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ললিতদা এলে, তাকে সে কি জবাব দেবে!

সকাল বেলায় পার্বতী দেখল দিবুদা ললিতদার দোকানের দিকে মাথা নিচু করে হেঁটে যাচ্ছে। দিবুদা এক মুঠো ছাই তুলে নিয়ে হাত খুলে কি দেখল। তারপর ছাই ফেলে দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। বড় একা নিঃস্ব মনে হচ্ছে দিবুদাকে।

॥ সমাপ্ত ॥